শ্রীভানু রায়

পরম প্রীতিভাজনেষু

ইস্টবেঙ্গল মেলের প্রথম পাঁচটা কামরা এইমাত্র হিন্দুস্থানের মাটি ছুঁল। তার বিশাল দেহের বাকি আধখানা এখনও সীমান্তের ওপারে।

ট্রেনে বসেই নতুন যে দেশটিতে এই মুহূর্তে পা রাখলাম তার নাম রিপাবলিক অব দি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন; সোজা কথায় ভারত। কিন্তু যে রাষ্ট্র থেকে আমি এখানে আসছি তার বয়েস মোটে পাঁচ বছর; উনিশ শ' সাতচল্লিশের এক রক্তাক্ত সূতিকাগারে তার জন্ম। পাঁচ বছরের সেই শিশুটি এ দেশকে ভারত বলে মানে না, বলে হিন্দুস্থান।

ইস্টবেঙ্গল মেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় 'নিরালা' বলে কোন কথা নেই। প্রচণ্ড ঠাসাঠাসি ভিড়ে এক কোণে জানলার ধার ঘেঁষে ইঞ্চিকয়েক জায়গা দখল করতে পেরেছিলাম। হাত-পা গুটিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সঙ্কুচিত করে সমস্ত পথ একই ভাবে বসে আছি।

রওনা হওয়া থেকেই হৃৎপিণ্ডের ওপর অসহ্য এক থরথরানি ভর করে আছে, সীমান্তে পৌঁছুতেই সেটা হাজার গুণ হয়ে উঠল। মনে হল, বুকের ভেতর হাজার কাঠিতে দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছে। আর চোখ দুটো নিজের অজ্ঞাতসারে জানলার বাইরে ছুটে গেছে।

সীমান্ত—বর্ডার!

পাঁচ বছর ধরে ঢাকা জেলার আমতলি নামে একটি গ্রামে বসে এই 'বর্ডার' সম্পর্কে কত না কিংবদন্তী শুনেছি। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরির দাগ মাটির ওপর কোথাও তো চোখে পড়ছে না। দেখতে পাচ্ছি না, তবু জানি সে দাগ আছে। আছে খণ্ডিত দেশের মর্মমূলে, আছে তার গভীর অনিঃশেষ যন্ত্রণায়। সে রেখা গেছে কোটি কোটি মানুষের ছিন্ন ধমনীর ওপর দিয়ে; গেছে অশ্রুদীর্ঘশ্বাস আর রক্তস্রোতের ভেতর পথ করে।

আশ্চর্য, যে সীমান্তটার ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলেছে, পাঁচ বছর আগে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। এপার-ওপার তখন একাকার, একই দেশের দুই প্রান্তমাত্র কিংবা এক দেহের দুই প্রত্যঙ্গ।

শুধু আমিই না, কামরার সব যাত্রীই বর্ডার দেখতে জানলার কাছে ছুটে এসেছে।

বর্ডার আর কি; নিষ্ফলা বসতি-বিরল ধু-ধু প্রান্তর শুধু। এ কামরায় এমন

অনেকে আছে, পাঁচ বছর আগে এ পথে তারা নিয়মিত পাড়ি দিত। এ জায়গাটা তখন তাদের মনে সামান্য ঢেউটুকু তুলতে পারে নি। দিগন্তবিসারী খানিকটা ফসলশূন্য জমির জন্য কার প্রাণটা বা আকুল হয় !

কিন্তু পাঁচ বছর ধরে 'বর্ডার' শব্দটা নির্জন প্রান্তরে নতুন মহিমা জুড়ে দিয়েছে, নতুন এক অর্থ, নতুন তাৎপর্য। সেইজন্যই বোধ হয় জানলার কাছে হুড়মুড় করে ভিড় জমানো। কিংবা ওপার থেকে যারা এসেছে আর কোনদিনই তারা ফিরবে না। তাই কি দুই দেশের মাঝখানের সীমারেখাটা প্রাণভরে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে ?

একসময় সীমান্ত অদৃশ্য হল। ট্রেনে বসেও জন্মভূমির সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ যোগটুকু ছিল, ছিন্ন হয়ে গেল।

বর্ডার পেরিয়ে যেতেই জানলার কাছের ভিড়টা আর নেই। একে একে যে যার জায়গায় আবার ফিরে যেতে লাগল।

আমাদের এই ট্রেনটার পোশাকী নাম ইস্টবেঙ্গল মেল। আরেকটা অবহেলার নামও অবশ্য আছে—রিফিউজি স্পেশাল। শেষের নামটাই বোধ হয় যোগ্যতর।

রিফিউজি কথাটার অর্থ কী ? উদ্বাস্তু ? বাস্তুহারা ? ছিন্নমূল ? ছিন্নমূলটা শুনতে মন্দ না। কিন্তু বাকি দুটো বড় বেশি উলঙ্গ আর রসকষহীন, ফলত অনেকের না-পছন্দ। তাঁরা পছন্দমত নতুন এক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন— শরণার্থী। মানতেই হবে কথাটা চমৎকার ; তার ভেতর ধ্বনি আছে, পরিপাটি রসবোধ আছে, আর এমন একটি ঝঙ্কার রয়েছে যা শ্রুতি-সুখকর।

রিফিউজি স্পেশাল বোঝাই হয়ে আমরা শরণার্থীর দল এসেছি সীমান্তের ওপার থেকে। এই ট্রেনের দশখানা কামরা আকণ্ঠ ঠাসা। সীট আর বাঙ্কগুলো তো ভর্তিই ; এমন কি নীচেও পা রাখার জায়গা নেই, সেখানেও পিণ্ডাকারে মানুষ। শুধু কি তা-ই, ছাদের ওপরেও বিশাল জনতা ডেলা পাকিয়ে রয়েছে।

মানুষই নয়, কত যে মালপত্র লটবহর ইতস্তত ছড়িয়ে, হিসেব নেই। দেশ ছাড়ার মুহূর্তে যার যা ছিল সমস্ত বুকে করে নিয়ে এসেছে। রঙচটা টিনের বাক্স, ছেঁড়া কাঁথা, তুলো-বার-করা চিটচিটে তোশক, দাগধরা বালিশ, ডালা-কুলো-ধামা-পিঁড়ে, মুড়ি ভাজার বালি, আধক্ষয়া ঝাঁটা পর্যন্ত। আরো কী কী আছে বসে বসে কে তা গোনে। কেউ কেউ আবার শিকড়সমেত নটে ডাঁটা আর ফলন্ত লাউগাছ তুলে এনেছে। দুদিন আগেও ফেলে-আসা কোন গ্রামের মাটিতে গাছগুলো সজীব স্বাস্থ্যে আর নিবিড় লাবণ্যে ঝলমল করত। এখন তারা বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ। শুকনো নির্জীব পাতাগুলো থেকে প্রাণের কোন লক্ষণই

খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গাছগুলো দেখতে দেখতে একটা উপমা মনে পড়ে যেতে পারে। এগুলোর মত আমরাও তো দেশের মাটি থেকে জীবনের শিকড় তুলে নিয়ে চলেছি। ফলে অমনই ম্লান করুণ বিষণ্ণ হয়ে গেছি কি? নিজের মুখ তো কেউ দেখতে পায় না; কাজেই আমার কথা বলতে পারব না। কিন্তু কামরার ভেতর চোখ ফেরালেই দেখতে পাব সারি সারি ভাবলেশহীন মুখগুলিতে জীবনের দীপ্তি নেই; মৃত্যুমলিন গাঢ় ছায়া সেখানে মুদ্রিত। যা পেছনে পড়ে রইল তার জন্য দুর্বহ যন্ত্রণা আর সামনে যে অনিশ্চয়তার ভেতর ঝাঁপ দিতে হচ্ছে তার জন্য অসীম উৎকণ্ঠা, এই দুয়ের মাঝখানে সবাই আচ্ছন্ন।

চারপাশে সারিবদ্ধ মুখগুলি তো মুখ নয়, আয়না। জানি চোখ ফেরালেই সেখানে নিজের ছবি দেখতে পাব। টের পাব ঐ মুখগুলির সঙ্গে আমার মুখের কোন তফাত নেই।

সীমান্ত পেরুবার পর আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। চারদিন আগে রওনা হয়ে প্রথমে স্টিমারে, পরে ট্রেনে এতটা পথ এসেছি। এই চারটে দিন এতগুলো মানুষ একটুও শব্দ করে নি; পরস্পর কিছু বলতে হলে বলছে ইশারায়, কদাচিৎ ফিসফিসিয়ে। কোলের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত কি বুঝেছিল কে জানে। কাঁদতে পর্যন্ত তারা ভুলে গিয়েছিল, হাসতে এবং বায়না করতেও। শুধু মায়েদের কোল আরো জোরে আঁকড়ে অনড় হয়ে থেকেছে। কঠিন স্পর্শময় এক স্তব্ধতা আমাদের বেষ্টন করে ছিল যেন।

এই চারদিন প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, একটা মৃতের রাজ্যে এসে পড়েছি এবং আমিও তাদের একজন হয়ে গেছি। যাদুঘরে মরা প্রাণীদের আরকে ডুবিয়ে যেমন সাজিয়ে রাখা হয় তেমন ভাবেই ইস্টবেঙ্গল মেলের এই কামরাগুলিতে সারি সারি আমাদেরও সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

যাই হোক, বর্ডার পার হতে সবার হাতে-পায়ে রক্ত-সঞ্চালন শুরু হল যেন। বুঝতে পারছি এখন তাদের ঠোঁট নড়ছে, চোখের পাতা ওঠানামা করছে। টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কথা কানে আসতে লাগল। চারদিন পর সঙ্গীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। আমি উৎকর্ণ হলাম।

সোনার দ্যাশ কোথায় রাইখ্যা আইলাম; এই জন্মে আর দেখতে পামু না। কি পাপে এমন হইল।'

'চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি। কত কালের সম্পর্ক! ঐ ভিটায় বাপ জন্মাইছে, ঠাকুরদা জন্মাইছে, ঠাকুরদার বাপে জন্মাইছে, তার বাপে জন্মাইছে, তার বাপে,

তার বাপে। পুরুষের পুর পুরুষ ধইরা বসতি। ভিটায় সকালে জল-ছড়া পড়ছে, সন্ধ্যায় পিদীম জ্বলছে। রাসের দিনে রাস, দোলের দিনে দোল। যে দিনের যে উচ্ছব (উৎসব) কানটা বাদ যায় নাই। এমুন কর্ম, কপালের এমুন লিখন, সব আন্ধার (অন্ধকার) হইয়া গেল।'

'কই জন্মাইছি আর কই চললাম। সামনে যে দিন সেই দিনে অদ্দিষ্টে (অদৃষ্টে) কি যে আছে!'

'নিজে কী খামু, পোলামাইয়ারে (ছেলেমেয়েকে) কী খাওয়ামু, ভগমান জানে।'

'কই থাকুম, কী করুম, কে যে আমাগো (আমাদের) পরান রক্ষা করব। হায় রে দারুণ বিধি!'

'বাতাসী লো—সোনা লো, সেই হ্যাশই ছাড়লাম। আগে যদি ছাড়তাম! তোরে জন্মের মত রাইখ্যা গেলাম লো মা।'

প্রথমে দু-চারজন চাপা অনুচ্চ গলায় শুরু করেছিল। ক্রমশ কামরার প্রায় সবাই তাতে যোগ দিয়েছে। প্রতিটি কথার সঙ্গে শুধু দীর্ঘশ্বাস, দুর্ভাবনা। প্রতিটি কথার সঙ্গে শোক খেদ আর যন্ত্রণার ইতিহাস জড়ানো।

থেকে থেকে কান্নার শব্দও শোনা যাচ্ছে। দু-দিন ধরে সবার বুকে যা রুদ্ধ হয়ে ছিল সেটা বুঝি বেরিয়ে আসার পথ পেয়েছে।

ট্রেন যত এগিয়ে চলেছে, কথা বিশেষ শুনতে পাচ্ছি না। কথা ছাপিয়ে কান্নার শব্দটাই ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠছে। ফেলে আসা জন্মভূমির জন্য কান্না।

যে দেশ পেছনে পড়ে রইল সেখান থেকে স্মৃতি ছাড়া বিশেষ কিছু কেউ আনতে পারে নি। দগদগে টাটকা স্মৃতিতে ভর করে সেই দেশ এখন সবাইকে কাঁদাচ্ছে।

কান্নার মত সংক্রামক আর কী আছে? আমাদের কামরার বিলাপ মুহূর্তে পাশের কামরায় ছড়িয়ে পড়ল, সেখান থেকে তার পাশের কামরায়। নিমেষে ইস্টবেঙ্গল মেল নামে এই শরণার্থী স্পেশাল কান্নার গাড়ি হয়ে উঠল।

সীমান্ত তো কখন পার হয়ে এসেছি। আমি কিন্তু চোখ দুটি ভেতরে আনি নি; জানলার বাইরেই তাকিয়ে আছি। কান্নার আওয়াজ কানের পর্দায় যত আঘাত হানছে ততই বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসছে। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে, গলাটা শুকিয়ে একরাশ খরখরে ধারাল বালির মত হয়ে উঠেছে; ঢোক গিলতে পারছি না। আমি তো আলাদা কেউ নই, এদের মতই এক পরম

শোকের আর দুর্বহ দুঃখের শরিক।

এটা উনিশ শ একান্ন সাল। বাংলা পঞ্জিকার সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক একরকম ঘুচেই গেছে। কাজেই সঠিক বাংলা সালটা বলতে পারব না। ছেলেবেলায় বাবা শিখিয়েছিলেন, ইংরেজি সালের সঙ্গে সাত যোগ করে সামান্য আরেকটু হেরফের ঘটাতে পারলেই বাংলা ক্যালেণ্ডারের হিসেবটা পাওয়া যেতে পারে অতএব ইংরেজি এই উনিশ শ একান্ন সালটা বাংলা তের শ উনষাট-টাট হবে

মাসটা ডিসেম্বর; প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। আজ বাইশ তারিখ। মনে মনে যোগ-বিয়োগ করে দেখলাম এটা বাংলা মাসের হিসেবে পৌষ।

আমার চোখ দুটি বাইরে ফেরানো। সেখানে কোন বিস্ময়ই নেই, তব তাকিয়ে আছি।

এখন দুপুর।

দুপুর, কিন্তু রোদ নেই। সেই সকাল থেকে, সীমান্তের ওপারে থাকতেই আকাশময় টুকরো টুকরো ভবঘুরে মেয়েদের আনাগোনা দেখেছি। এতক্ষ তারা ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল; এবার বুঝি মন স্থির করতে পেরেছে ঈশান কোণে সবাই মিলেমিশে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকে যায়; তার পিছু পিছু তাড়া করে আসে বাজের গর্জন।

বোঝাই যাচ্ছে, এ মেঘ আকাশ-ভুলানো নয়, তার শোভা বাড়াতেও জ হয় নি। এ মেঘ রীতিমত বর্ষণ-বিলাসী।

পৌষের এই দিনটার বড় বেশি পিছুটান। বর্ষার স্মৃতি সে ভুলতে পা নি; আষাঢ়-শ্রাবণের দুরন্ত ঢলের দিকেই তার অনুরাগ।

বাইরে শুধু আকাশ আর মেঘই নেই। অবারিত প্রান্তর শীতল বিষ মলিন একটু আলো গায়ে জড়িয়ে যোজন যোজন জুড়ে নিজেকে এলি রেখেছে। মাটি এখানে স্বাস্থ্যবতী কুমারী; পুরুষপীড়নে গর্ভিণী হবার জ সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু এই নির্জনে তেমন পুরুষ কই? মাঝে মাঝে একটু-আধ ঝোপ-ঝাড়, কালো চোখের সলাজ চাহনির মত সবুজ বনানীর চকিত রেখা এক-আধটা খাল খানিক দৌড়েই থমকে যাচ্ছে। দূরে দূরে সারি সারি তালগা প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একঝাঁক শালিক কি খেয়ালে ট্রেনটার সঙ্গে কিছুক্ষ পাল্লা দিয়ে অদৃশ্য হল। তালগাছের পাহারা পেরিয়ে আরো দূরে আকা যেখানে ধনুরেখায় নেমে গেছে এই দুপুরেও সেখানে ধূসর কুয়াশার মত জমে আছে।

সব মিলিয়ে পৌষের এই দুপুরটা ম্লান, করুণ, বিমর্ষ। আমাদেরই মনে

প্রতিচ্ছবি সে বুঝি নিজের সর্বাঙ্গে ধরে রেখেছে।

জানলার ফ্রেমে দ্রুত সরে-যাওয়া দৃশ্যপট, পেছনে কামরাভর্তি মানুষের কান্না। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে একসময় মনে হল, আমার চেতনা থেকে কার এক ইঙ্গিতে ক্রমশ তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে কিসের এক উজানী টান লাগল যেন ; বুঝি বা অস্থিরতাও। আর তাতে ভর করে আমার সমস্ত সত্তা সীমান্তের ওপারে ফেলে-আসা দেশের মাটিতেই আবার ফিরে যেতে লাগল।.

মনে পড়ছে কাল আর পরশু পর পর দু-দিন এই দুপুরবেলাটা আমরা ছিলাম গোয়ালন্দে। তার আগের দিন নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটায়। তার আগের দিন আমতলি নামে ঢাকা জেলায় আমাদের সেই গ্রামখানিতে।

পূর্ব-বাংলার গ্রাম যেমন হয়, সাত নহর হারের মত আমতলিকে ঘিরে শুধু খাল। সুফলা মাটি ফসলের প্রাণের ভারে সর্বক্ষণ ভরপুর হয়ে আছে। বছরের যে ঋতুতে খেতের দিকে চোখ ফেরানো যাক, হয় সোনা নয় সবুজ।

সভ্যতার সেই প্রথম উষায় যে কৃষি-জীবন শুরু হয়েছিল, তারপর তো কত শত বছর কেটে গেছে। কত রাষ্ট্র-বিপ্লব শিল্প-বিপ্লব ঘটে গেছে পৃথিবীর ওপর দিয়ে। আমতলি সে সব খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। প্যাস্টোরাল প্রেমের মোহ থেকে এতকাল পরেও সে মুক্ত হতে পারল কই ? জমি-জমা, ধান-পাট-কলাই-মটর, গাছ-গাছালি, পাখপাখালি, গরু-লাঙ্গল ইত্যাদির মধ্যেই সে বিভোর।

দু-বছর আগেও আমতলি যেন প্রবাল বলয় দিয়ে ঘেরা সমুদ্রের মাঝখানে এক শান্ত লেগুন। বাইরের যত ঝড় যত আলোড়ন যত জলোচ্ছ্বাস, সব তার দেয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে যেত, ভেতরে আসার পথ পেত না।

আমতলির জীবন ছিল মন্থর, স্তিমিত, বেগবর্ণশূন্য। বাইরের পৃথিবী যখন উল্কাবেগে ছুটে চলেছে তখনও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতিতে সামান্য হেরফেরটুকুও হত না। তার হৃৎপিণ্ড তিরতিরিয়ে ওঠানামা করত।

এই স্তিমিত জীবনও মাঝে মাঝে চঞ্চল হত যখন নীলপুজোর ঢাক বেজে উঠত, যখন মাণিকগঞ্জ থেকে ঢপের দল আসত অথবা আসরে আসরে কৃষ্ণ-লীলার পালা কিংবা রয়ানি গান জমে উঠত।

চাঞ্চল্য সবচাইতে বাড়ত হোলির দিনে। সেদিন পিচকিরি হাতে ঘরের

কোণের বৌরাও অতর্কিতে ভিনদেশী পথিককে আক্রমণ করে বসত।

বিদেশী পথিকটিও রসিক মানুষ। সে-ও পাল্টা আক্রমণে অপটু নয়। কানে একটি হাত চাপা দিয়ে আরেকটি হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সেও গেয়ে উঠত :

'আজু শুনে ব্রজনারী,

ওগো ব্রজনারী, রাজোকুমারী

তোমার যৌবনে আজ করব আইন জারি।

হস্ত ধরে নিয়ে যাব, হৃৎকমলে বসাইব।

আর বসন তুলিয়া মারব ঐ লাল-পিচোকারি।'

রংখেলার দিনে পরাভব মানার রীতি নেই। অতএব ঘরের কোণের বৌরাও চোখের তারায় মরণফাঁদ পেতে গেয়ে উঠত :

ভিনদেশী পুরুষ দেখি

টালুমালু চায়,

রূপবতীর রূপ দেইখা

তার মাথাটি ঘুরায় (ঘোরে)।

এ সব দু-বছর আগের স্মৃতি। তারপর কি যে হল, আমতলি গ্রামের জীবনে আগের সুর আর বাজে না, পুরনো রংও গেছে মুছে। সারা বছর অগাধ মন্থরতায় ডুবে থেকে যে গ্রামটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে আর উৎসবে খানিক মেতে উঠেই আবার স্তিমিত হয়ে যেত তাকে এখন আর চেনাই যায় না। এখন সেখানে প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা, তার হৃৎপিণ্ড আজকাল অতিমাত্রায় অস্থির। শান্ত লেগুনে এতকাল পর বাইরের ঝড় ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

কিন্তু গ্রামটা নয়, আমার চোখের পটে বার বার আমাদের সংসারটাই ফুটে উঠছে। আমতলির দক্ষিণে নিরালা একটি কোণে আমাদের বাড়ি। সামনের দিকে দিশী ফুল আর ফলের বিস্তৃত বাগান, পেছনে মস্ত দীঘি। মাঝখানে বাড়িটা।

বাড়ি বলতে টিনের চাল আর কাঁচাবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা খানপাঁচেক বাইশের বন্দের ঘর। মেঝেগুলো অবশ্য পাকা; লাল সিমেন্টের। উঠোনে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ, দোলমঞ্চ। আরেক প্রান্তে সারি সারি ধানের ডোল, পালা-সাজানো পাহাড়-প্রমাণ খড়, গোয়াল, পাটকাঠির স্তূপ। আছে দশ-বারোটা কুকুর, একপাল বেড়াল। চালের কোণে কোণে পায়রা শালিক আর চড়াইদের বসতি। বংশপরম্পরায় এ বাড়িতে তাদের স্বত্ব কায়েম হয়ে গেছে। কোন আদালতের সাধ্য নেই ওদের উৎখাত করতে পারে।

আমরা সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবার। সুখ আর সচ্ছলতা আমাদের ঘিরে উছলে উছলে পড়তে থাকে।

সংসারে আমরা মাত্র চারজন মানুষ। বাবা, মা, ছোট বোন সবিতা আর আমি।

প্রথমে বাবার কথা। বাবা সে আমলের ম্যাট্রিকুলেট। অবশ্য আই-এ-টাও মাস কয়েক পড়েছিলেন। আমাদের গ্রামে হাইস্কুল নেই। পাশের গ্রাম সোনারং থেকে মাট্রিক পাস করে ঢাকায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন বাবা। বছর খানেক ঢাকায় ছিলেন। ছ-মাস কলেজ-হোস্টেলে, ছ-মাস জেলে। জেলে যাওয়াটা অকারণে নয়।

আমতলি আর সোনারঙের বাইরে বাবার সেই প্রথম পা ফেলা। আর ঢাকা তো ছোটখাটো হেলাফেলার শহর নয়, তখনকার দিনে পূর্ব-বাংলার অঘোষিত রাজধানী। ধাঁধিয়ে দিতে, মাতিয়ে দিতে এবং রাঙিয়ে দিতে কত চমকের মেলাই না সে সাজিয়ে রেখেছে।

গ্রামের ছেলেটি প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর চমকের ঘোরে মেতেও উঠেছিলেন।

তখনকার দিনে ঢাকা শহর স্বরাজপন্থী বিপ্লবীদের বিরাট কেন্দ্র। কিভাবে কলেজে পড়তে পড়তে যে বাবা তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তার ইতিহাস ভিন্ন। ঐ যোগাযোগের কল্যাণে নগদ লাভটুকু হয়েছিল মাস ছয়েকের জেল। জেল থেকে বেরুবার পর ঠাকুরদা বাবাকে আর ঢাকায় রাখেন নি; সোজা বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বিপ্লববাদের মধ্যে যে উত্তেজনা যে মোহ বাবার মনে তা ক্ষণিক চমক এনে দিয়েছিল। যে রংটা লাগিয়েছিল তা পাকা নয়; কাঁচা রং মুছে যেতে সময় লাগে নি।

গ্রামে ফেরার পরও দল থেকে অনেকবার ডাক এসেছে; বাবা সাড়া দেন নি। সাড়া না দেওয়াটা সাহসের অভাবে নয়। বাবার মানসিক গঠনই বোমা-বন্দুক জেল-খাটার উপযুক্ত ছিল না। সাময়িক নেশা তাঁর কেটে গেছে।

মানুষকে ভালবাসা এবং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নিজেকে উৎসর্গ করার নাম যদি দেশসেবা হয় তবে সে দেশসেবার পাকা রংটা ছিল আমতলি গ্রামেই। ঢাকা থেকে ফিরে বাবা তার খোঁজ পেয়েছিলেন; প্রাণভরে নিজের সর্বাঙ্গে তা মেখেও নিতে শুরু করেছিলেন। এই প্রৌঢ় বয়সেও প্রাণ রাঙানোর খেলা তাঁর শেষ হয় নি।

আমাদের গ্রামে স্কুল ছিল না। ঢাকা থেকে ফিরেই বাবা প্রাইমারি স্কুল খুলেছিলেন ; সে-স্কুল এখন জুনিয়ার হাই হয়েছে। বাবা তার হেডমাস্টার। প্রথম যুগে সারা স্কুলে ছাত্র ছিল সাকুল্যে আট-দশটি। একমেব শিক্ষক ; তিনি বাবা। ইদানীং ছাত্রের সংখ্যা পঞ্চাশ গুণ বেড়েছে ; মাস্টার দশ-বারো জন।

বাবা স্বর্ণযুগের মানুষদের একজন। শুধু স্কুল খোলাই নয় ; যৌবনের সেই প্রথম প্রহর থেকে আমতলির জীবনে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ হাতের মুঠোয় কিছু কড়ি রেখে বাকিটা বিলোয়। বাবা কিন্তু বেহিসেবি ; কিছু রাখার কিছু ছাড়ার কৌশল তাঁর জানা ছিল না। নিঃশেষে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ধীরে ধীরে একদিন আমতলির জীবনে তিনি একাকার হয়ে গেছেন। জারি গানের আসর বসলে দেখা যেত, বাবা সামনে বসে মাথা নাড়ছেন। যাত্রা-পালায়, কবির গানে, ঢপকীর্তনে, কৃষ্ণলীলায়, দোলে, রয়ানি গানে—সর্বত্রই বাবা। রজবালি মণ্ডলের ছেলের বিয়ে ; বাবা চলেছেন বরকর্তা হয়ে। কিতাব্বী ভুঁইয়ার মেয়ের 'দেন-মোহর', বাবা কন্যাপক্ষের হয়ে কথা বলেছেন। যুগীপাড়ায় কলেরা লেগেছে, বাবা সেখানে ছুটলেন। দিনের পর দিন কাটিয়ে মহামারীর কোপ থামলে বাড়ি ফিরলেন। মাঝরাত্রে নিকারিপাড়ায় কেউ মরল ; দেখা গেল বাবা শোকার্ত আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আচার্যবাড়ির দুই ভাই প্রাণবল্লভ রাধাবল্লভ পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির হিসেব নিয়ে মারামারি বাধিয়ে মুন্সীগঞ্জের আদালতে যাবে। খবর পাওয়ামাত্র বাবা তাদের ফিরিয়ে এনে ধমকধামক দিয়ে, কখনও গায়ে হাত বুলিয়ে, মিটমাট করে দিলেন। 'দাড়িয়াবান্ধা' খেলায় বাবা উৎসাহী দর্শক, সোনারঙের সঙ্গে ফুটবল খেলায় বাবা হয়ত হাফ-ব্যাক হয়েই নেমে পড়লেন। সুখে-দুঃখে-শোকে-উৎসবে আমতলি গ্রামের সমস্ত কিছুর পুরোভাগে বাবা। এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত ভুবনটুকুর তিনিই নায়ক ; তাঁকে ঘিরেই এখানকার জীবন এখানকার সব ঘটনা আবর্তিত হয়ে চলেছে। তাঁকে বাদ দিয়ে আমতলি গ্রামের কিছুই কল্পনা করা চলে না।

এবার মায়ের কথা। মা বাবার অবিকল প্রতিচ্ছবি। বাবার প্রতি কথায় প্রতি কাজে মা তাল দিয়ে বেজে উঠতেন। বাবা যা-ই করতেন, যা-ই বলতেন, তাতে মায়ের পুরোপুরি সায়। আমার বাইশ বছরের জীবনে মায়ের সঙ্গে বাবার ঝগড়া দেখি নি ; সামান্য মনান্তর বা কথা-কাটাকাটিটুকু পর্যন্ত না।

মাকে বাবা 'শালিক' বলে ডাকতেন। এমন নামকরণের সার্থকতা যে কী, বলতে পারব না। মায়ের পাতলা-পাতলা পাখির মত শরীর আর শালিকের

মত দীঘল ছাঁদের টানা চোখের জন্যই কি না কে বলবে।

বাবা যদি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলতেন, 'শালিক তোমার চারগাছা চুড়ি দাও দেখি ; নিবারণ পাল মেয়ের বিয়ে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছে ; এদিকে আমার হাতেও টাকা নেই। তোমার চুড়ি বেচে কিন্তু ওর বিপদটা উদ্ধার করব।'

ছুটে চুড়ি এনে বাবার হাতে দিতে দিতে মা ব্যস্তভাবে তাড়া লাগাতেন, 'যাও যাও, শীগগির ব্যবস্থা কর গিয়ে।'

মাঝরাতে একেক দিন গুণাইবিবির গানের আসর থেকে ফিরে এসে বাবা মাকে ঘুম থেকে তুলে বলতেন, 'তাড়াতাড়ি জনদশেকের মত ভাত বসিয়ে দাও গায়নদার বাজনদাররা খাবে।'

মা তাড়াতাড়ি উনুন ধরাতে ছুটতেন।

বাবা যদি বলতেন, 'ঘুম থেকে তুলে কষ্ট দিলাম বলে গোসা হল না তো ?'

মা হেসে বাবার চিবুক নেড়ে দিয়ে জবাব দিতেন, 'আগো সোনা, না।'

প্রাণের ভেতর সুখ কল্লোলিত হলে মা বাবাকে 'সোনা' বলতেন।

বাবাই শুধু নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আর মা সংসারের কেন্দ্রবিন্দুটির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, এমন নয়। তিনিও বাবার মতই আমতলি গ্রামে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাবার সাম্রাজ্য ছিল পুরুষদের ভেতর, মায়ের মেয়েমহলে। নিত্য দাসের মেয়ের মাঘমণ্ডলের ব্রত ; মা গিয়ে তাকে ব্রতের ছড়া পড়াতে বসলেন। মনা গোসাঁইয়ের নাতনীর বিয়ে, ভোররাত্রে মঙ্গলঘট কাঁখে নিয়ে আর এক'শ এয়ো যোগাড় করে মা চললেন 'জল সই'তে। নীলপূজোয়, নাটাইচণ্ডীর আরাধনায়, রাসলীলায়—কোথায় নেই মা !

ছোট বোন সবিতার বয়স সতের। সুখী সচ্ছল পরিপূর্ণ সংসারের একমাত্র মেয়ে। ফলে আদুরে, জেদী এবং সোহাগী। মেয়েটা একেবারেই বয়স-সচেতন নয় ; সতেরতেও আট বছরের খুকির মত কথায় কথায় নাকি-কান্না জুড়ে দেয়। কোন ব্যাপারে জেদ ধরলে রেহাই নেই ; সেটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না। আমার ওপর তার খুব হিংসে। মা যদি আমার পাতে বড় মাছটা দেন, বাবা যদি নতুন একখানা জামা কিনে আনেন, কেঁদেকেটে একেবারে হাট বসিয়ে দেবে সবিতা। কিন্তু আমার চাইতে কে আর ভাল জানে, সবিতার এই হিংসে আমার ওপর তার টানেরই অন্য নাম।

গ্রামে মেয়েদের স্কুল নেই ; সুতরাং বাড়িতেই বাবা আর আমার কাছে পড়াশোনা করেছে সবিতা। অঙ্ক-ইংরেজি-ইতিহাস-ভূগোল ক্লাস এইট-নাইনের মত শিখেছে। বাংলায় আরো এগিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র শেষ করে

ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা কণ্ঠস্থ। তা ছাড়া মনসামঙ্গল, মহাজন-পদাবলী, মেঘনাদ বধ, নীলদর্পণ—সারাদিন শুধু পড়ছেই পড়ছেই।

বাকি রইলাম আমি। আমার বয়েস বাইশ। ঢাকা ইউনিভারসিটির আমি গ্র্যাজুয়েট। বাবার মত কলেজে পড়তে আমাকে ঢাকা যেতে হয়নি ; গিয়েছিলাম মুন্সীগঞ্জে। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল ছয়-সাতেক। এখন সেখানেই কলেজ হয়েছে।

আমার অসম্ভব কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ছোটমাপের একটি বাসনাকে ঘিরে জীবন কাটিয়ে দেবারই আমি পক্ষপাতী।

বাবার ইচ্ছা ছিল, সোনারং হাইস্কুলে মাস্টারি করি। তা ছাড়া জমিজমা, ধানপাট এবং এই গ্রাম তো আছেই। সমস্ত আমতলি জুড়ে বাবা যে সাম্রাজ্য গড়েছিলেন যোগ্য হাতে আমি তার উত্তরাধিকার তুলে নেব ; তাঁর এই সাধে আমার আপত্তি ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই বাবার ছবি আমার চোখ জুড়ে ছিল। জীবনকে যে-ভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন আমার প্রাণে একটু একটু করে তা তীব্র মোহ এনে দিয়েছিল। সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মত বাবার বিশাল অস্তিত্ব এড়িয়ে আর কিছুই কোনদিন দেখতে পাইনি। এই অদ্বিতীয় পুরুষটি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছেন। তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর নির্দেশকে অসম্মান করার শক্তি আমার বিন্দুমাত্রও নেই।

কিন্তু কিছুই করা গেল না। সোনারং স্কুলে মাস্টারি নিতে পারলাম না ; বাবার উত্তরাধিকার হাতে তুলে নেবার আগেই আমাকে দেশ ছাড়তে হল। কেন গ্রাম ছাড়লাম সে কথা বলতে গেলে নতুন করে আমাদের গ্রামটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আমতলি গ্রামের বাইবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত ঝড়ই তো উঠেছে—কত ঢেউ, কত রক্তপাত, রাষ্ট্রবিপ্লব, মাৎসন্যায়। কিন্তু তার জীবনে 'বাহির' কোন প্রভাবই এঁকে দিতে পারে নি। এমন কি উনিশ শ' ছেচল্লিশে, সীমান্তে তখনও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি দাগ বসায় নি, সারা ভারতবর্ষ রক্তের নদী হয়ে দুলছিল। কলকাতা-বিহার-নোয়াখালি—এই কলঙ্কিত নামগুলি তখন মানুষের মুখে মুখে, কিন্তু আমতলি তাদের খবর রাখত না। ভূগোলের কোন্ প্রান্তে তাদের অস্তিত্ব সে-সব খুঁজে খুঁজে হয়রান হবার মত সময় তার নেই। দাঙ্গা-হত্যা-উত্তেজনা, এই শব্দগুলি তখনও তার কাছে অপরিচিত ; গ্রহান্তরের ভাষার মত।

সাতচল্লিশে খণ্ডিত দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে। জানা গেল, আমাদের আমতলি এখন পাকিস্তান। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। দেশের এই নতুন নামকরণ জারির আসরে, মাঘমণ্ডলের ব্রতে অথবা হোলিপ্রমত্ত দিনগুলোর ওপর ছায়াও ফেলতে পারে নি।

টুকরো টুকরো ভাবে খবর অবশ্য এসেছে; কোথায় ফরিদপুর, কোথায় খুলনা, কোথায় কুমিল্লা—সব জায়গা থেকেই দলে দলে মানুষ সাতচল্লিশের পর ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে হয় আসাম, না হয় কলকাতার দিকে চলে যাচ্ছে। দূরের কুমিল্লা, বা ত্রিপুরা হবে কেন, এই ঢাকা জেলাতেই সিরাজদীঘা-হাসাড়া-ষোলঘর-পঞ্চসার, এমন নানা গ্রাম থেকে দেশছাড়ার খবর এসেছে; তার সঙ্গে এসেছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উদ্বেগজনক অসংখ্য ঘটনার সংবাদ কিন্তু তাতে আমতলির কি? প্রশান্ত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন অনাবিষ্কৃত কোন দ্বীপের মত তখনও সে নিরুদ্বেগ; চিরদিনের স্তিমিত কক্ষপথে তখনও সে নিঃশব্দে তিরতিরিয়ে বয়ে চলেছে।

কিন্তু বছর দুই হল, আমাদের এই ঘুমন্ত গ্রামটা কেমন যেন দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে। লেগুন বলি আর দ্বীপই বলি, তাতে ঝড়ের সঙ্কেত দেখা দিয়েছে।

দু-বছর আগে ঢাকা থেকে কারা যেন এসে সোনারঙে মিটিং করে গিয়েছিল তারপর থেকে প্রায়ই তারা সেখানে আসে। এমন কি আমতলিতে এসেও কাজীপাড়ার ওদিকে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। ঢাকার ঐ লোকগুলো আসার পর থেকেই আশেপাশের গ্রামগুলোতে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে উত্তাপটা বেড়েই চ'লছে।

সোনারঙে, ওদিকে বজ্রযোগিনীতে-পাইকপাড়ায়-মীরকাদিমে-বেতকায়—এমন অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, ফলে সে-সব জায়গায় ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

পাশের গ্রামের তাপ এখানে সংক্রামিত হতে কতক্ষণ। অতএব উত্তেজনার প্রথম মুখেই বাবা 'পীস-কমিটি' তৈরী করেছেন। আমতলির অধিকাংশ মানুষই শান্তির স্বপক্ষে। 'শান্তি-দলের' সবচাইতে উৎসাহী সৈনিক হচ্ছেন বাবার বন্ধু রাজেক মৃধা—আমাদের রাজেক কাকা। তিনি এ গ্রামের সব চাইতে বড় ধনী গৃহস্থ; ছোটখাট জমিদারই বলা চলে। সম্মানের দিক থেকে বাবার পরেই তাঁর স্থান। বাবার আদর্শ বাবার কর্মপদ্ধতি রাজেক কাকাকে এমন মুগ্ধ অভিভূত করেছিল যে একরকম শিষ্যত্বই তিনি গ্রহণ

করেছিলেন। এ গ্রামে বাবা যেখানে রাজেক কাকাও সেইখানে। দু-জনের অন্তরঙ্গতা প্রবাদের মত। তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়ি ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দিয়ে এসেছেন, আমতলিতে কোনরকম বাঁদরামী বরদাস্ত করা হবে না; বেশি ওস্তাদি করলে হাত পা ভেঙে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের বাড়ি এসে বলে গেছেন, তিনি যতদিন জীবিত আছেন, এখানে কিছু হতে দেবেন না। এ গ্রাম চিরদিন যেমন চলে আসছে, তেমনই চলবে। ঢাকার সেই আগন্তুকদেরও একদিন গিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, আমতলিতে কোনরকম চালাকি চলবে না।

রাজেক কাকা আর বাবার মিলিত চেষ্টা সত্ত্বেও উত্তেজনাটা কিন্তু বেড়েই চলেছে। ঢাকার সেই লোকগুলোর আসার বিরাম নেই।

বাবার প্রতি এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষের শ্রদ্ধা এখনও অবিচল। কিন্তু একটা দল আছে তাদের চোখের তারায় আজকাল কি যেন দেখা যায়; সামনাসামনি কেউ অবশ্য কিছু বলে না। কিন্তু দৃষ্টির ভাষা দিয়ে অনেক কিছুই বুঝিয়ে দেয়। বাবা অবশ্য কিছু গ্রাহ্য করেন না।

বছরখানেক ধরে আমতলিতে নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। দেশছাড়ার জন্য অনেকের কাছে বেনামী চিঠি আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে; সেগুলোর মধ্যে শুধু শাসানি। তেমন চিঠি আমরাও খানকতক পেয়েছি। নানা ঘটনাও ঘটে গেছে গ্রামে। নিবারণ পাল আর গোসাঁইদাস কর্মকার হাট থেকে ফেরার পথে অন্ধকারে সড়কির ঘা খেয়ে এল একদিন; কারা যেন বারুইদের পানের 'বরজ' আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল, রাতের অন্ধকারে নিত্য দাসের খেতের পর খেতের ফসল উধাও হল।

সন্ধ্যা হলেই কিছুকাল ধরে ঘরে ঘরে খিল পড়ে যায়; আলো জ্বলে না; ফলে সারা গ্রাম যেন নিশুতিপুর। মাঝরাতে অনেক বাড়ির উঠোনে কারা যেন চলাফেরা করে বেড়ায়; ঘরের চালে ঢিল পড়ে। তা ছাড়া আজ আচার্যিদের গরু পাওয়া যাচ্ছে না, কাল যুগীদের ছাগল উধাও। এ সবের পিছনে কাদের হাত 'পীস-কমিটি' হন্যে হয়েও তাদের হদিস পায় না। রাতের অন্ধকারে সবার অগোচরে নিঃশব্দ পায়ে তারা বেরিয়ে আসে। ফলে একটা সন্ত্রাসের ছায়া সারা গ্রামটার ওপর অনড় হয়ে আছে।

এদিকে নীলপুজোর ঢাক থেমে গেছে, হোলির দিনের মাতামাতি স্তব্ধ। কৃষ্ণলীলার আসর, ঢপের গান, রয়ানি পালা—এ সবের সুর কিছুদিনের ভেতর গ্রাম থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। কি গ্রাম কি হল!

সবচাইতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল সেদিন, যেদিন নমঃশূদ্র পাড়ার যুবতী মেয়ে কপিলাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তার পরের দিন থেকেই জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা স্রোতের মত এ গ্রামেও ভাঙন শুরু হল। বাবা, রাজেক কাকা এবং পীস-কমিটি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করেও তাদের থামাতে পারলেন না বোঝাতে পারলেন না এ উত্তেজনা সাময়িক, কপিলাকে তাঁরা খুঁজে ব'র করবেনই। গ্রাম শূন্য করে একদল গেল আসামের দিকে, একদল আগরতলায়, আরেক দল সুদূর কলকাতার পথে পাড়ি জমাল। শান্ত লেগূনে ঝড় ভেঙে পড়েছে।

গ্রামের ভাঙন আমাদের সংসারেও নিদারুণ প্রতিক্রিয়া নিয়ে এল। মা হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেলেন যেন, 'আমি আর এখানে থাকব না। সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার বুক কাঁপছে। অন্য কোথাও আমাদের নিয়ে চল।'

বাবা বোঝালেন, রাজেক কাকা বোঝালেন, এই সাময়িক উত্তেজনার অবসান ঘটবে। গ্রামে আবার স্বাভাবিক শান্তি ফিরবে।

মা কিন্তু কিছুই শুনলেন না। উদ্‌ভ্রান্তের মত শুধু মাথা নাড়তে লাগলেন। এখান থেকে তিনি যাবেনই। বাবার সব কাজে সব কথায় চিরকাল মা সমর্থন জানিয়ে এসেছেন ; জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এই প্রথম বিরুদ্ধতা করলেন।

বাবা বার বার চেষ্টা করলেন ; জানালেন গ্রামে শান্তি আসবেই, শান্তি অনিবার্য। কিন্তু মা অবুঝ।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে এখনকার অবাধ যাতায়াত নাকি আর সম্ভব হবে না ; পাসপোর্ট হয়ে যাবে। অতএব স্থির হল, আমি আপাতত কলকাতায় আসব। কলকাতায় আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসেমশাই আছেন ; বড় সরকারী চাকরি করেন। আমি গিয়ে তাঁর কাছেই উঠব। তারপর একটা চাকরি জুটিয়ে মা-বাবা, অন্তত সবিতাকে নিয়ে আসব।

চারদিন আগে স্যুটকেশে খানকতক জামাকাপড় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপওলা সার্টিফিকেটগুলো ভরে কলকাতায় রওনা হয়েছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে এসেছিলাম নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটায়। জেটিতে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছিল ; দেশ ছেড়ে সাজানো সংসার ভেঙে তাদের কেউ এসেছে ত্রিপুরা থেকে, কেউ কুমিল্লা, কেউ ময়মনসিং, কেউ বা সুদূর চট্টগ্রাম থেকে। শুনতে পেলাম গোয়ালন্দের স্টিমারের জন্য দিনের পর দিন তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। কারো কারো প্রতীক্ষার মেয়াদ নাকি এক মাসেরও বেশি।

সারাদিনে একখানা মাত্র গোয়ালন্দের স্টিমার ; যাত্রীসংখ্যা সে তুলনায় বিপুল। অতএব অস্থির রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার বুঝি শেষ নেই।

স্টিমার জেটিতে লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ছুটেছে। কে আগে উঠতে পারে, তার এক মৃত্যুপণ প্রতিযোগিতা যেন চলেছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবনের এই দিগন্ত থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই পালাতে চায়।

একটি স্টিমারে ক'জন লোক নেওয়াই বা সম্ভব! কেউ কেউ উঠতে পারল। বাকি সবার সামনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সৌভাগ্য বলতে হবে, আমি এসে সেদিনই স্টিমারে উঠতে পেরেছি। বাবা আর রাজেক কাকা আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন। বাবার মুখ দেখে তাঁর মনোভাব বুঝতে পারি নি কিন্তু রাজেক কাকার বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে রওনা হয়ে নারায়ণগঞ্জের ঘাট থেকে স্টিমার ছাড়া পর্যন্ত সমানে আচ্ছন্ন ধরা গলায় তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'তোমরাও তা হইলে চললা। গেরাম আন্ধার হইয়া গেল, আমার বুক শূন্য হইয়া গেল।'

তারপর এই চারদিন ধরে রাজেক কাকার কণ্ঠস্বর অবিরাম আমার কানে বেজেছে ; তাঁর অশ্রুসজল চোখ দুটি আমার চোখে ভেসেছে।

যাই হোক নারায়ণগঞ্জ থেকে দশটা স্টিমারের মানুষ এক স্টিমারে ভরে আমাদের প্রথমে আনা হয়েছিল গোয়ালন্দে। তারপর ট্রেন। পারানির কড়ি ঠিকমতই গুণে দিয়েছি ; ট্রেনের গায়ে গন্তব্যের ঠিকানাও লেখা ছিল। তবু ইস্টবেঙ্গল মেল বেওয়ারিশ চিঠির মত এখানে-সেখানে পড়ে থেকে অবশেষে আজ ভোরে সীমান্তের ওপারে এক পুলিস-চৌকিতে এসে থেমেছিল। থেমেছিল বললে ভুল হবে ; ওপারের বর্ডার-পুলিস আমাদের পথ আটকেছিল। তারপর ঘণ্টা ছয়েক ধরে চলেছিল তল্লাশী। প্রতিটি পুরুষ-যাত্রী তো বটেই, এমন কি নারী এবং শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায় নি। নির্বিচারে প্রত্যেকের গোপন অন্তর্বাস পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে দেখা হয়েছে ; লুকিয়ে-চুরিয়ে চোখে ধুলো ছিটিয়ে মাথা পিছু দু'ভরি সোনা আর পঞ্চাশ টাকার বেশি কেউ কিছু নিয়ে যাচ্ছে কিনা। তল্লাশের নামে ছ'টা ঘণ্টা ট্রেনটার ওপর দিয়ে তাণ্ডব বয়ে গেছে। তারপর মুক্তির সনদ মিলেছে।

মুক্তির পর সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসেছে ট্রেনটা।

আগেই খবর পেয়েছিলাম সীমান্তের ওপারে-এপারে দুই পুলিস-চৌকি পথ জুড়ে আছে। ওপারের চৌকি তো পেরিয়ে এসেছি। এপার আমাদের জন্য কোন্ অভিজ্ঞতার মেলা সাজিয়ে রেখেছে, কে জানে।

কতক্ষণ নিজের ভাবনার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ইস্টবেঙ্গল মেল থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতে ধাক্কা লাগল যেন। জানলার বাইরে মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল, এপারের পুলিস-চৌকি এসে গেছে।

দুই

জায়গাটা এপারের সীমান্ত পুলিসের ঘাঁটিই শুধু নয়; ভারতের পূর্বপ্রান্তে বোধ হয় রেলের শেষ স্টেশন।

স্টেশন আর কি; অ্যাসবেস্টসের আব্রুহীন সংক্ষিপ্ত একটি ছাউনির তলায় একদিকে টিকিট কাউন্টার, আরেক দিকে চায়ের স্টল। মাঝখানে খানকতক বেঞ্চি ইতস্তত ছড়িয়ে। প্ল্যাটফর্ম বলতে সুরকি-ঢালা অথবা পাথর-বাঁধানো যে ছবিটা চোখের সামনে ভাসে তার চিহ্নমাত্র নেই; অ্যাসবেস্টসের ছাউনির সামনে যে খোলা মাঠ পড়ে আছে তাকে প্ল্যাটফর্মের গৌরব না দিলে স্টেশনটারই মানহানি ঘটে যাবে।

স্টেশনকুলে নিতান্তই হরিজন তবু ইস্টবেঙ্গল মেলকে এখানে থামতে হয়েছে।

যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু পুলিস এবং নানা ধরনের ইউনিফর্ম-পরা অফিসারদের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা। আমাদের এই ট্রেনটার জন্যই সম্ভবত তাঁরা প্রতীক্ষা করছিলেন।

একটু আগে আমরা নির্ভূম শরণার্থীর দল ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে মিলিত কান্নার করুণ অভিশাপ ছড়িয়ে দিতে দিতে আসছিলাম। গাড়ি থামতেই কান্নার সুর স্তিমিত হয়ে এল।

এখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, কে বলবে। ভীত উদ্বিগ্ন মৃতমুখ মানুষের দঙ্গল বুকের ভেতর শ্বাস রুদ্ধ করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ মাত্র। তারপরেই লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেল; ট্রেন থেকে সমস্ত যাত্রীকে নীচে নামার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কামরায় কামরায় পুলিসরা এসে লাউডস্পীকারে সেই কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করে গেল, 'নেমে আসুন সব নেমে আসুন—'

প্রথমটা কেউ নামল না। অনেকবার তাড়া লাগাবার পর বিহ্বল ভয়ার্ত মানুষগুলো যেন সজ্ঞানে নয়, এক সম্মোহের ঘোরে পিণ্ডাকারে নেমে গেল।

সবাই নামবার পর জানিয়ে দেওয়া হল, ইচ্ছা হলে আমরা স্নান করে নিতে

পারি। স্টেশনের পেছনদিকে টিউবওয়েল এবং পুকুর, দুই-ই আছে।

এখন সময়টা দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় থমকানো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে যে মলিন আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছিল তা আরো ম্লান হয়ে গেছে। এই প্রৌঢ় দুপুরেই পৌষের বাতাসে যেন দাঁত বেরিয়েছে। তবু আমি পুকুরে গিয়ে অনেকগুলো ডুব দিয়ে স্নান করে নিলাম।

নারায়ণগঞ্জ থেকে সেই যে স্টিমারে উঠেছিলাম, তারপর আজ স্নান করলাম। চারদিন পর শুষ্ক তাপিত দেহ জিভ মেলে জলের স্পর্শটুকু শুষে নিল যেন।

আমিই না, ইস্টবেঙ্গল মেলের সব ক'টি যাত্রীই পুকুরে শরীর জুড়িয়ে নিয়েছে। স্নানের পর এক সেবাপ্রতিষ্ঠান মাঠের ওপর সারি সারি শালপাতায় করে আমাদের ভাত ডাল আর তরকারি খেতে দিল। চারদিন পর জিভ ভাতের স্বাদ পেল। এই চারটে দিন খিদে-তৃষ্ণার কোন বোধই ছিল না। মনে হয়েছিল, সমস্ত ইন্দ্রিয় আর স্নায়ু সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এইমাত্র মনে হচ্ছে, না, সেগুলো অটুট আছে। জিভ তার স্বাদ হারায় নি, পাকস্থলী তার দাবি ভোলেনি।

খেতে খেতে শীতের স্বল্পায়ু দিনটুকু ফুরিয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনের চত্বর জুড়ে অনেকগুলো ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল।

আমাদের এবার জানিয়ে দেওয়া হল, অফিসারদের কাছে গিয়ে কে কোথা থেকে আসছি তার বিবরণ দাখিল করতে হবে।

স্টেশনের এককোণে চেয়ার-টেবিলে খাতা-পেনসিল নিয়ে কয়েকজন অফিসার বসে আছেন। শরণার্থীরা দলে দলে ভাগ হয়ে তাঁদের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। কিভাবে দাঁড়াতে হবে পুলিসরা অবশ্য তা বুঝিয়ে দিয়েছে। আমিও একটা দলে নিজেকে সঁপে দিলাম।

ওদিকে প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হয়েছে। অফিসাররা প্রশ্ন করছেন, শরণার্থীরা উত্তর দিয়ে চলেছে।

'কোথা থেকে আসছ?'

'আইজ্ঞা ফরিদপুর জিলা।'

'থানা?'

'পালং।'

'গ্রাম?'

'ঘোড়ামারা।'

'সঙ্গে ক'জন লোক?'

'আইজ্ঞা ছয়জন।'

'দেশে থাকতে কী করা হত?'

'চাষ-আবাদ।'

'পশ্চিম বাংলায় তোমার কেউ আছে?'

'আইজ্ঞা না।'

সব টেবিল থেকে সেই একই প্রশ্নমালা শোনা যাচ্ছে। উত্তরগুলো প্রায় একই; শুধু নাম-ঠিকানা, পরিবারের জনসংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্যে সামান্য হেরফের আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সওয়াল-জবাবের বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলাম।

একসময় আমার পালা এসে গেল। অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'নাম?'

বললাম, 'চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়।'

অফিসার বাঁধানো লম্বা খাতায় দাগ দেওয়া ছাপানো ঘরগুলোতে আমার উত্তর টুকতে লাগলেন।

'দেশ কোথায় ছিল?'

'ঢাকা জেলা, মুন্সীগঞ্জ থানা, গ্রামের নাম আমতলি।'

'সঙ্গে ক'জন আছে?'

'আজ্ঞে আমি একাই।'

'আর সবাই?'

'দেশের বাড়িতেই আছেন।'

'দেশে থাকতে কি করা হত? চাষবাস নাকি?

অফিসারের দোষ নেই। এখানে ট্রেনবোঝাই হয়ে যারা এসেছে, দেশে থাকতে তাদের ছিল বিচিত্র জীবিকা। কেউ কর্মকার, কেউ বারুজীবী, কেউ নরসুন্দর, সূত্রধর, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি। তবে অধিকাংশই হচ্ছে কৃষিজীবী। অফিসারদের প্রশ্নের জবাবে সেই কথাটাই তারা জানিয়েছে। একই উত্তর শুনতে শুনতে সবাইকে চাষীশ্রেণীর মানুষ ধরে নেওয়া অসম্ভব নয়। ঝোঁকের মাথায় অফিসার তাই আমাকে ঐ প্রশ্নটা করে থাকবেন। তা ছাড়া ময়লা দলিত পোশাক এবং চারদিনের দাড়িগোঁফ-ভর্তি উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে আমাকে ভদ্রলোক মনে করার কোন হেতু নেই। বললাম, 'জমিজমা আমাদের আছে ঠিকই তবে আমি ওসব দেখাশোনা করতাম না।'

'তা হলে?'

'আমি ছাত্র ছিলাম।'

'পড়াশোনা কতদূর ?'

'এ বছর বি. এ. পাস করেছি।'

এবার অফিসারের চোখেমুখে যা ফুটে উঠল তার নাম বোধ হয় বিস্ময়ই ; কিছুটা সমীহ ভাবও। সাগ্রহে সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেশ ছেড়ে এলেন যে ?'

সংক্ষেপে কারণটা জানিয়ে দিলাম।

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বিষণ্ণ স্বরে অফিসার বললেন, 'ভেরি স্যাড।'

আমি চুপ। অফিসার আবার বললেন, 'এখানে আপনার কেউ আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতায় একজন আত্মীয় আছেন। আপাতত তাঁর কাছেই যাব।'

'আত্মীয়ের ঠিকানা বলুন।'

বললাম।

এবার অফিসার রিফিউজি অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্টের ছাপানো ফর্মে আমার নাম লিখে তারিখ দিয়ে বর্ডার স্লিপ দিলেন। বললেন, 'এই স্লিপটা যত্ন করে রাখবেন, উপকারে লাগবে।'

ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের নথিতে নিখাদ উদ্বাস্তু হিসাবে আমার নাম উঠল। আমিই শুধু না, সব শরণার্থীই বর্ডার স্লিপ পেয়েছে।

যাই হোক, আগন্তুকদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখতে লিখতে রাতের একটা প্রহর পার হয়ে গেল। তারপর জানানো হল, পশ্চিম বাঙলায় যাদের আত্মীয়স্বজন অথবা নির্ভর করার মত কেউ আছে তারা ইস্টবেঙ্গল মেলে কলকাতায় যাবে। অবশিষ্টরা এখানেই থাকবে, তাদের শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে।

নির্দেশমত বেশির ভাগ মানুষই সীমান্তের এই স্টেশনটিতে পড়ে রইল। বাদবাকি আমরা ক'টি যাত্রী ট্রেনে গিয়ে উঠলাম।

রাতের দ্বিতীয় যামে শরণার্থী স্পেশাল সীমান্তের এপারের পুলিসী-চৌকি ছুঁয়ে আবার রওনা হল। এবার সোজা তার কলকাতায় যাবার কথা।

আগের সেই কামরাটিতে জানলার প্রান্ত ঘেঁষে বসে আছি। বাইরে অথৈ অন্ধকারে সব ডুবে আছে ; শীতের বাতাস যেন হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। তা ছাড়া সারাদিন ধরে যে আয়োজন চলছিল এতক্ষণে তা সম্পূর্ণ হয়েছে ; বাইরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। কাজেই জানলা বন্ধ করে দিতে হল।

কামরায় যে আলো জলছে তা মোটামুটি জোরালই। ফলে সব কিছু স্পষ্ট। এখন আর ভিড় নেই ; সীমান্তের শেষ স্টেশনে মালপত্র নামিয়ে একদল মানুষ অজানা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে। এই মুহূর্তে কামরায় জনকুড়ির মত যাত্রী ; বিক্ষিপ্তভাবে তারা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে আছে।

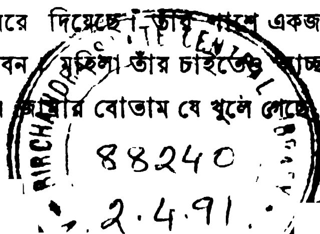
চার দিন চার রাত আমার চোখের পাতা সমানে খোলা রয়েছে। আকণ্ঠ উদ্বেগে বিন্দুমাত্র ঘুমোতে পারি নি। আজ বিকেলে চারদিন না, যেন একযুগ পরে স্নান করেছি, পেট ভরে খেয়েছি, স্টিমার আর ট্রেনের ঝাঁকুনিতে শরীরময় অশেষ ক্লান্তি ছড়ানো। অতএব সামান্য একটু আস্কারা পেলেই চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসবে। বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে একটু একটু করে আমি হারিয়ে যেতে থাকব। কিন্তু ঘুম এল না।

এ কামরায় এখন আর কোন শব্দ নেই। চারদিন পর পেটে ভাত পড়েছে, শরীরে জল পড়েছে। কাজেই মানুষগুলো ঢুলতে শুরু করেছে ; কেউ কেউ বিছানা পেতে শুয়েও পড়েছে। অমোঘ নিয়তির মত যে ট্রেনটা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার চাকায় চাকায় কর্কশ রূঢ় আওয়াজ ছাড়া এই মুহূর্তে আর সবই নীরব।

কামরার ছাদে উজ্জ্বল আলোটার দিকে তাকিয়ে আমি বসে আছি। রাজেক কাকার অশ্রুসজল চোখ, ভাঙা কণ্ঠস্বর, বাবা, মা, সবিতা, নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাট, গোয়ালন্দ, সীমান্তের এপারে-ওপারে দুই পুলিস-চৌকি টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কত ভাবনা কত স্মৃতি যে আমার চারপাশে ভিড করে আসতে লাগল !

কতক্ষণ এলোমেলো স্মৃতিলোকে মগ্ন ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ চাপা কান্নার শব্দ কানে এল, 'কমলা মা রে, তুই এখন কোথায় ? কোথায় তোকে রেখে এলাম রে মা ; এ জীবনে আর তোকে দেখতে পাব না।' কান্নাটা যেন বুক মুচড়ে মুচড়ে হৃৎপিণ্ড মথিত করে উঠে আসছে।

চকিত হয়ে মুখ ফেরালাম। আমি যে জানলাটার কাছে বসে আছি তার বিপরীত দিকের জানলা ঘেঁষে পাঁচজনের ছোট্ট পরিবার। দেখেশুনে ভদ্র শিক্ষিত বলেই মনে হয়। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক ; মুখময় অনেকদিনের দাড়ি, উদভ্রান্ত চোখ, ময়লা পোশাক, রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল, সর্বাঙ্গে কি এক দুর্বহ শোক তার সীলমোহর মেরে দিয়েছে। তাঁর পাশে একজন বয়স্কা মহিলা। সম্ভবত ভদ্রলোকের স্ত্রী-ই হবেন। মহিলা তাঁর চাইতেও আচ্ছন্ন, তেলহীন রুক্ষ চুলে মুখে ঢাকা পড়েছে। জামার বোতাম যে খুলে গেছে, শাড়ির বাঁধন ঢিলে হয়ে



লুটোচ্ছে, হুঁশ নেই। স্বাভাবিক লজ্জাটুকুর কথাও তিনি ভুলে গেছেন। শিথিলপ্রায় নিশ্চেতন শরীর ভদ্রলোকের কাঁধে এলিয়ে রয়েছে। ভদ্রমহিলার ওদিকে বছর আটেকের আর বছর বারোর দুটি ছেলে বসে আছে। আর ভদ্রলোকের এদিকে সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে। সবার চেহারাই এক। অভিভূত, বিহ্বল, আচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝাহত। এই মুহূর্তে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার সময় নয়। তবু জটপাকানো চুল, মলিন জামাকাপড় আর আচ্ছন্নতা সত্ত্বেও সপ্তদশী অথবা অষ্টাদশী মেয়েটিকে আশ্চর্য রূপসী মনে হচ্ছে। নাক-চোখ-হাতের আঙুল—সব কিছুতেই তার ধারাল দীঘল টান। তাকে ঘিরে অপরূপের একটি ছোঁয়া যেন আলোকিত হয়ে আছে।

নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটায় এদের দেখি নি, গোয়ালন্দ থেকে যখন ট্রেনে উঠেছিলাম তখনও না। খুব সম্ভব এরা তখন অন্য কামরায় ছিল। সীমান্তের এপারে পৌঁছে কামরা বদল করে এখানে এসেছে। কিংবা আমাদের কামরাতে থাকলেও লক্ষ্য করি নি।

দুর্বহ এক শোকের নদী আমরা তো সকলেই পাড়ি দিয়ে এসেছি। কিন্তু এদের মত যন্ত্রণা বুঝি কারো নয়, এমন করে ভেঙেও পড়ে নি কেউ।

যাই হোক ভদ্রলোকটির কাঁধে মাথা রেখে ভাঙা-ভাঙা জড়ানো গলায় মহিলা বলতে লাগলেন, 'আমি মরতে চাই, মরতে চাই।'

ভদ্রলোক তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আর্দ্র সদয় স্বরে বললেন, 'চুপ কর, চুপ কর। সাতদিন ধরে সমানে কাঁদছ ; এত কাঁদলে মানুষ বাঁচে !'

কান্নাটা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাথা তুলে প্রবলবেগে নাড়তে নাড়তে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মহিলা, 'বাঁচতে কে চায়। বাঁচতে আমি চাই না গো, বাঁচতে চাই না। আমাকে সবাই মিলে মেরে ফেল, মেরে ফেল।'

লক্ষ্য করলাম, মহিলাটির কান্না উচ্ছ্বসিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলোও কান্না শুরু করে দিলে। ক'দিন ক'মাস ক'বছর ক'যুগ ধরে তারা কাঁদছে কে জানে। গালে চোখের জলের দাগ আগে থেকেই ছিল। শুকনো রেখা বেয়ে আবার ধারা নামল।

ভদ্রলোক ঘন ঘন জামার হাতায় চোখ মুছছেন আর বলছেন, 'স্থির হও, স্থির হও। অত ভেঙে পড়লে সংসার একেবারে ভেসে যাবে। যে গেছে সে তো গেছেই, যারা আছে তাদের মুখের দিকে তাকাও।'

মহিলা কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছেন না। কান্নাজড়িত রুদ্ধগলায় সমানে বলে যাচ্ছেন, 'ওগো, তোমরা মেরে ফেল গো, মেরে ফেল।'

চিৎকার করতে করতে হঠাৎ কি হয়ে গেল ; স্বরটা স্তিমিত হয়ে মহিলা হঠাৎ বেঞ্চিতে এলিয়ে পড়লেন। গলার মধ্য থেকে গোঙানির মত কিছুক্ষণ অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর সব নিথর, নিশ্চুপ।

ভদ্রলোক অনেকখানি ঝুঁকে মহিলাকে মৃদু ধাক্কা দিলেন, নাড়লেন। একসময় মুখ তুলে সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঝাপসা গলায় বললেন, 'তোর মা আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে মালতী। তাড়াতাড়ি দ্যাখ্, কোথাও একটু জল পাস কিনা—'

মেয়েটির নাম তা হলে মালতী। ঘোরের মধ্যে সে উঠে দাঁড়াল, সামনের দিকে খানিক এগিয়েও গেল। কিন্তু কোথায় জল পাওয়া যায় তা বোধ হয় জানে না। অসহায়ের মত, নিরুপায়ের মত, বিহ্বলের মত, এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল সে।

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। বুকের ভেতর থেকে কে যেন এক ধাক্কায় আমাকে বাথরুমের দিকে ছুঁড়ে দিল। একটা জলের গেলাস নিয়ে এসেছিলাম, সেটা ভর্তি করে নিমেষে ফিরে এলাম।

কে জল এনেছে তা বুঝি দেখার অবকাশ নেই ভদ্রলোকের। আমার হাত থেকে গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে মহিলার চোখেমুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল। নিস্পন্দ বুক প্রথমে ধীরে ধীরে ওঠানামা করতে লাগল, তারপর ঘনশ্বসিত হল। চোখ বোজা ছিল ; আস্তে আস্তে তাকালেন মহিলা। তার আগের খেই ধরে ক্ষীণ দুর্বল স্বরে একটানা ফোঁপানি শুরু করলেন। ভদ্রলোক তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, 'কেঁদো না শান্তি, আর কেঁদো না।'

ভদ্রমহিলার নাম জানা গেল—শান্তি।

অনেকক্ষণ একস্বরে কেঁদে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন মহিলা। ভদ্রলোকের হাতের সস্নেহ স্পর্শ তাঁর মাথায় লেগেই রইল।

আমি দাঁড়িয়েই আছি। ভদ্রলোক এতক্ষণে আমার সম্বন্ধে সচেতন হলেন যেন। মহিলার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন, 'জলটা এনে দিয়ে আমার বড় উপকার করেছেন। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব! ও কি, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—'

মুখোমুখি বসতে বসতে জানালাম, সামান্য একটু জল এনে দিয়েছি ; সহ-যাত্রী হিসেবে, দেশ হারানোর একই দুঃখের পরস্পর শরিক হিসেবে এ আমার কর্তব্য। অতএব ধন্যবাদ জানালে নিজেরই কাছে নিজে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ব।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপন মনেই যেন বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাতদিন আগে নারায়ণগঞ্জে এসেছিলাম। তিনটে দিন সেখানে পড়ে থাকার পর স্টিমারে উঠতে পেরেছি। বাড়ি ছাড়া থেকেই সমানে কাঁদছে, আর কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে।'

বুঝলাম কার কথা বলছেন ভদ্রলোক। কী বলব ভেবে পেলাম না।

তিনি বলতে লাগলেন, 'স্টিমারে আর ট্রেনে ওকে নিয়ে কি বিপদে যে পড়েছি! তার ওপর এই বাচ্চাকাচ্চাগুলো রয়েছে।'

ভদ্রলোকের কষ্টটা অনুমান করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। একে তো দেশ খোয়ানোর দুঃখ, তার ওপর নতুন পৃথিবীতে পাড়ি দেবার উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, অনাহার, ভিড়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহিলার অবিরাম কান্না আর ঘন ঘন মূর্ছা। আশ্চর্য, এর ভেতরেও কি এক অলৌকিক ক্ষমতায় ভদ্রলোক মাথা স্থির রাখতে পেরেছেন।

সান্ত্বনা দেবার প্রলোভনটা কিছুতেই এবার সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'দেশ ছাড়ার দুঃখটা উনি বোধ হয় কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। তাই—'

হঠাৎ কেমন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। অস্থির শিথিল স্বরে বললেন, 'শুধু দেশই তো ছেড়ে আসি নি। বড় মেয়েটাকে ফেলে আসতে হয়েছে, তাকে আনতে পারলাম না—,' বলতে বলতে দুঃসহ কান্নায় স্বরটা বুজে এল।

'আনতে পারলেন না কেন? কী হয়েছে তার?' শ্বাসরুদ্ধের মত জিজ্ঞেস করলাম।

'কেন পারলাম না জানেন—,' হঠাৎ ভদ্রলোকের সজল চোখের তারা দুটো মশালের শিখা হয়ে উঠল যেন।

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিলেন তা আর বলা হল না। সেই মেয়েটি, মালতী যার নাম, চোখে-নাকে যার ধারাল দীঘল টান—তীক্ষ্ণ চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা!'

বোঝা গেল, ঐ ডাকটার মধ্যে অদৃশ্য নিষেধ রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ঘোর কেটে গেল; চোখের সেই মশালও নিভল। ঘাড়টা ভেঙে সামনের দিকে ঝুলে পড়ল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'থাক ও কথা, থাক। কী হবে বলে! কী হবে শুনে! বাপ হয়ে মেয়েকে রক্ষা করতে পারি নি; আমার মরে যাওয়াই ভাল, মরে যাওয়াই

ভাল।'

কেন মেয়েকে আনতে পারেন নি। জিজ্ঞেস করা বোধ হয় অনুচিত। আমি চুপ করে রইলাম।

এরপর একটানা নীরবতা। ট্রেনের চাকায় বিচিত্র সব আওয়াজ, আর বাতাসে তার প্রতিধ্বনি ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই।

অনেকক্ষণ পর স্খলিত ঘাড়খানা তুলে ভদ্রলোক আবার আমার দিকে তাকালেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, তাঁর চোখ দুটি টকটকে লাল—হয়ত অনিঃশেষ কান্নায়, হয়ত দুর্ভাবনায়, হয়ত দিনের পর দিন নিদ্রাবিহীন রাত কাটানোর ফলে শরীরের সব রক্ত ওখানে গিয়ে জমা হয়েছে। শুধু তাঁরই না, দেখলাম ছেলে দুটো এবং মালতীরও চোখ ফোলা-ফোলা এবং আরক্ত।

বিষাদমলিন স্বরে ভদ্রলোক বললেন, 'কেন মেয়েকে আনতে পারি নি, সে কথা শুনবার মত নয়। দেশ ছাড়ার দুঃখ তো আপনার আছেই। আমাদের কথা শুনলে কষ্ট আরো বাড়বে। দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে কি লাভ। তা ভাই, আপনি আমাদের উপকার করলেন ; নামটা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।'

ভদ্রলোক দেখছি, জল এনে দেবার কথাটা ভুলতে পারছেন না। যাই হোক, নাম বললাম।

নামই না, আমার দেশ কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে, সংসারে কে কে আছে, কেন দেশ ছেড়েছি, আমাদের ওদিকে কোন গণ্ডগোল চলছে কিনা, কোথায় যাচ্ছি, কলকাতায় যাচ্ছি শুনে বললেন সেখানে কার কাছে উঠব ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন।

সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঈষৎ হেসে বললাম, 'আমার কথা তো শুনলেন। আপনার কথা কিন্তু কিছুই জানা হল না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম শিশিরকুমার মুখুটি। মানিকগঞ্জে আমার দেশ। পোস্টমাস্টারি করতাম। পার্টিসান হবার পর 'অপসান' দিয়ে দেশেই থেকে গিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকা আর গেল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছেলে দুটো, মেয়েটা আর স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসতে হল।' বুকের অতল স্তর ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল তাঁর।

মনে মনে আগেই অনুমান করেছিলাম, ঐ মহিলাটি ভদ্রলোকের অর্থাৎ শিশিরবাবুর স্ত্রী। অনুমানটা মিথ্যে নয়।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'কলকাতায় বাগবাজারে আমার এক ভায়রা থাকে। তাকে চিঠি দিয়েছি; আপাতত তার ওখানে গিয়েই উঠব। বর্ডারে

তো দেখলেনই, মাথা পিছু দু'ভরি করে সোনা আর পঞ্চাশটা করে টাকা আনতে দিয়েছে। সেই হিসেবে পাঁচজনে দশ ভরি সোনা আর আড়াইশ টাকা আনতে পেরেছি। ঐ ক'টা টাকায় আর ঐটুকু সোনায় কি যে হবে! কলকাতায় গিয়ে রোজগারের একটা পথ ধরতে না পারলে ছেলেপুলে নিয়ে নির্ঘাত মারা পড়ব। কি যে করব ওখানে গিয়ে!'

আমি চুপ।

শিশির মুখুটি আবার বললেন, 'আপনি তো বললেন, যাদবপুরে আপনার পিসেমশাইর বাড়িতে উঠবেন?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার ভায়রার বাসার ঠিকানাটা রেখে দিন, বারো নম্বর গোপাল আড্ডি লেন, বাগবাজার। এক দেশের মানুষ; আলাপ-পরিচয় হল। সময় পেলে আসবেন।'

কাগজ-কলম এখন আর কোথায় পাব, স্মৃতিতেই ঠিকানাটা টুকে রাখলাম। বললাম 'নিশ্চয়ই যাব।'

এরপর আর কোন কথা নয়। নিঃশব্দে একসময় কখন নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি বলতে পারব না। ইস্টবেঙ্গল মেল পৌষের হিমাক্ত অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। কলকাতায় গিয়ে জীবনের কোন দিগন্তে সে আমাকে পৌঁছে দেবে, জানি না।

তিন

অবশেষে কলকাতা। সঠিকভাবে বলতে গেলে অবশ্য কলকাতা নয়; শিয়ালদা স্টেশন।

ঢাকা জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে কবে যাত্রা শুরু করেছিলাম, এই মুহূর্তে মনেও পড়ছে না। মনে হচ্ছে অনিঃশেষ উদ্বেগের ভেতর কয়েকটা বছর, নাকি কয়েকটা যুগ অথবা শতাব্দী পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছুতে পেরেছি।

কলকাতার পূব দেউড়িতে শিয়ালদা স্টেশন। ইস্টবেঙ্গল মেল যখন এসে সেখানে থামল তখনও ভাল করে ভোর হয় নি। শীতের নিশান্তে যে কুণ্ঠিত আলোটুকু ফুটেছে দিনের শুরুটাকে উজ্জ্বল উৎফুল্ল করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। সীমান্তের ওপারে থাকতেই আকাশে অকালের মেঘ জমে ছিল, এপারের বর্ডার

পুলিসের কাছ থেকে মুক্তির সনদ পাবার পর যখন গাড়িতে উঠি প্রায় তখন থেকেই ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল। তারপর প্রায় সমস্ত রাত একটানা বর্ষণ চলে শেষরাত্রের দিকে থেমেছে। আকাশ যদিও এখন ক্ষান্তবর্ষণ তবু ভারাক্রান্ত হয়েই আছে। উত্তর-দক্ষিণে-পূবে অথবা পশ্চিমে, যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধু স্তরে স্তরে সাজানো ঘন মেঘ, কুয়াসা আর আধো-তরল অন্ধকার।

ইস্টবেঙ্গল মেল ভূগোলের যে প্রান্তে আমাদের পৌছে দিল, আশ্চর্য, সেখানে এতটুকু আলো নেই। কলকাতার নিরুত্তাপ দীপ্তিহীন সকাল আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে একটি হাতও বাড়িয়ে দেবে বলে মনে হল না।

ট্রেনটা শিয়ালদায় আসতেই অসংখ্য উৎকণ্ঠিত মুখ জানলায় দেখা দিতে শুরু করেছে। চোখের দৃষ্টিতে আর কপালের গভীর রেখায় রেখায় অসীম উদ্বেগ আর শঙ্কা মুদ্রিত হয়ে আছে তাদের শুধু শঙ্কিত আর উদ্বিগ্নই নয়, মনে হল, কয়েক রাত ধরে তারা বুঝি ঘুমোচ্ছে না। বিনিদ্র রাতের কালিতে চোখের কোল লিপ্ত।

জানলায় জানলায় তারা শুধু মুখই বাড়ায়নি; রুদ্ধশ্বাসে উদ্বিগ্ন স্বরে ডাকাডাকি করেও যাচ্ছে, 'সুরেন্দ্র এসেছ? সুরেন্দ্র—'

'হরিপদ—হরিপদ—'

'যোগেন—যোগেন—'

ডাকাডাকি ছোটাছুটি এবং ব্যস্ততায় শিয়ালদা স্টেশন মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠেছে। সে মুখরতার বুকের তলায় সীমাহীন উৎকণ্ঠা পাথরের মত অনড় হয়ে আছে।

অনুমান করলাম, সীমান্তের এপারের আত্মীয়স্বজন ওপারের আগন্তুকদের নিয়ে যাবার জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে।

আমি যে জানলায় বসে আছি সেখানে এক এক দল মানুষ আসছে, ডাক দিচ্ছে এবং সাড়া না পেয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই আরেক দলকে দেখা যাচ্ছে।

একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিন্তু ডেকে খোঁজ না পেয়েও চলে গেলেন না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ তিনদিন পর ইস্টবেঙ্গল মেল এল। রোজ আসছি; সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। গাড়ি আর আসে না। কি ব্যাপার বলুন তো? রাস্তায় কোন গেলেমাল-টোলমাল হয়েছিল?'

বললাম, 'না।'

'তবে এত দেরি হল কেন?'

দেরি হবার কারণটা সংক্ষেপে বললাম।

ভদ্রলোক একটু কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোন্ ডিষ্ট্রিক্ট থেকে আসছেন?'

'ঢাকা।'

'আপনাদের ওখানকার খবর কী?'

'খুব একটা সুবিধার নয়।'

'আচ্ছা, কুমিল্লার কোন খবর জানেন?'

'না।'

চিন্তাগ্রস্তের মত ভদ্রলোক এবার বললেন, 'দিন কুড়ি আগে কুমিল্লা থেকে দাদা চিঠি দিয়েছিলেন, গ্রাম ছেড়ে চলে আসছেন। রোজ একবার করে স্টেশনে আসছি কিন্তু দাদা আসছেন না। এদিকে কোন খবরও নেই। কী যে করব!'

বুঝতে পারলাম, এপারের স্বজনেরা ওপারের আত্মীয়দের জন্য কী আকণ্ঠ উদ্বেগে দিনযাপন করে চলেছে। আশ্বাসের স্বরে বললাম, 'নারায়ণগঞ্জ দিয়ে আপনার দাদাকে আসতে হবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানকার জেটিঘাটায় হাজার হাজার মানুষ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করে আছে। সারাদিনে গোয়ালন্দের একটিমাত্র স্টিমার। অত লোক ধরা তো সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, আপনার দাদা ওখানে আটকে আছেন।'

'তা হবে।' ভদ্রলোক চলে গেলেন।

তারপরও আমি অনেকক্ষণ বসে আছি। পিসেমশাইকে চিঠিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোন্ তারিখে আমি রওনা হচ্ছি। স্টেশনে কারোকে পাঠিয়ে আমাকে যেন নিয়ে যাওয়া হয়। এত মানুষ তাদের পরিজনদের সন্ধানে এসেছে কিন্তু আমার জন্য তো কেউ আসছে না। পিসেমশাইকে আগে কখনও দেখি নি; তিনি যদি কারোকে পাঠান সে আমার সম্পূর্ণ অচেনাই হবে। কিন্তু চিঠিতে আমার নাম দেওয়া আছে। সুরেন্দ্র-হরেন্দ্র-প্রাণবল্লভ-রসিক-গোপীনাথ, কত নামই তো শিয়ালদা স্টেশনের ভারাক্রান্ত মেঘাচ্ছন্ন ভোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিজের নামটা শুনতে পাচ্ছি কই? আমি ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলাম।

এদিকে আমার সহযাত্রী শিশির মুখুটির ভায়রাভাই খুঁজতে খুঁজতে এ কামরায় এলেন। শিশির মুখুটির স্ত্রী অনেকখানি সুস্থ হয়েছেন ; ঘুমও ভেঙে গেছে ; জেগে উঠে বিষাদমগ্ন নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছেন।

শিশির মুখুটির ভায়রাভাই। তাঁর স্ত্রীর তা হলে কি হবে? অবশ্যই ভগ্নীপতি। ভগ্নীপতিকে দেখে ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'আমার সর্বস্ব গেছে জামাইবাবু—'

ভগ্নীপতি তাঁর দু-হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'কেঁদো না, কেঁদো না—'

কান্না আর সান্ত্বনার মধ্যে শিশির মুখুটি সীমান্তের ওপার থেকে নিয়ে-আসা মালপত্র গোছগাছ করে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে সবাইকে নামতে বললেন। সকলে নামলে আমাকে বললেন, 'আপনাকে নিতে কেউ এল না?'

অস্থিরতাটা যতখানি সম্ভব গোপন করে বললাম, 'আসবার তো কথা ; এখনও কেন যে আসছে না—'

'এসে নিশ্চয়ই পড়বে।'

'আশা তো করছি।'

শিশির মুখুটি বললেন, 'আমরা তা হলে চললাম ভাই—'

'আসুন—' আমি মাথা নেড়ে বিদায় জানালাম।

'বাগবাজারের ঐ ঠিকানায় যাবেন কিন্তু—', বার বার অনুরোধ জানিয়ে শিশিরবাবুরা চলে গেলেন।

আরো খানিকটা সময় কাটল ; আমি জানলার বাইরে উদ্‌গ্রীব তাকিয়েই আছি। প্ল্যাটফর্মে বিষণ্ণ করুণ কিছু কিছু দৃশ্য চোখে পড়ছে। সীমান্তের ওপার থেকে যে সব-হারানোর দল শেষ পর্যন্ত কলকাতায় আসতে পেরেছে তাদের ঘিরে এপারের আত্মীয়-স্বজনেরা কান্নায় আর বিষাদে আচ্ছন্ন।

নারায়ণগঞ্জে দেখেছিলাম হাজার হাজার মানুষের চোখেমুখে পাহাড়প্রমাণ কান্না থমকে রয়েছে। সীমান্ত পর্যন্ত তারা এসেছিল শ্বাসরুদ্ধের মত, নিঃশব্দে। অবশেষে এপারে আসতেই যে কান্নাটা থমকে ছিল হৃৎপিণ্ড চুরমার করে দুর্বার ঢলের মত বেরিয়ে এসেছে। তারপর অবিশ্রান্ত বর্ষণের মত কান্নাই চলছে ; এমন কি শিয়ালদা পৌঁছেও তার শেষ নেই। কিংবা কে আমায় বলে দেবে, যে কান্না নিয়ে তারা সীমান্ত পেরিয়েছে বাকি জীবনটুকু তা তাদের পায়ে পায়ে ফিরবে কিনা?

কাল থেকে অবিরাম কান্না শুনছি। শুনতে শুনতে আমার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াটা আর তেমন তীব্র নেই। তা ছাড়া এই মুহূর্তে কান্নাটা আমার

চেতনায় রেখাপাতও করতে পারছে না। উন্মুখ আগ্রহে আমি শুধু প্রতীক্ষা করছি ; কখন এই জানলার কাছে একটি মুখ এসে ডাকবে, 'চিরঞ্জীব এসেছ ? চিরঞ্জীব—'

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তেমন কারোকেই দেখা গেল না। তবে কি ডেকে ডেকে আমাকে না পেয়েই চলে গেছে ? তা-ই বা কী করে হবে ? সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ একাগ্র করেই তো বসে আছি। একটি শব্দেরও তাদের এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। অতর্কিতে দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনা আমার মনে ছায়া ফেলে গেল। পিসেমশাই আমার চিঠি পেয়েছিলেন তো ? না পেয়ে থাকলে আর স্টেশনে লোক পাঠাবেন কেমন করে। এই সম্ভাবনাটা মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত মনে হল।

যাই হোক জানলার বাইরে আরো খানিকটা মুখ বাড়িয়ে যতদূর চোখ যায় দেখতে লাগলাম। অনুমান করলাম, ইস্টবেঙ্গল মেল শূন্য করে সবাই নেমে গেছে। আর কতক্ষণ বসে থাকব ? আমার সঙ্গে মালপত্র বলতে ছোট একটা স্যুটকেশ আর বিছানা। সেগুলো হাতে ঝুলিয়ে একসময় নেমেই পড়লাম। পিসেমশাইয়ের ঠিকানাটা সঙ্গেই আছে খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত কি আর পৌঁছুতে পারব না ?

কলকাতা। ঢাকা জেলার এক নগণ্য কৃষাণগ্রামে বসে ভারতবর্ষের এই সর্ববৃহৎ শহরটিকে স্বপ্নরাজ্য বলেই মনে হয়েছে। অর্ধবিস্মৃত শৈশব থেকে এই নগর চূড়ামণিটি সম্বন্ধে হাজার কিংবদন্তী শুনেছি। শুনেছি আর মুগ্ধ হয়েছি : মুগ্ধ এবং বিস্মিত ; বিস্মিত এবং চমৎকৃত।

গ্রামের ছেলে আমি। মহকুমা শহর মুন্সীগঞ্জ গেছি, জেলাশহর ময়মনসিং-এ গেছি, তার চাইতে বড় নগরী নারায়ণগঞ্জেও গেছি। এমন কি পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকাতেও এক-আধবার ঘুরে এসেছি। কিন্তু সে-সবের সঙ্গে কলকাতার কোন তুলনাই নাকি চলে না। কলকাতা অনুপমা, অভাবনীয়া।

শখ হলে সাধ হলে মানুষ দেশ-দেশান্তরে বেড়াতে যায়। আমাদের গ্রামের কেউ কেউ এ শহরে এসে দু-চারদিনের জন্য মরসুমী ফুল হয়ে ফুটে গেছে। প্রাণে তেমন শখ যে না ছিল তা নয় ; কিন্তু তেমন সুযোগ কখনও পাই নি। বাবার জন্যই তা সম্ভব হয় নি। বাবা চিরদিনই শহরবিমুখ ; কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। অকারণের খেলায় চড়ে দেশবিদেশে পাড়ি দেবার ভেতর যে উদ্দাম যাযাবরত্ব তার প্রতি বাবার বিন্দুমাত্র মোহ নেই। অশেষ ক্লেশে এবং অযথা খরচ করে দূর দেশের দুর্গম পর্বতে অথবা দুস্তর সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে কতটুকু লাভ ? ঘর থেকে শুধু দুই পা ফেলে ধানের শীষে শিশিরবিন্দুটি দেখার মধ্যে

অনেক বেশি চরিতার্থতা। বাবার মতে নিজের জন্মভূমিটাকে ভালো করে দেখো, নিজের প্রাণে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করো,কাছের মানুষগুলোকে জানো। তা হলেই জগৎদর্শন হয়ে যাবে। নিজের চারপাশেই স্বর্গমর্ত, ভূলোক-দ্যুলোক ছড়িয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার করতে পারলেই হল। সেজন্য দূরে যাবার প্রয়োজন নেই।

আমাকে তিনি গ্রামের মধ্যেই ধরে রাখতে চাইতেন। বাবার প্রভাব আমার ওপর এত দীর্ঘ এত দূরপ্রসারী যে তা অমান্য করার সামর্থ্য আমার ছিল না।

যে কলকাতাকে জীবনের বাইশ-তেইশটা বছর ধরে নিভৃত শিহরণের মত বুকের ভেতর লালন করে আসছি সেই স্বপ্নরাজ্যের মাটিতে প্রথম পা দিয়ে কিন্তু রোমাঞ্চিত বোধ করলাম না। রোমাঞ্চিত হতে পারাটা বোধ হয় পরিবেশ এবং মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। সব সময় সমস্ত পরিবেশে বিস্মিত শিহরিত হওয়া যায় না।

সামনের দিকে দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম। তার মাথায় অনেক উঁচুতে আচ্ছাদন রয়েছে। ফলে ভোরবেলাতেও এখানে দিনের আলো নেই ; সে আলো না থাকার আরেক কারণ অবশ্য অকালের মেঘ।

তবে যতদূর চোখ যায় ফ্লুরেসেণ্ট আলোর ঢল নেমেছে ; ফলে স্টেশন-চত্বর উজ্জ্বল, ঝলকিত। মাথার ওপর ছাদকে ধরে রাখার জন্য বিরাট বিরাট লোহার স্তম্ভ। সেগুলোর গায়ে নানা বিজ্ঞাপন। মাথার তেল, সাবান, দাঁতের মাজন ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কিছুই মনোহর ভঙ্গিতে যাত্রীদের প্রলুব্ধ করে যাচ্ছে।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। ইস্টবেঙ্গল মেলের সবুজ দেহ ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগল। এ গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তাদের সবাই এখনও চলে যায় নি ; কেউ কেউ প্ল্যাটফর্মে ইতস্তত বসে আছে। বেশির ভাগই আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে কাঁদছে। নাঃ, কান্নার শেষ নেই দেখছি।

গেটে টিকিট জমা দিয়ে স্টেশনের ভেতরে আসতেই হকচকিয়ে গেলাম। ভেতরে কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ। শিশু, যুবক বৃদ্ধ, যুবতী, প্রৌঢ়। সবাই ক্ষুধার্ত, শীর্ণ, উচ্চকিত এবং ভয়াতুর। আট-দশ ফুটের মত জায়গার চারদিকে ইট বসিয়ে সীমানা ঠিক করে একেকটা করে পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। হাঁড়িকুড়ি, উনুন, বিছানা ইত্যাদি দেখে অনুমান করলাম, খাওয়া-শোয়া রান্না-বিশ্রাম সব কিছু ওরই মধ্যে।

নিজের মাথায় অন্তহীন দুর্ভাবনা, তবু মুহূর্তের জন্য তা যেন বিস্মৃত হয়ে

গেলাম। অজান্তে কখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। এরা কারা ?

এই বিপুল জনতা—সবাই তো আর মুখ বুজে নেই। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছে ; ভাষা শুনে মনে হল পূর্ব বাংলার মানুষ।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সেই জবাবই পেলাম ; অর্থাৎ পূর্ব বাংলার মানুষই। পরিচয়টাকে অর্থময় করার জন্য আরেকটা শব্দও উচ্চারণ করল, 'আমরা রিফুজ—।'

'রিফুজ' অর্থে রিফিউজি। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-বৌদ্ধের মত নতুন আরেকটা জাতও ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার নাম রিফিউজি।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করে এবং প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম। গৃহহান শরণার্থীদের মধ্য দিয়ে পথ করে এগুতে হচ্ছে। যেতে যেতে আমার মনে হতে লাগল, এটা কোন কাল ? বিংশ শতাব্দীই কি ? না হাঁটতে হাঁটতে অমি ইতিহাসের সেই প্রথম উষায় ফিরে গেছি ? সেই আদিম যুগে এক গোষ্ঠী নিতান্ত অকারণেই হয়ত আরেক গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে লুণ্ঠন করত, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিত। পরাজিত দলের যুবতী নারীগুলি হত জয়োদ্ধত আগন্তুকদের যদৃচ্ছ ভোগের বস্তু। শিশু-বৃদ্ধ-যুবক প্রৌঢ়-বৃদ্ধা, বাদবাকি সবাইকে শাণিত তলোয়ারের তলায় মাথা সঁপে দিতে হত। এদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা পালিয়ে বাঁচত।

শিয়ালদা স্টেশনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মনে হল সেই কলঙ্কিত অন্ধকারময় অতীতের মত পরাভূত পলাতকেরা সর্বস্ব হারিয়ে দলে দলে এখানে এসে ভিড় জমিয়েছে।

যাচ্ছি আর স্টেশনের চারদিকে লাল সালুর কাপড়ে অসংখ্য ফেস্টুন চোখে পড়ছে। বিভিন্ন কলেজ এবং সেবা-প্রতিষ্ঠানের নাম তাতে লেখা। মনে হল, পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের সেবার জন্য তারা এখানে এসেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগলেও জিজ্ঞেস করার সময় এটা নয়। পিসেমশাইর ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে হবে ; সেই দুশ্চিন্তাটাই আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি স্টেশনের বাইরে রাস্তায় চলে এলাম।

অন্ধকারে ফস করে দেশলাই জালার মত শীতের মেঘমলিন ভোরে কলকাতা মূহূর্তের জন্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আমি সুদূর পূর্ব বাঙলার এক ভীরু ছেলে, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। ট্রাম-বাস-মোটর-রিক্শা—গাড়ি আর মানুষের স্রোত চলেছে দিগ্বিদিকে ; কোন্ স্রোতে ভাসলে যাদবপুরে পিসেমশাইর ঠিকানায় পৌঁছুতে পারব কে বলবে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি আর মানুষ দেখলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে রাস্তার একটি লোককে জিজ্ঞেস করে যাদবপুরের বাসে উঠে বসলাম।

* * *

খুঁজে খুঁজে যাদবপুরে পিসেমশাইর ঠিকানাটা যখন বার করলাম তখন প্রায় দুপুর। আবিষ্কারই বোধ হয় তাকে বলা যায়। রাস্তার একটা নাম এবং নম্বর অবশ্যই আছে কিন্তু সে দুটো বার করতে পুরো যাদবপুরটাই খুব সম্ভব ঘুরেছি।

জায়গাটা আধা-নগর আধা-গ্রাম। শহরের কিছু কিছু দাক্ষিণ্য এখানে এসে পড়েছে এবং কলকাতার কাছাকাছিও বটে তবু যেন কলকাতা নয়। রাস্তাগুলোর কতক পীচের মলাট-পরানো; বেশির ভাগই খোয়া দেয়; তাদের দুধারে বিজলী আলোর পোস্টও চোখে পড়ছে। এই উনিশশ' একান্নয় মানুষ এবং ঘরবাড়ি বেশ কম; নির্জনতাই বেশি, ফাঁকা জায়গাও প্রচুর। গাছগাছালি; ঝোপঝাড়, পুকুর, পাখির ডাক—জায়গাটার সর্বাঙ্গে গ্রাম যেন তাঁর স্নিগ্ধ ছোঁয়াটুকু মেখে রেখেছে।

কলকাতা যেন অবহেলায় জায়গাটাকে দূরেই সরিয়েরেখেছে আর অভিমান ভরে যাদবপুরও কলকাতার কাছে এগিয়ে যায় নি।

পিশেমশাইর বাড়িটা দোতলা; সামনের দিকে বিস্তৃত বাগান। বাগানটাকে ঘিরে উঁচু প্রাচীর টানা। মাঝখানে উঁচু লোহার গেট।

গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। গেটের দুপাশে প্রাচীরের গায়ে দুটি শ্বেতপাথরের ফলক। একটিতে লেখা ঠিকানা, ৫৭, বসন্ত মল্লিক রোড, যাদবপুর। দ্বিতীয় ফলকটিতে নাম; চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। চিত্তরঞ্জন পিসেমশাইর নাম। সঠিক ঠিকানাতেই যে এসেছি তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

বাইরে দাঁড়িয়েই খানিক উঁকিঝুঁকি দিলাম কিন্তু কারোকেই দেখা যাচ্ছে না। মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত ডাকাডাকি শুরু করলাম কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া নেই। এ বাড়ি কি মানুষ-বর্জিত? কে জানে। এত দূর যখন এসেছি তখন ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না তা ছাড়া যাবই বা কোথায়?

একসময় মরিয়া হয়ে ভেতরে ঢুকে পডলাম। এ বাড়ির যিনি মালিক তাঁর প্রাণে যে শখের অবকাশ আছে তা সামনের বাগানটা দেখেই অনুমান করা যায় দেশী-বিদেশী নানা ফুলের সমারোহে চারদিক উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে। ফুলগুলির অধিকাংশেরই নাম আমার অজানা।

বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়িবিছানো একটা পথ ঋজুরেখায় গাড়িবারান্দায় গিয়ে থেমেছে। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে আমি সেখানে চলে এলাম। আর

তখুনি মধ্যবয়স্ক একটি লোকের মুখোমুখি পড়ে গেলাম, খুব ব্যস্তভাবে বাড়ির ভেতর থেকে সে বেরিয়ে আসছিল।

লোকটির চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো ; গায়ের রং তামাটে, পেশীবহুল দেহ। ঘোলাটে ধরনের চোখে স্নেহতরল দৃষ্টি। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। দেখেই বোঝা যায়, লোকটা চাকর-বাকর শ্রেণীর।

আমাকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ?

আমার নাম বলে প্রশ্ন করলাম, 'এটা চিত্তরঞ্জনবাবুর বাড়ি তো ?' ফলকে নাম-ঠিকানা দেখে নিঃসংশয় হয়ে ভেতরে ঢুকেছি তবু প্রশ্নটা করলাম।

'আজ্ঞা।' লোকটা ঘাড় কাত করল, 'তা আপনি কোথা থেকে আসছেন ?'

'ঢাকা থেকে।'

লোকটার ঘোলাটে চোখ এবার অলোকিত হয়ে উঠল যেন, 'আপনারই তো আসবার কথা ছিল ; দেশ থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'আমার চিঠি এখানে পৌচেছিল ?'

'পয়সা খরচা করে চিঠি পাঠালেন আর পৌছুবে না ?

যুক্তিটা অকাট্য, অতএব এ প্রসঙ্গে আর কিছু বললাম না তবে একটা প্রশ্ন মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছিল ; চিঠি যদি এসেই থাকে তবে স্টেশনে লোক যায় নি কেন ?

এবার লোকটা বলল, 'তা আপনি একলা যে ? ছোট দাদবাবু কোথায় ?'

'ছোট দাদাবাবু কে ?' আমি প্রায় হতবাক।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা, 'ইষ্টিশানে আপনাকে কেউ আনতে যায়নি ?'

'না তো।'

লোকটা একমুহূর্ত কী ভাবল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, আপনি আসুন। হ্যাঁ, ভাল কথা, মালপত্তরগুলোন আমার হাতে দ্যান দিকিন।' বলে আমার হাত থেকে স্যুটকেশ আর বিছানা নিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

গাড়ি-বারান্দার পর কাচ-বসানো বিরাট দরজা পেরিয়ে খানিকটা গেলেই দোতলার সিঁড়ি। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

যদিও ঠিক জায়গাতেই এসেছি তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। চেহারায় এবং আচরণে তো লোকটা চাকরবাকরের মতই কিন্তু তার পিছুপিছু কোথায়

যাচ্ছি জানি না। কোথাও যাবার আগে আমার আশ্রয়দাতার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। দোতলার সিঁড়ির মুখে আসতে বলেই ফেললাম, 'চিত্তবাবু আমার পিসেমশাই হন।'

লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আজ্ঞা আমি জানি। বড়বাবু আমায় বলেছে, দেশ থিকে তেনার সম্বন্ধীর ছেলে আসবে। আপনি যখন বললেন দেশ থেকে এসেছেন তখনই সম্পর্কটা ধরে ফেলেছি।'

'পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আমি এখন দেখা করতে চাই।'

'তেনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি।'

'উনি বাড়িতেই আছেন ?'

'আজ্ঞা।'

একটু ভেবে বললাম, 'পিসেমশাইকে আগে কখনও দেখি নি। শুনেছি উনি চাকরি করেন। আজ বাড়িতে আছেন ; ছুটি বুঝি ?'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞা না ; মাসখানিক হল বড়বাবু চাকরি থেকে 'রিটাড' করেছেন।'

'রিটাড' শব্দটা যে রিটায়ার্ডের অপভ্রংশ, বুঝতে অসুবিধে হল না। চাকরি থেকে যখন অবসর নিয়েছেন তখন সারাদিনই তো বাড়িতে থাকার কথা।

একটা দুর্বার কৌতূহল অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দুলিয়ে যাচ্ছিল। খানিক দ্বিধার পরে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'আচ্ছা—'

'বলেন—'

'পিসেমশাই মানুষটা কেমন ? খুব রাগী-টাগী নয় তো ?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, 'দু-চার দিন থাকুন, দেখুন। তা হলে নিজেই বুঝতে পারবেন।'

বুঝলাম যে প্রভুর কাছে লোকটা কাজ করে তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করবে না। ভালো কি মন্দ, রাগী কি শান্ত, তা আমাকেই বুঝে নিতে হবে।

দোতলায় উঠে দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানার সামনে আমাকে নিয়ে এল লোকটা। ভেতর থেকে দরজা ভেজানো রয়েছে। লোকটা ডাকতে লাগল, 'বড়বাবু—বড়বাবু—'

ঘরের মধ্য থেকে ভারী গম্ভীর গলার সাড়া পাওয়া গেল, 'কে, মঙ্গল ?'

'আজ্ঞা—'

'কী ব্যাপার ?'

'দেশ থেকে লোক এসেছে।'

'কোথায় ?'

'আমার সঙ্গেই রয়েছে।'

এবার অন্তরালের স্বরটা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ভেতরে নিয়ে আয়।'

আমার বুক এই মুহূর্তে দুরু-দুরু। প্রথমত কলকাতা নামে এই বিশাল রহস্য-ময় মহাদেশে আজই আমি পা ফেলেছি। গ্রামের ভীরু ছেলে; চিরদিন যাদের সঙ্গে চলেছি ফিরেছি তারা চাষাভুষো সাধারণ মানুষ, সেখানে কেতাদুরস্ত হবার অবকাশ ছিল না। অবশ্যই আমাদের সম্পন্ন অবস্থা। ধানে-পাটে-মুসুরে-কলাইতে সচ্ছলতা একবারে উছলে উছলে পড়ে। তবু দেশে আমরা টিনের ঘরেই থাকি। কিন্তু যাদবপুরের এই বাড়ি মোজেক-করা, ঝকঝকে। সামনের বাগানখানায় চমৎকার করে সাজানো ফুলের গাছ, নুড়ির পথ, এই মুহূর্তে ভেতর থেকে আসা গম্ভীর ভারী কণ্ঠস্বর—সমস্ত একাকার হয়ে আমার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটি ঘনিয়ে তুলল তার নাম অস্বস্তি। নিদারুণ অস্বস্তি। মনে হতে লাগল, এখানে থাকলে আমি বুঝি সাবলীল হতে পারব না। দেশে থাকতে প্রাণ খুলে হাসতাম, বাতাসে তুফান তুলে ছুটতাম। এখানে মনে হল, আমার স্বভাবের অনেকগুলো দিককে কেটেছেঁটে সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত করে ফেলতে হবে।

যে লোকটা আমাকে পথ দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে এসেছে তার নাম ইতি-মধ্যেই জেনে ফেলেছি—মঙ্গল। মঙ্গলই দরজা এবং সুদৃশ্য ভেলভেটের পর্দা ঠেলে প্রথমে ভেতরে ঢুকল। তার পিছু পিছু আমি।

ঘরখানা বিশাল! মেঝেটা দামী কার্পেটে মোড়া। একদিকে চমৎকার খাট, টিপয় টেবিল, টেলিফোন, আরেক দিকে ওয়ার্ডরোব, মনোরম বুক র‍্যাক, জাপানী ছাতার আকারে লাইট-স্ট্যাণ্ড। এবং আরো কত কিছু যে রয়েছে তাদের নাম জানি না, কোনদিন চোখেও দেখি নি।

বিলাস, ঐশ্বর্য এবং সৌখিনতার অজস্র উপকরণ আমাকে কতক্ষণ আর চমৎকৃত করে রাখতে পারল ? একটি দীর্ঘদেহ পুরুষ নিমেষে আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিলেন।

গায়ের রঙ কালো না ফর্সাও না; দুয়ের মধ্যবর্তী। মাথার চুল সাদায়-কালোয় মেশানো। পুরু লেন্সের চশমার ওপারে দুটি দুরভেদী তীক্ষ্ণ চোখ। ধারালো চিবুক, চওড়া কপাল, তীক্ষ্ণ নাসা, জোড়া ভ্রূ, কঠিন চোয়াল, লম্বা আঙুল—সমস্ত কিছুর মধ্যে নিদারুণ এক ব্যক্তিত্ব কিংবা আত্মপ্রত্যয় গভীর রেখায় ফুটে রয়েছে। এই দুপুরেও তিনি সিল্কের স্লীপিং গাউন পরে আছেন।

ইনিই চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তথা আমার পিসেমশাই। জানা সত্ত্বেও

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। তারপর কর্তব্যটা মনে পড়ে গেল ; তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

একরকম নিস্পৃহ ভঙ্গিতেই প্রণামটা গ্রহণ করলেন পিসেমশাই। আমি উঠে দাঁড়াতে বললেন, 'তুমিই তা হলে চিরঞ্জীব—'

ঢোক গিলে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার তো আরো দিন দুই আগে আসার কথা ছিল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বর্ডারের ওপারে দিন-দুয়েকের মত আমাদের গাড়ি-টাকে এখানে-সেখানে ফেলে রেখেছিল। তাই দেরি হয়ে গেল।'

ভ্রূকুটি করে পিসেমশাই বললে, 'ওপারে বুঝি যা খুশি চলছে ; কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের বালাই নেই ? দুদিন গাড়ি ফেলে রাখবে ? এভাবে রাজত্ব চালায় কি করে ? স্ট্রেঞ্জ।'

আমি চুপ।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'দুদিন ধরে স্টেশনে তোমার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি কিন্তু সে লোক ফিরে আসছে। আজও পাঠিয়েছিলাম। তা রিণ্টুর সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার আলাপ হয়েছে। সে তোমাকে এখানে কিভাবে নিয়ে এল ? ট্যাক্সিতে না শিয়ালদা সাউথ দিয়ে ট্রেনে ?'

বিভ্রান্তের মত বললাম, 'আজ্ঞে, রিণ্টু কে ? মানে—'

'রিণ্টু, ভাল নাম নির্মল, আমার ছোট ছেলে। তোমাকে আনবার জন্যে তাকেই পাঠিয়েছিলাম।'

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই গলায় খাকারি দিয়ে মঙ্গল বলে উঠল, 'আজ্ঞা বড়বাবু। ছোট দাদাবাবু উনিকে আনতে ইস্টিশানে যায়নি ; একা একাই উনি চলে এসেছে।'

চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল পিসেমশাইয়ের ; চোখের তারা দুটো নির্দয়। কিন্তু শান্ত গলায় বললেন, 'আমি নোটিস লিখে রাখব ; রিণ্টুকে সেটা আজই দিবি, বুঝলি ?'

যার উদ্দেশে বলা সেই মঙ্গল ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ দেবে।

পিসেমশাই এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'তোমার বাবার চিঠিতে জেনেছি, এই প্রথম তুমি কলকাতায় আসছ। শিয়ালদা থেকে এখানে পৌছুতে তোমার খুব অসুবিধে হয়েছে তো।'

'আজ্ঞে তেমন কিছু নয় ; তবে ঘুরতে হয়েছে কিছুটা।'

পিসেমশাই তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। খানিক কি ভেবে শুরু করলেন,

'তোমার পিসিমা বেঁচে নেই, সে কথা তুমি জানো নিশ্চয়ই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'এ বাড়িতে এখন আমি, মঙ্গল, রান্নার একটা লোক ছাড়া আরো তিনটে অপোগণ্ড আছে। মানে আমার তিন ছেলের কথা বলছি। যদি এ বড়িতে তোমাকে থাকতে হয়, ঐ তিন বাঁদরের সঙ্গে মিশতে পারবে না। বুঝলে?'

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় লক্ষ্য করলাম, মঙ্গল প্রাণপণে আমাকে ইশারা করছে। ইশারার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হল না। মঙ্গলের ইচ্ছানুসারেই বলে ফেললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পিসেমশাই এবার বললেন, 'টায়ার্ড হয়ে এসেছ। এখন মঙ্গলের সঙ্গে যাও। স্নান-টান করে খেয়েদেযে আবার এ ঘরে আসবে। তোমার সঙ্গে আমার কিছু দরকার আছে।'

'আসব।' বলে মঙ্গলের সঙ্গে চলে গেলাম।

স্নান-খাওয়া সেরে ঘণ্টাখানেক পরে আবার পিসেমশাইয়ের ঘরে ফিরলাম। এবার একাই এসেছি। মঙ্গল সঙ্গে নেই। দেখি টাইপ রাইটার বার করে ঝড়ের গতিতে তিনি কি যেন টাইপ করে চলেছেন। আমাকে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। একটা সোফায় সঙ্কুচিত হয়ে বসে পড়লাম।

একটু পরেই টাইপ হয়ে গেল। পিসেমশাই আমার দিকে টাইপ-করা কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধরো।'

আমার জন্যই যে এত আয়োজন চলছিল, বুঝতে পারিনি। বিমূঢ়ের মত কাগজখানা নিয়ে পিসেমশাইর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পিসেমশাই বললেন 'ওটার মধ্যে কী আছে, পড়।'

বিমূঢ়তার সঙ্গে এবার বিস্ময় মিশল। বিচিত্র ঘোরের মধ্যে কাগজখানার ওপর মনোযোগ সঁপে দিলাম। ইংরেজী বয়ান তর্জমা করলে মোটামুটি এ রকম দাঁড়ায়।

'আমার এখানে থাকতে হলে কিছু নিয়ম পালন করে চলতে হবে। প্রথমত, আমার ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না। এবারে নীচে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে তার পাশে উত্তর লিখে দাও।

প্রথম প্রশ্ন: রাতে কটা পর্যন্ত তোমার বাড়ির বাইরে থাকার অভ্যাস?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: দেশে থাকতে রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব ছিল কিনা?

তৃতীয় প্রশ্ন: কোন রকম নেশার অভ্যাস আছে কিনা?

চতুর্থ প্রশ্ন: চাকরির জন্য এসেছ; চাকরি পেলে কতদিনের ভেতর এ

বাড়ি ছাড়বে ?

পঞ্চম প্রশ্ন : আমি যদি কোন কাজ দিই করতে রাজী কিনা ?

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে। পড়া শেষ হলে মুখ তুললাম। পিসে-মশাইয়ের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কেমন সংশয় হতে লাগল।

পিসেমশাই বললেন, নাও, তাড়াতাড়ি লিখে ফেল।' একটা পেনও তিনি এগিয়ে দিলেন।

এই প্রশ্নগুলির সদুত্তরের ওপরেই আমার এখানে থাকা না-থাকা অনেকখানি নির্ভর করছে। জীবনে অনেক পরীক্ষা দিয়েছি। ক্লাস ওয়ান থেকে বি. এ. পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটার মত। কিন্তু এ-জাতীয় পরীক্ষা ছিল আমার সুদূর কল্পনারও বাইরে। স্নায়ুভয়ে শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। একসময় অবশ দেহের শেষ শক্তিটুকু একত্র করে লিখতে লাগলাম। প্রশ্নগুলির পাশে লিখে ফেললাম, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সাতটার বেশি আমি বাড়ির বাইরে থাকি না। রাজনীতির সঙ্গে কোনকালেই সংস্রব ছিল না; এ সম্পর্কে আমি মোহমুক্ত। কোন নেশা নেই। চাকরি যেদিন পাব সেদিনই চলে যাব। আপনার যে-কোন কাজ সানন্দে করে দিতে আমি রাজী।

লেখা হয়ে গেলে কাঁপা হাতে কাগজখানা পিসেমশাইয়ের হাতে দিলাম। তিনি পড়তে লাগলেন আর রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে পিসেমশাই আমার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, উত্তরগুলো দেখে তিনি মোটামুটি সন্তুষ্ট। তবু সন্দেহ ঘুচল না; শঙ্কিত বুকে দুরুদুরু দুন্দুভি বাজতেই লাগল।

পিসেমশাই বললেন, ঠিক আছে। তবে—'

হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল। 'তবে' শব্দটার পর অনুচ্চারিত যা আছে সেটা কী ? ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

'একটা কিছু মাইল্ড নেশা করতে পার; যেমন ধর স্মোকিং। ইভ্ন ইন মাই প্রেজেন্স। ওতে কনসেনট্রেসনের শক্তি বাড়ে। মুখে একটা সিগার নিয়ে যদি চিন্তা কর, দেখবে গভীরভাবে ডুবে যেতে পারছ। আর চাকরি পেয়েই যাবার দরকার নেই। এক মাস পর মাইনে পেলে যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা—' এই পর্যন্ত বলে পিসেমশাই চুপ করলেন।

আমি জিজ্ঞাসু ভীরু চোখে তাকিয়েই রইলাম।

পিসেমশাই খানিক কি ভেবে বললেন, 'ছ মাস তুমি আমার বাড়ি থাকতে

পারবে। এর ভেতর চাকরি যোগাড় করে নেওয়া চাই। চাকরির ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না; নিজের ছেলেদের জন্যেও কারোকে কিছু বলিনি। নিজের চেষ্টায় তোমাকে কাজ যোগাড় করতে হবে। প্রত্যেকেই সেল্ফ্-মেড হোক, তাই আমি চাই।'

পিসেমশাই কি খামখেয়লী? হৃদয়বর্জিত? নিষ্ঠুর? আমার ভাবনার মধ্যেই তিনি কলিং বেল বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল ছুটে এল। পিসেমশাই বললেন, 'চিরঞ্জীবকে একতলার পুব কোণের ঘরখানা খুলে দে। ওখানে থাকবে।' আমাকে বললেন, 'মঙ্গলের সঙ্গে যাও।'

উঠে পড়লাম।

চার

আবার একতলায়।

আমার বিছানা আর স্যুটকেশটা কাঁধে ফেলে আগে আগে আসছে মঙ্গল। লোকটা যেন অমোঘ নিয়তি; আমি তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছি।

দোতলা থেকে নীচে নেমে যে বারান্দাটা বাইরের সদরের দিকে গেছে, মঙ্গল সেদিকে গেল না। দীর্ঘ করিডর ধরে সোজা এগিয়ে চলল। করিডরটা যেখানে নিঃশেষিত সেটা একটা তালাবন্ধ ঘর। মঙ্গল বিছানাপত্র নামিয়ে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল। তারপর ভেতরে ঢুকে আমাকে ডাকল, 'আসুন—'

এলাম। ঘরখানি মনোরম এবং হাত-পা ছড়িয়ে থাকার মত বেশ বড়সড়ও। মেঝেতে মোজেকের সুচারু চিত্রণ, দেয়াল এবং ছাদ কোমল নীলাভ রঙে ডিস্টেম্পার করা। তাকানো মাত্র চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে চমৎকার খাট; তার ওপর নিভাঁজ বিছানা। আরেক প্রান্তে ছোট একটি টেবিল, বসবার জন্য খান দুই সোফা, কাঁচের আলমারিতে অবকাশ-বিনোদনের জন্য খানকয়েক বই, একটা আলনা, কয়েকটা হ্যাঙ্গার। প্রয়োজনীয় সব কিছুই হাতের কাছে মজুদ এবং সেগুলো পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে।

আমি যেখান থেকে যেভাবে এসেছি তাতে এই ঘরখানা এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার কথা নয়। তবু যে দেখলাম, সেটা স্নান এবং খাওয়ার ফলে স্নায়ুগুলো খানিক সুস্থ হয়েছে বলে।

কলকাতায় এসে কিভাবে থাকতে হবে তা নিয়ে আমার দুর্ভাবনা ছিল।

এমন একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, সেই সঙ্গে খানিক অস্বাচ্ছন্দ্যও হালকা ছায়ায় মত মনের ওপর দিয়ে ভাসতে লাগল। এমন আরামদায়ক পরিবেশে আগে আর কখনও থাকি নি।

মঙ্গল বলল, 'আপনি আসবেন বলে কত্তাবাবু আমাকে এ-ঘর ঝেড়েমুছে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে বলেছেন। কি, পছন্দ তো?'

খানিক বিমূঢ়তা আমার ওপর ভর করল যেন। আমি আসব বলে যদি ঘরই সাজিয়ে রেখেছেন তা হলে একটু আগে পিসেমশাই সেই বিচিত্র বিভ্রান্তি-কর পরীক্ষাটা নিয়েছিলেন কেন? মনের ভেতর যে বিভ্রমটা প্রশ্নের আকার নিতে শুরু করেছে মুখ ফুটে তা আর বললাম না।

মঙ্গল আবার বলল, 'আমি আগে থেকেই বিছানা পেতে রেখেছি। যদি বলেন ওটা তুলে আপনারটা পেতে দিই।'

চার-পাঁচটা দিন ট্রেনে স্টীমারে কাটিয়ে এসেছি। মানুষের পায়ের তলায় ডলে-মুচড়ে-চটকে গিয়ে এবং ধোঁয়া-ধুলো কয়লার গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে বিছানাটার শ্রী যা খুলেছে, লোকের সামনে আর বার করা চলে না। বললাম, 'তোমাদের বিছানাটাই থাক।'

'এবার তা হলে চানের ঘর, পায়খানা-টায়খানাগুলো দেখে নিন।' মঙ্গল এই ঘরেরই এক কোণে একটা বন্ধ দরজা দেখিয়ে বলল, 'ওটা খুললেই সব পেয়ে যাবেন। কোথাও আর বেরুতে হবে না।'

'আচ্ছা।'

'এখন তবে চলি?'

'যাও।'

'কিছু দরকার হলে আমায় ডাকবেন।'

ঘাড় কাত করে জানালাম, ডাকব।

মঙ্গল আর অপেক্ষা করল না, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

খাটের ওপর থেকে নরম নিভাঁজ আরামদায়ক বিছানাটা আমাকে অবিরত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল। চারটে দিন ট্রেনে আর স্টীমারে আকণ্ঠ উদ্বেগের ভেতর কাটিয়ে এসেছি। মানসিক অবস্থাটা ভয়-উৎকণ্ঠা-শঙ্কা, সব একাকার হয়ে এমন একটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল যেখানে ঘুম আসে না। অনুভূতিশূন্য অতন্দ্র চোখ মেলে শুধু তাকিয়ে থাকতে হয়। তা ছাড়া স্নানের সুযোগই ছিল না, খেতেও ইচ্ছে করেনি। স্নান এবং ঘুমের স্পর্শহীন এই চার-পাঁচটা দিন অবসন্ন, আচ্ছন্ন, বিহ্বল এক অস্তিত্ব নিয়ে শুধু বসে থেকেছি।

অবশ্য কাল সীমান্তের এপারে এসে স্নান করতে পেরেছি, খাদ্যও জুটেছে। এমনকি আজ ভোরে কলকাতায় পৌঁছুনো পর্যন্ত ঘুমিয়েও নিতে পেরেছি। তবু সে ঘুমটুকু যথেষ্ট নয়, চার-পাঁচ দিনের অসীম ক্লান্তি আমার সমস্ত সত্তাকে বেষ্টন করে আছে। এখন ঘুমোনো দরকার। চাই পরিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন এমন এক নিদ্রা যা আমার সর্বাঙ্গ থেকে সবটুকু শ্রান্তি মুছে দেবে।

মঙ্গল আমাকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে গেছে। সেটা খুলে চোখে-মুখে-ঘাড়ে জল ছিটিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। এবার ঘুম আসুক, ক্লান্তিহর অথৈ ঘুম, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

শুয়ে তো পড়েছি, চোখও বুজেছি কিন্তু ঘুম আসছে কই? ধবধবে নরম বিছানা ফেনার মত চারপাশে ছড়ানো, শরীরময় অগাধ অবসাদ—পরিপাটি একটি ঘুমের স্বপক্ষে সবই তো রয়েছে তবু ঘুমোতে পারলাম না। আর ঘুম না এলে কতক্ষণই বা চোখ বুজে থাকা যায়! অগত্যা তাকালাম।

শিয়রের দিকে বিশাল জানলা। তার বাইরে বাগান। এ বাড়িতে ঢুকেই যে চমৎকার বাগানখানা চোখে পড়েছিল তার একটা অংশ আমার শিয়রের কাছেও চলে এসেছে। বাগান পেরিয়ে কাচ-বসানো উঁচু প্রাচীর। তার ওপরে অনেকগুলো প্রাচীন জরাজীর্ণ বাড়ি। অধিকাংশই টালি আর টিনের, কদাচিৎ এক-আধখানা একতলা দোতলা। তবে এগুলোকে বাড়ি বললে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। পাকা বাড়ির দেওয়াল থেকে কবেই পলেস্তারা খসে গেছে, মাথায় যাদের টালির টোপর সেগুলোও ভাঙাচোরা। বট অশ্বত্থেরা ভিতে শিকড় চালিয়ে ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে রেখেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই শতাব্দীর বসতি নয়, মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত কোন বিস্মৃত নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

যাই হোক, কাল থেকে অকালের যে গাঢ় মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে ছিল, হঠাৎ এই মুহূর্তে তারা যেন মনঃস্থির করে ফেলেছে। এখানে তারা আর থাকবে না। অসময়ে হানা দিয়ে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ করা গেছে, আর না। মন্থর ভেলা ভাসিয়ে মেঘগুলি দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করেছে। যে দিনটা বিষণ্ণ মলিন হয়ে ছিল, তার গায়ে চিকচিকে একটু আভা ফুটেছে। কাল থেকে যে সূর্যটা পলাতক, হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের আরক্ত মুখের মত আবার সে দেখা দিয়েছে।

চারপাশের ছাবগুলো আমার চেতনায় আদৌ কোন রেখাপাত করতে পারছে না। চোখের সামনে ওগুলো ছড়ানো আছে ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে

কোন আকার বা অর্থ নেই বুঝি। টুকরো টুকরো ভাবে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ভাবনা একসঙ্গে ভিড় করে আসতে লাগল।

কোথায় ঢাকা জেলার সেই অখ্যাত অজ্ঞাত আমতলি গ্রাম আর কোথায় সুদূর গ্রহান্তরের মত এই কলকাতা শহর! এখন, এই মুহূর্তে বাবা মা এবং সবিতা—ওরা সব কী করছে? ঢাকা শহর থেকে যারা এসে গ্রামের লোকদের তাতিয়ে যায় তারা কি এর মধ্যে এসেছিল? মা-বাবার কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল, একটা চিঠি লেখা দরকার। মা বার বার বলে দিয়েছেন, এখানে পৌঁছেই যেন চিঠি লিখি। চিঠি না, কাল একেবারে টেলিগ্রাম করে দেব।

গ্রাম যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তাতে ভয়ানক কিছু ঘটে যাবে না তো? অবশ্য রাজেককাকা আছেন, সেটুকুই যা ভরসা।

মা-বাবার ভাবনা থেকে মনটা হঠাৎ অন্য দিকে বাঁক নিল। ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক, অনেক দূরে আমাদের সেই ছোট্ট নগণ্য গ্রামখানা থেকে কলকাতার বিশাল সমুদ্রে এসে পড়েছি। এখানে কিভাবে চাকরি যোগাড় করব? আদৌ যোগাড় করতে পারব কি? সামান্য একটা চাকরির মধ্যেই যে আমাদের বাঁচার মন্ত্র রয়েছে।

যদি চাকরি না জোটে মা-বাবার কী হবে? সবিতার কী হবে?

চাকরির কথায় পিসেমশাইয়ের কথা মনে পড়ল। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। আচ্ছা, পিসেমশাই মানুষটা কি হৃদয়বর্জিত? ঐ রকম অদ্ভুত একটা পরীক্ষা নিলেন; তাঁর মস্তিষ্কের ষোল আনা সুস্থতা আছে তো? আশ্চর্য, আমি অত দূরের এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের দেশ থেকে আসছি, সেখানকার অবস্থা কী, মানুষ কিভাবে কি দুঃসহ আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করে চলেছে—সে সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেননি। আমি কি এখানে অবাঞ্ছিত?

সমস্ত ভাবনা মিলে মিশে ফুলে ফুলে বিপুল হয়ে আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ করে আনতে লাগল। আমি এখানে কী করবো, কী করবো?

ভারতবর্ষের এই বৃহত্তম নগরে কারোকেই তো চিনি না। কিভাবে, কোন্ পথে গেলে জীবিকার একটা দরজা খুলে যাবে জানি না। কে আমাকে সে পথের সন্ধান বলে দেবে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। শরীরময় চার-পাঁচ দিনের অবসাদ। তা মুছবার জন্য যে ঘুমের প্রয়োজন, আমাকে বাদ দিয়ে আমার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে কোন এক অজানা রাজ্যে সে বুঝি নির্বাসন বেছে

নিয়েছে।

কতক্ষণ নানা ভাবনার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'ভেতরে আসতে পারি ?'

চকিত হয়ে উঠলাম। মঙ্গল এবং পিসেমশাইয়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছি। এ গলাটা নতুন। বললাম, 'কে ?'

'আমি রিণ্টু। আসব ?'

মনে পড়ল পিসেমশাইয়ের ছোট ছেলের নাম রিণ্টু। স্টেশনে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসার দায়িত্ব তার ওপরেই ছিল। তার বয়স কত জানি না। আমার চাইতে ছোট অথবা বড়, তাই বা কে বলবে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ডাকলাম, 'আসুন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে যে ঢুকল তাকে কিশোর বলা যায় না, আবার যুবকও না। কৈশোর যৌবনের মাঝামাঝি জায়গায় বয়েসটা তার থমকে আছে। এই বয়েসে শরীরময় পুরনো সব কিছুর অদল-বদল শুরু হয়ে যায়। হাত-পা-মুখ-চোখ এমন কি মনটাও ভেঙেচুরে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে ওঠার এই তো সূচনা। তবে কৈশোরের লাবণ্যটুকুও একেবারে বিলীন হয়ে যায় না।

রিণ্টুর দেহেও নতুন গড়নের কাজ চলছে পুরোদমেই। ঠোঁটের ওপর গোঁফের নীলাভ রেখা দেখা দিয়েছে, হাত-পা আর নরম নেই, শরীরের কোষগুলি জমাট বেঁধে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে পেশীর আদল নিচ্ছে। চোয়াল ভেঙে ভেঙে আর গালের মাংস ঝরে গিয়ে কঠিন রেখায় মুখখানা ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

সবই ঠিক কিন্তু রিণ্টুর কোথাও কৈশোরের মাধুর্য নেই। চুল কায়দা করে উল্টানো, ঠোঁট দুটি সিগারেটের ধোঁয়ায় পোড়া, চোখের দৃষ্টিতে পাকামি, পরনে ট্রাউজার্স আর বুক-খোলা বুশ শার্ট।

ছেলেটা আশ্চর্য চটপটে আর সপ্রতিভ। তার স্বভাবের কোথাও সঙ্কোচের অবকাশ নেই। কলকাতার ছেলেরা এই রকমই হয় বোধ হয়।

আমি কিছু বলার আগেই রিণ্টু একটা সোফায় বসে পড়ল। তারপর চোখে-মুখে কথা শুরু করল, 'আপনিই তো চিরঞ্জীবদা ?'

ঘাড় হেলালাম। এদের বাড়ি আমি আশ্রিত। কিভাবে অভ্যর্থনা করলে রিণ্টু খুশী হবে বুঝতে পারছি না।

রিণ্টু আবার বলে উঠল, 'মঙ্গলদার কাছে এইমাত্র শুনলাম, আপনি এসে গেছেন। খবরটা পেয়েই ছুটে এলাম।'

আমি চুপ করে রইলাম।

এদিকে দিনটা বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যের দেউড়িতে এসে থেমেছে। সূর্যটা নেই। খানিক আগেও আকাশে যে চিকচিকে আলোর আভাটুকু লেগে ছিল, তা মুছে গেছে। চারদিক এখন নিরানন্দ, ছায়াচ্ছন্ন, ম্লান।

রিণ্টু বলল, 'সন্ধ্যে হয়ে এল, আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।'

বোতাম টিপে আলো জ্বেলে আবার সোফায় এসে বসল রিণ্টু। বলল, 'মুখ না দেখতে পেলে কথা বলতে ভাল লাগে না।'

আড়ষ্টভাবে আমি হাসলাম।

রিণ্টু বলতে লাগল, 'শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসার কথা ছিল আমার।'

এতক্ষণে আমার গলায় স্বর ফুটলো। অস্পষ্ট স্বরে বললাম, 'মঙ্গলদার কাছে শুনেছি। পিসেমশাইও বলছিলেন—'

'কী—কী বলছিলেন বাবা ?' রিণ্টু চকিত হয়ে উঠল।

'বলছিলেন আমাকে আনার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছেন—'

'আর কিছু বলেছিলেন ?'

পিসেমশাই আরো কী কী মন্তব্য করেছিলেন, মনে নেই। তবু বললাম, 'আর কিছু বলেন নি।'

আশ্বস্ত হল রিণ্টু। তারপরেই হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল, 'ও কি আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন ? তুমি বলবেন।'

আস্তে আস্তে আড়ষ্টতা কাটিয়ে খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, 'আচ্ছা, তাই বলব। তুমি তো আমার চাইতে ছোটও।'

'অনেক ছোট।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রিণ্টুই আবার আরম্ভ করল, 'কাল আর পরশু, দু-দিন স্টেশনে গেছিও কিন্তু পাকিস্তানের ট্রেন আসেনি।'

'হ্যাঁ, ট্রেনটা দু-দিনের মত লেট ছিল। আজ সকালে এসে পৌঁচেছে।'

'আজ এসে আমায় ঝামেলায় ফেলেছে। বাবা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন স্টেশন থেকে আমি আপনাকে সঙ্গে করে আনিনি।'

বিব্রত মুখে বললাম, হ্যাঁ, তা—'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রিণ্টু বলল, 'দুদিন গিয়ে ফিরে এসেছি। ভেবেছিলাম, আজও ট্রেনটা আসবে না। তাই একজনকে—', বলতে বলতে

ঠোঁট কুঁচকে হঠাৎ কেমন করে যেন হাসল। হাসির হেতুটা আমার কাছে স্পষ্ট না। রিণ্টু যা বলতে গিয়ে থেমে গেছে তা জানার কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করতে বাধল।

রিণ্টু এবার নিজের থেকেই বলল, 'ট্রেন আসছে না দেখে একজন মানে এক বন্ধুর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে ফেললাম। তাকে নিয়ে সকালবেলা দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম, এইমাত্র ফিরছি। ফিরেই খবর পেলাম, পাকিস্তানের ট্রেন আজ হাজির হয়েছে আর আপনিও একা একা বাড়ি এসেছেন। শুনেই মাথার ভেতর অ্যাটম বোমা ফাটল। বাবার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি, দেখা হলে ওল্ড-ম্যান লাইফ একেবারে পটাসিয়াম করে ছেড়ে দেবে।'

আমি হতবাক্। নিজের বাবা সম্বন্ধে কেউ যে ওরকম করে বলতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। গুরুজনদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, নম্রতা এবং ভক্তি মেশানো একটা মনোভাব ছেলেবেলা থেকেই গড়ে তুলেছি। তাঁদের সামনে তো বটেই, অগোচরেও রিণ্টুর মত এমন বিশ্রী মন্তব্য করতে শিখিনি। এ জাতীয় কথা যে বলা যায় তা ছিল আমার জ্ঞান বোধ এবং অভিজ্ঞতার বাইরে।

তাছাড়া যেভাবে শেষের দিকে রিণ্টু কথা বলছিল আমার কাছে তা অদ্ভুত লাগছে। ঐ শব্দগুলো এবং তাদের প্রয়োগ আমার মত নিরীহ গ্রামের ছেলের পক্ষে নিতান্ত বৈদেশিক, অপরিচিত কোন গ্রহান্তরের ভাষার মত।

আমি বিস্মিত হয়েনি যত, তার চাইতে অনেক বেশি হয়েছি আহত। যাই হোক, কিছুক্ষণ অপলকে রিণ্টুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'তুমি পড়াশোনা কর তো?'

'হ্যাঁ।'

'কী পড়।'

'এবার ম্যাট্রিক দেব।'

'পরীক্ষা কবে?'

'মার্চ মাসে।'

'এটা তো ফেব্রুয়ারি, তার মানে মাসখানেকের মত আছে। প্রিপারেশন কেমন হয়েছে?'

'পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, ব্রেন বাঁই বাঁই করে ঘোরে।' বলতে বলতে হঠাৎ চোখ দুটি চকচকিয়ে উঠল রিণ্টুর, 'এই ঘরটাতেই তো আপনি থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ফাইন ঘর পেয়েছেন।'

আমি উত্তর দিলাম না।

রিন্টু উচ্ছ্বাসবশে বলে যেতে লাগল, 'একেবারে কোণের দিকে নিরিবিলি, কোন ঝামেলা নেই। আমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে হেল্প করতে হবে চিরঞ্জীবদা।' শেষ দিকে তার কণ্ঠস্বরে আবদারের সুর ফুটে উঠল।

আমি অবাক। বেশ তো এই ঘরখানার ব্যাখ্যা করছিল রিন্টু, তার ভেতর হঠাৎ সাহায্যের কথা নিয়ে এল কেন? ঈষৎ বিমূঢ়ের মত বললাম, 'কিসের হেল্প?'

চোখের তারায় কায়দা করে হাসল রিন্টু। আঙুল মটকাতে মটকাতে বলল, 'এক-আধদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। আমি পাঁচিল টপকে এসে চুপিচুপি আপনাকে ডাকব। আপনি টুপ করে উঠে দরজাটা খুলে দেবেন। কাইণ্ডলি চিরঞ্জীবদা, এই উপকারটুকু করতে হবে।'

আমার বিস্ময় কাটেনি, বরং সেটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল। নিষ্পলকে রিন্টুর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রিন্টু বুঝিবা আমার মনের কথা পড়তে পারল। বলল, 'রাত দশটায় এ বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর নো অ্যাডমিশন—প্রবেশ নিষেধ। ওল্ড ম্যান যাতে টের না পায়, তার কান বাঁচিয়ে মঙ্গলদাকে কত অয়েল যে দিতে হয় দরজা খুলবার জন্য, কি বলব?'

আমি প্রতিধ্বনি করলাম, 'অয়েল!'

'হ্যাঁ, মানে তেল।'

এতক্ষণে খানিক বুঝতে পারলাম। পিসেমশাইয়ের হুকুম রাত দশটার মধ্যে সবাইকে বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু রিন্টুর তা না-পছন্দ। মাঝে মাঝে রাত দশটার পর ফিরে মঙ্গলকে প্রচুর তোষামোদ করে তবে ভেতরে ঢুকতে পায়। ঐটুকু ছেলে, অত রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে কী করে? এত বড় হয়েছি, এখনও তো বিশেষ দরকার না থাকলে সন্ধ্যের পর আমি বাইরে থাকি না। দশটার পর বাইরে থাকা তো সুদূর কল্পনার বাইরে।

একটা বিষয়ে ভারি আমোদ লাগছে, কৌতুকও। যে ভাবে যে ভঙ্গিতে কথা বলছে রিন্টু তেমনটি আগে আর শুনি নি। সব শব্দই আমার জানা, তবু কেমন যেন সাংকেতিক মনে হচ্ছে।

রিন্টু বলল, 'আমি এখন উঠি চিরঞ্জীবদা। আপনি টায়ার্ড—বিশ্রাম করুন। পরে দেখা হবে।' উঠতে উঠতে বলল, 'যাই, এবার গিয়ে মেসিনগানের

সামনে দাঁড়াই।'

'মেসিন গান!'

'ইয়েস, মাই ফাদার—বাবা।' চোখের পাতা নাচিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল রিণ্টু। তারপর চলে গেল।...

রিণ্টু চলে যাবার পরও তার কথাগুলো কানের ভেতর বেজে যাচ্ছিল। ওল্ড ম্যান, মেশিন গান—পিতা সম্পর্কে পুত্রের ভক্তির বহরখানা বেশ ভালই।

রিণ্টু কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আমার মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে ভাবনাটা আবার যোজন যোজন পাড়ি দিয়ে ঢাকা জেলার অখ্যাত নগণ্য গ্রামখানায় ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেও ঘন মেঘ ছিল। এখন আর মেঘেদের সেই জমাট-বাঁধা কাঠিন্য নেই। শিথিল হয়ে অলস ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে ক্রমশ আকাশময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা ধোঁয়ার চাঁদোয়া চারদিক ছেয়ে আছে। তারা ফুটেছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। আজ বাংলা পঞ্জিকায় কত তারিখ, এটা কোন্ পক্ষ—শুক্ল অথবা কৃষ্ণ, জানি না। শুক্ল পক্ষ হলে চাঁদ উঠেছে কিনা, বুঝবার উপায় নেই।

প্রাচীরের ওপারে রাস্তা। ইলেকট্রিসিটির দাক্ষিণ্য শহরতলীর এ প্রান্তেও এসে পৌঁচেছে। দূরে দূরে লাইট পোস্ট। আলোর বৃত্তগুলি ঘিরে কুয়াশা আর অন্ধকার ঘন হয়ে আছে।

সামনের পথটা বেশ নিরিবিলি। কদাচিৎ এক-আধটা সাইকেল অথবা মোটর বাতাসে তরঙ্গ তুলে হুস্ হুস্ ছুটে যাচ্ছে। নইলে এই শীত রাত্রির শান্তি একেবারেই অবাধ, নির্বিঘ্ন। তার ধ্যান ভাঙাবার মত আর কোন শব্দ নেই। অন্ধকার আর নিবিড় কুয়াশা মুড়ি দিযে রাতটা ক্রমশ গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য শব্দ কি একেবারেই নেই? বাগান থেকে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে ব্যাঙেরাও গাল ফুলিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠছে, অকালে মেঘ দেখে হয়ত তাদের এই পুলকিত কণ্ঠসাধনা।

কানের পর্দায় ঝিঁঝিদের কান্না ঘা দিয়ে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে আর দূরে দূরে ঘোলাটে আলোর বৃত্তগুলি দেখতে দেখতে আমি আবার হারিয়ে যেতে লাগলাম। আমতলি গ্রাম—মা—বাবা—সবিতা—রাজেক কাকা—পিসেমশাইর বাড়িতে আশ্রয়—একটা চাকরি—। একই রেকর্ড বার বার বাজাবার মত স্তরে স্তরে সাজানো পুরনো ভাবনাগুলি আমার স্নায়ুর তারে তারে ঝড়ের মত

বাজতে লাগল, মুহূর্তে চারদিক থেকে তারা আমাকে ঘিরে ফেলল।

কতক্ষণ খেয়াল নেই। চটি টেনে টেনে কার যেন হাঁটার শব্দে ভাবনাগুলো একসময় ছড়িয়ে যেতে লাগল। শব্দটা দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে।

বুকের কাছে বালিশ জড়ো করে শুয়ে ছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। মনে হল, আমার ঘরের দিকেই কেউ আসছে।

যা ভাবছিলাম তা-ই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় যার ছায়া পড়ল সে এক দীর্ঘদেহ যুবক। তার দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারলাম না, নিমেষে সম্মোহিত হয়ে গেলাম। গায়ের রঙ তার শ্যামাভ। দীর্ঘ উজ্জ্বল ভাষাময় চোখ, ধারালো চিবুক, তীক্ষ্ণ নাক, হাত দুটি জানু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। মসৃণ ত্বক, অবিন্যস্ত এলোমেলো চুল। পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। সর্বাঙ্গ ঘিরে কি এক দীপ্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেটা কি বুদ্ধির না অন্য কিছুর আলো? একবার দেখে তা বুঝতে পারছি না।

কত বয়েস হবে? আমারই প্রায় সমবয়সী। হয়ত এক-আধ বছরের কম বেশি। দেখতে দেখতে মনে হল, গ্রীক পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে এক রূপবান দেবদূত বাংলা দেশের শ্যামরূপ গায়ে মেখে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেও আমাকে দেখছিল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম ভাই। তুমি নিশ্চয়ই চিরঞ্জীব?'

আগন্তুক কে কিছুটা অনুমান করতে পারছি। পিসেমশাইয়ের ছেলেই হবে। রিন্টুকে একটু আগে দেখেছি, সে সবার ছোট। এ তবে কে? বড় না মেজো? তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ—'

'আমি পিন্টু,—পোশাকি নাম অমল।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে একটা সোফায় নিজেকে সঁপে দিল অমল। খানিক চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আমি ভাই কোন রকম ফর্মালিটির ধার ধারি না। তোমাকে কিন্তু 'তুমি' করেই বলে ফেলেছি।'

'নিশ্চয়ই 'তুমি' বলবেন।'

'উঁহু-উঁহু-উঁহু—,' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল অমল।

'কী?' আমি উন্মুখ হলাম।

'একতরফা হবে না। তোমাকেও 'তুমি' বলতে হবে।'

ক্ষণেকের উপস্থিতিতে অমল বুঝিয়ে দিয়েছে তার কাছে কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হয়ে থাকার অবকাশ নেই। সমস্ত সঙ্কোচ আর আড়ষ্টতা সে ঝড়ের মুখে

উড়িয়ে দেবে। কলকাতায় পা দেবার পর এই প্রথম খানিকটা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম। বললাম, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

অমল বলল, 'ক'দিন থেকেই শুনছিলাম, তুমি আসবে। দু-তিন দিন আগেই তো তোমার আসার কথা ছিল, না ?'

'হ্যাঁ। আগেই পৌঁছে যেতাম কিন্তু ট্রেনটা আড়াই দিনের মত লেট ছিল।'

'শুনেছি রিফিউজি স্পেশাল নিয়ে ওরা যা খুশি তাই করে। ইচ্ছা হল গাড়ি তিন দিন ফেরে রাখল সাইডিং-এ, ইচ্ছা হল তো চালাল। মানুষের জীবন নিয়ে এমন তামাশা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।' অমল বলতে লাগল, 'সে যাক গে, সকাল থেকে আমি আজ বাড়ি ছিলাম না। তুমি কখন এসে পৌঁচেছ বল।'

'এগারটা সাড়ে এগারটা নাগাদ।'

'তুমি একা এলে যে ? মামা-মামীমারা এলেন না ?'

'না'

'কেন ?'

কুণ্ঠিত মুখে বললাম, 'আমার একটা চাকরি-বাকরি না হলে—,' বলতে বলতে থেমে গেলাম।

আমার না বলা কথাগুলির মধ্যে যে ইঙ্গিতটা ছিল তা অনায়াসেই ধরে ফেলল। মৃদু হেসে বলল, 'বুঝেছি।' এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করল না সে, অথবা কোন মন্তব্য।

একটু চুপচাপ।

তারপর অমলই নীরবতা ভাঙল, 'একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, তুমি আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো ?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম, 'কী ?'

'দেখ, প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লোক সীমান্ত পেরিয়ে ওদেশ থেকে এদেশে চলে আসছে। তুমিও এসেছ। আরও অনেক মানুষ আসবে। পাকিস্তানের ভেতরে অবস্থাটা কিরকম ছিল আমি ঠিক জানি না। সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব ভাসা ভাসা। খবরের কাগজ থেকে অবশ্য কিছু জানা যায়, কিন্তু খবরের কাগজের খবরকে বেদবাক্য বলে মানতে আমার আপত্তি আছে। আরেক জানা যায়, যারা সর্বস্ব ছেড়ে পালিয়ে আসছে তাদের কাছ থেকে। কিন্তু এ রকম যে ক'জনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তারা সবাই অশিক্ষিত চাষী শ্রেণীর মানুষ। কোন কিছু ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদেব নেই।

তা ছাড়া দেশ হারাবার বেদনা তাদের আবেগকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যাতে স্পষ্ট করে কিছুই ওরা দেখতে পাচ্ছে না। এত মানুষ কেন, কোন অবস্থায় পড়ে চলে আসছে, তুমি নিশ্চয়ই তার কারণটা বলতে পারবে।' সাগ্রহে আমার দিকে তাকাল অমল।

একটু ভেবে বললাম, 'দেশ ছাড়ার কারণ তো একটা নয়, অসংখ্য। তবে যেটা আমার সব চাইতে বড় মনে হয়েছে সেটা হল নিরাপত্তার অভাব।'

সঙ্গে সঙ্গে অমল কিছু বলল না। কেন দূরমনস্ক দেখাল তাকে। খানিক পর সে ফিসফিস করে উঠল, 'আমার কী ইচ্ছে হয় জানো ?'

'কী ?'

'একবার পাকিস্তানের অবস্থাটা দেখে আসি। পূর্বপুরুষের দেশ এককালে পূর্ব বাঙলাতেই ছিল ; কিন্তু আমি কোনদিন যাইনি। আমার জন্ম এখানে ; লেখাপড়া এখানে। পূর্ব বাংলা আমার কাছে ভৌগোলিক একটা শব্দমাত্র। তার সম্বন্ধে অহেতুক মোহ বা আকর্ষণ কিছুই বোধ করি না। আমি গেলে বোধ হয় নিরপেক্ষভাবে কারণটা জেনে আসতে পারব।'

'বেশ তো, ঘুরে আসুন না।'

এতক্ষণ বিষয়ের গুরুত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অমলের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাচ্ছিল। এবার চোখ কুঁচকে তরল স্বরে বলল, 'এটা কী হল ব্রাদার ?'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটা ?'

'এই যে চুক্তিভঙ্গ করলে।'

'কিভাবে ?'

'আমি তোমাকে "তুমি" বলছি। আর তুমি "আপনি" "আজ্ঞে" করছ। এগ্রিমেণ্ট ভাঙলে তো চলবে না ; জেণ্টলমেন্‌স্ এগ্রিমেণ্ট।'

অমলের বলার ধরনে হেসে ফেললাম, 'আচ্ছা ভবিষ্যতে সাবধান থাকব। শর্ত আর ভঙ্গ হবে না।'

'ছ্যাটস্ লাইক এ গুড বয়।' অমলও হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'তুমি আজ ক্লান্ত ; আর বিরক্ত করব না। পরে পাকিস্তান নিয়ে কথা হবে। এখন উঠি।'

অমলের সান্নিধ্য, কথাবার্তা খুব ভাল লাগছিল। তার চারপাশে কোথাও কোন বাধাবন্ধ নেই। সব দিকের সব দরজা-জানলা মেলে দিয়ে উদার আমন্ত্রণে সে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। কাচের আধারে একটি সুগন্ধময় সাদা ফুলের মতো তার প্রাণটি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

অমল উঠে পড়েছিল। দরজার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে, যেন কি মনে পড়েছে, এমনভাবে বলল, 'তোমার ঘরখানা তো গ্র্যাণ্ড। একেবারে ধারের দিকে ; ওপাশে একটা দরজাও আছে। তা ভাই তোমার ওপর একটু উৎপাত করব কিন্তু।'

অমল কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম।

অমল বলল, 'আমার ভাই অনেক রাতে ফেরা অভ্যেস। এদিকে এ বাড়ির গেট দশটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।'

'শুনেছি।'

'বাবা যাতে টের না পান, তাঁর কান বাঁচিয়ে কত ঝামেলা করে যে মঙ্গলকে দিয়ে গেট খোলাতে হয় তা আমিই জানি। এবার থেকে এসে তোমায় ডাকব। দরকার হলে তোমার ঘরেই টান হব।'

বিদ্যুৎ-চমকের মত পিসেমশাইয়ের সেই নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ল, নিজের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে তিনি বারণ করে দিয়েছেন। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আচ্ছা।'

অমল বলল, 'বাঁচালে ভাই।'

আমি চুপ। লক্ষ্য করলাম, রিণ্টু এবং অমল—দু' ভাইয়ের এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেরই রাত করে বাড়ি ফেরার অভ্যাস।

কি ভেবে অমল আবার বলল, 'আসছে রবিবার দুপুরবেলা তোমার কোন কাজ আছে ?'

'এখানে কী আর কাজ—'

'তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব সেদিন।'

'কোথায় ?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

অমল চলে গেল। তবু ঘর ভরে তার উপস্থিতির রেশটা কাটেনি। স্তরে স্তরে সাজানো ঘন গহন পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ভাবনাগুলির চারধারে রুপালি রেখার মত একটা দীপ্তি অমল রেখে গেছে।

অমল চলে যাবার অনেকক্ষণ পর মঙ্গল খেতে ডেকে নিয়ে গেল। খেয়ে এসে মাথার ভেতর থেকে সবলে সমস্ত ভাবনা ঠেলে দিয়ে ঘুমের অতলে হারিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। দেখতে দেখতে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল শেষ রাতে, কার যেন ডাকাডাকিতে। এখনও অন্ধকার আছে ;

শীতের কুয়াশামেশা অন্ধকার বেশ গাঢ় এবং ভারী, চারদিকে গোলা পীচের মত প্রায় অনড় হয়ে রয়েছে।

তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। কানের পর্দায় ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপ, ব্যাঙের ডাক আর আকাশময় ছড়ানো তরল মেঘ নিয়ে শুয়েছিলাম। ঝিঁঝির কান্না বা ব্যাঙের ডাক এখন আর শোনা যাচ্ছে না। মেঘেরাও নিরুদ্দেশ। আকাশ জুড়ে তারাদের মেলা বসে গেছে; এক কোণে ক্ষীণায়ু চাঁদের একটি রেখাও চোখে পড়ল।

ডাকাডাকিটা সমানে চলছে, 'মঙ্গলদা, অ্যাই মঙ্গলদা—দরজা খোল।' গলার স্বর চাপা এবং কেমন যেন জড়িত।

ডাকটা কোন্‌দিক থেকে আসছে বুঝতে চেষ্টা করলাম। সমস্ত মনোযোগ কানের ভেতর আনতেই টের পাওয়া গেল, বাইরে থেকে আসছে।

রাতের এই শেষ যামে কে ডাকতে পারে? রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মঙ্গলের ঘুম ভেঙেছে কিনা, বুঝতে পারলাম না। এ বাড়ির যেখানেই সে থাক, শীতের এই শেষ রাতে কম্বলের উষ্ণ আরাম ছেড়ে সহজে এসে যে দরজা খুলে দেবে, এমন মনে হল না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লাম। পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে হাতড়ে স্যুইচ বোর্ডটা বার করলাম। আন্দাজে খুট খুট করে কয়েকটা বোতামও টিপলাম; কিন্তু না, করিডরের আলো জ্বলল না। অবশেষে শেষ বোতামটা টিপতেই জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠল।

করিডরটার মাঝামাঝি অংশ থেকে একটা পথ দক্ষিণে যেখানে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে সেটাই সদর দরজা। ছিটকিনি খুলতে গিয়ে যে আওয়াজ হল তা বাইরের লোকটা বোধ হয় টের পেল। আগের মতো জড়ানো অথচ বিরক্ত স্বরে বলল, 'কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি, বাবুর হুঁশ নেই। কি ঘুমুতেই যে পারিস মঙ্গলদা—'

ইতিমধ্যেই দরজা খুলে ফেলেছি।

আমাকে দেখে নিশান্তের আগন্তুক যেন হকচকিয়ে গেল। বলল, 'আপনি!'

আমি তাকে দেখছিলাম। চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা, গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, চওড়া কপাল, ধারালো চিবুক। পোশাকরুচিতে অমল যতখানি উদাসীন, এ ঠিক ততখানিই সচেতন। কিসের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কী পরলে মনোহরণ হওয়া যায় সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান অপরিসীম। পায়ে ব্রাউন রঙের চকচকে জুতো, পরনে দামী সিল্কের বুশ শার্ট আর ট্রাউজার্স।

চোখ দু'টি এই মুহূর্তে ঈষৎ রক্তিম ; মুখ থেকে উগ্র মিষ্টি গন্ধ আসছে। ঐ গন্ধ এবং বর্ণ কিসের কল্যাণে তা টের পেতে অসুবিধা হল না।

বয়েসে আমার চাইতে কয়েক বছর বড়ই হবে।

সে আবার বলল, 'অপনাকে তো চিনতে পারলাম না—'

বললাম, 'আমার নাম চিরঞ্জীব—'

'চিরঞ্জীব—চিরঞ্জীব—নামটা যেন কোথায় কার কাছে শুনেছি। নো, এক্জাক্টলি আই কান্ট রিমেম্বার—,' স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল সে কিন্তু নেশার এই ঘোরে পেরে উঠল না।

নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই সে বলে উঠল, 'দরজা খুলে খুব উপকার করলেন, থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ—,' স্খলিত পা ফেলে ফেলে সে চলে গেল।

বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজা বন্ধ করলাম। তারপর করিডরের আলো নিভিয়ে ঘরে ফিরে লেপের তলায় নিজেকে সঁপে দিলাম।

কিন্তু ঘুম এল না। আজ আর বোধ হয় ঘুম আসবে না। নেশাপ্রমত্ত যে যুবকটিকে এইমাত্র দরজা খুলে দিলাম, ঘুরে ঘুরে তার কথাই ভাবনার মধ্যে হানা দিচ্ছে। কে সে ? নাম-না-জানা কোন ইন্দ্রিয় বুকের ভেতর থেকে যেন ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, রিন্টু আর অমলকে তো দেখেছ, তারা তোমার পিসেমশাই চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছেলে। আর এটি নিশ্চয়ই বড় পুত্র।

তিন ছেলে, বিশেষ করে রিন্টু আর প্রথমটির (তার নাম এখনও জানি না) যে নমুনা দেখলাম তাতে পিসেমশাইয়ের নিষেধাজ্ঞা জারির সঙ্গত কারণ আছে। অবশ্য অমল সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই খানিকটা দুর্বলতা জন্মে গেছে ; সে কি তার আপন-করা সহজ সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ? হয়তো বা।

ঘুম এল না ; ঘুমের জন্য আমি এই মুহূর্তে লালায়িতও নই। ভ্রমরের ডানায় অশ্রান্ত গুঞ্জনের মতো তিনটি ভাই ফিরে ফিরে আমার স্নায়ুতে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। তিন ভাইয়ের এক জায়গায় আশ্চর্য মিল। তিনজনেই নিশাচর। রিন্টু আর অমল ইতিমধ্যেই রাত্রে দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করেছে ; আমার ধারণা তাদের দাদার কাছে থেকেও সাহায্যের আবেদন আসতে দেরি হবে না। তিন ভাইয়ের জন্য আমাকে হয়তো রাত জেগে বসে থাকতে হবে। বিনা ঘুমের সেই নিশিযাপন কবে থেকে আরম্ভ হবে, সেটাই হচ্ছে কথা।

আরো খানিকটা পর পূব দিকে আলো-আলো ছোপ ধরল। অন্ধকারটা

এখন একেবারেই ফিকে, তবে কুয়াশা আছে—ঘন অনড় সেই কুয়াশা চোখের সামনের সব কিছুকে ঝাপসা করে রেখেছে। শিয়রের দিকে যে গাছপালা-বাগান-পথ এবং দূরের বনানী কাল দেখেছিলাম; তারা আজ অন্য রকম। কুয়াশা মুড়ি দিয়ে কেমন যেন অপরিচিত রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

লেপের ভেতরকার উষ্ণতা গায়ে মেখে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারতাম। শীতভোরের আরামটাকে আরো দীর্ঘ করে নেওয়া যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে বিছানায় শৃঙ্খলিত থাকতে ভাল লাগছে না।

লেপটাকে পায়ের দিকে ঠেলে উঠে পড়লাম। তারপর আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বাইরে এলাম।

এখনও এ বাড়ি জেগে ওঠেনি খুব সম্ভব। কোথাও কোন শব্দ নেই। ঘুমের আরকে সবাই নিমজ্জিত হয়ে আছে। ভাবলাম, বাইরের বাগানটায় গিয়ে একটু হাঁটি।

সদর দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হল; সেটা খোলা। হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ ধাক্কা লাগল যেন। কাল শেষ রাতে দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম তো? না হাট করে খুলে রেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম? স্মৃতির সলতে বার বার উস্কে দিয়েও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। সদর খোলা; চোর আসাও অসম্ভব না।

শঙ্কিত দ্বিধাগ্রস্তের মত বাইরে পা দিলাম। দিয়েই দেখতে পেলাম, পিসেমশাই খুরপি এবং কাঁচি দিয়ে গাছেদের পরিচর্যা করছেন। শীতের এই ভোরেও পরনে একটা খাকি হাফ প্যাণ্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। সর্বাঙ্গ মাটি এবং শিশিরে মাখা।

পিসেমশাই-ই তা হলে দরজা খুলে বাগানে এসেছেন। খানিকটা আশ্বস্ত হলাম, তবে সংশয়টা পুরোপুরি কাটল না।

বাগানের মাঝামাঝি আসতেই পিসেমশাই আমাকে দেখতে পেলেন। বললেন, 'ঘুম ভাঙল?'

আড়ষ্ট স্বরে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পিসেমশাই আবার বললেন, 'তুমি খুব আর্লি রাইজার দেখছি।' তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন একটু প্রশংসা ছিল।

এবার আমি চুপ করে রইলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'দেয়ার আর থ্রী নবাবস্ ইন মাই হাউস।' প্রথমে ইংরেজীতে বলে পরে আবার বাংলায় তর্জমা করে দিলেন, 'তিনটি নবাব আমার

বাড়িতে আছেন। তাঁদের কখন ঘুম ভাঙে জানো ? সূর্য যখন মাথার ওপরে।'

পিসেমশাই কাদের কথা বললেন বুঝতে পারলাম। ছেলেদের সম্বন্ধে কালই তাঁর বিরূপতার আভাস পেয়েছিলাম ; আজও পেলাম। আমি আর কি বলব ? নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে হল।

পিসেমশাই বললেন, 'সে যাক গে, তোমার বুঝি সকালবেলা বেড়াবার অভ্যাস ?'

অভ্যাস বলা যায় না ; তবে দেশে থাকতে মাঝে মাঝে সকালবেলায় জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে ধলেশ্বরীর দিকে খানিকটা হেঁটে আসতাম। দু-ধারে অবারিত ধানের ক্ষেত, খাল, হিজল আর বন্যা গাছের ডালে ঘুমভাঙা পাখিদের নাচানাচি—আমার ভারি ভাল লাগত।

পিসেমশাইয়ের সামনে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ করছি না। বেশি কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। আড়ষ্টতার একটা বৃত্ত আমাকে চারপাশ থেকে যেন ঘিরে আছে। খানিক সত্য খানিক মিথ্যে মিশিয়ে সংক্ষেপে উত্তর চুকিয়ে দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, বেশ—তা আর তোমাকে ধরে রাখব না ; বেড়িয়ে এসো।' একটু ভেবে আবার বললেন, 'পারলে দক্ষিণ দিকেই যেও।'

এই বাগানে পায়চারি করতেই এসেছিলাম। কিন্তু পিসেমশাই রয়েছেন ; অতএব সিদ্ধান্তটা বদলে তাড়াতাড়ি বাইরের রাস্তায় চলে গেলাম।

রাস্তাটা উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে ; এখনও তার গায়ে পীচের মলাট পড়েনি ; কুমীরের পিঠের মত সব জায়গায় খোয়া মাথা তুলে আছে। অসাবধানে পা পড়লেই এখানে মাধ্যাকর্ষণ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করলাম। কোন্ দিকে যাব ? উত্তরে অথবা দক্ষিণে ? পিসেমশাই অবশ্য দক্ষিণেই যেতে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত অন্যমনস্কের মত সেদিকেই পা বাড়ালাম।

অন্ধকার আরো ফিকে হয়ে গেছে ; কুয়াশার গাঢ়ত্ব কমেনি একটুও ; চারদিকে তা থিকথিক করছে। তার ভেতর দিয়ে এগুতে লাগলাম।

কাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে এদিকটা চোখে পড়েছিল। ধ্বংসস্তূপের মত সেই বাড়িগুলো এখনও ঘুমের দেশে।

বাড়িগুলো পেরিয়ে গেলাম। তারপর ফাঁকা মাঠ, হোগলা বন, ইতস্তত জলাভূমি। কদাচিৎ দু-চারটে বাড়ি। এখানে ফাঁকা জায়গাই বেশি ; তুলনায় ঘরবাড়ি অনেক কম। দূরে দূরে পেন্সিলের আঁচড়ের মত গ্রামের আভাস

পাওয়া যাচ্ছে।

রাস্তাটা সোজা অনেকখানি এগিয়ে হঠাৎ বাঁক ঘুরে পশ্চিমগামিনী হয়েছে। আমিও রাস্তার সঙ্গে বাঁক ঘুরলাম।

এতখানি পথ এসেছি। আশ্চর্য, একটা মানুষও এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। এই ভোরবেলাতেও সমস্ত এলাকাটা একেবারে নিশুতিপুর।

যাই হোক, পশ্চিমে খানিক যাবার পর আমি হতবাক। হোগলা বন আর জলাভূমির কাছ থেকে মাটি ছিনিয়ে এনে এখানে উপনিবেশ বসেছে। যতদূর চোখ যায়, সারি সারি অসংখ্য ঘর। ওপরে টালির চাল; চারধারে কাঁচা বাঁশের বেড়া; ভিত মাটির।

দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, নতুন বসতি। বাড়িগুলোর গড়নে পূর্ববাঙলার ছাপ সুস্পষ্ট। মনে হচ্ছে কলকাতার শহরতলীতে নয়, ঢাকা ফরিদপুর অথবা কুমিল্লার কোন গ্রামে এসে পড়েছি।

তীব্র আকর্ষণ বোধ করছিলাম; লম্বা লম্বা পা ফেলে নতুন বসতির দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছাকাছি আসতে আরো অনেক কিছু চোখে পড়ল; বাড়ির চালগুলো লাউ-কুমড়োর ফলন্ত লতায় ছেয়ে আছে; প্রতিটি বাড়ির উঠোনই তকতকে করে নিকানো; এককোণে মাটির তুলসীমঞ্চ।

ইতিমধ্যে এখানকার ঘুম ভেঙে গেছে। কোন কোন বাড়িতে হাঁসও দেখতে পেলাম, তাদের প্যাঁক-প্যাঁকানিতে জায়গাটা মুখর।

এক বাড়িতে দেখলাম মধ্যবয়সী চাষীশ্রেণীর একটি লোক সুতী চাদর জড়িয়ে অয়েশ করে হুঁকো টানছে; শীতের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লোকটি হুঁকো টানা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চেখে তাকাল।

বললাম, 'আচ্ছা, এ সব কি নতুন বসত?'

'আইজ্ঞা বাবু—,' লোকটি মাথা নাড়ল, 'জবর-দখল কোলোনি। বসেন—' ঘর থেকে একখানা জলচৌকি এনে আমায় বসতে দিল।

তার কথায় পূর্ব বাংলার টান খুব স্পষ্ট; পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর দেশ যেন আমার স্মৃতি, আমার ধ্যান, আমার অনুভবের ভেতর থেকে আচমকা সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার সঙ্গে হঠাৎ অত্যন্ত আত্মীয়তা বোধ করলাম। উৎসুক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'জবর-দখল কলোনি কী?'

লোকটা এবার বুঝিয়ে বলল। কিছুদিন আগেও, এ অঞ্চলটা ছিল বসতি-শূন্য। হোগলা বন, আর জলাভূমির তলায় পৃথিবী এখানে আত্মগোপন করে

ছিল। তার শান্তি ছিল অবাধ ; তার নীরবতার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য কেউ এখানে আসত না।

কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি যেদিন দেশটাকে দু-টুকরো করে দিল সেদিন থেকেই বুঝি-বা এ জায়গাটার ললাটলিপি অন্যরকম হল। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে আসতে লাগল পশ্চিম বাংলায়। নির্ভুম মানুষের দল দিগ্বিদিকে ছুটতে লাগল একটুখানি ভূমির জন্য। পদ্মামেঘনায় কূল থেকে ধলেশ্বরী অথবা ইলসার চক থেকে যে জীবনকে মূলসুদ্ধ তাদের তুলে আনতে হয়েছে তাকে নতুন সাধনায় নতুন মাটিতে আবার পুষ্পিত করে তুলতে চেয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা সন্ধান পেয়েছে এই জায়গাটার। রাতারাতি অরণ্য আর জলাভূমির দখল থেকে মাটি ছিনিয়ে এনে তারা গড়ে তুলেছে উপনিবেশ। তাদের স্মৃতির মধ্যে সত্তার মধ্যে যে পূর্ব বাংলা ছিল এখানে তাকেই মনের মত করে রূপ দিতে চেয়েছে।

মানুষ কোন অবস্থাতেই বুঝি পরাজয় মানে না। প্রয়োজন হলেই সে অপরাজেয় সৈনিক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে যারা উপনিবেশ গড়েছে দেশ হারাবার বেদনার মধ্যে তারা শূন্য হয়ে যায় নি। অদম্য অসীম উৎসাহ তাদের নতুন জীবনের সিংদরজায় পৌঁছে দিয়েছে।

হঠাৎ শিয়ালদা স্টেশনের হাজার হাজার উদ্বাস্তুর কথা মনে পড়ল। ওরাও হয়তো একদিন এদের মতই জীবনকে নতুন ভূমিতে পুষ্পিত করে তুলতে পারবে।

আরো কিছু ভাবতে যাচ্ছিলাম; সেই সময় লোকটা বলে উঠল, 'নয়া দ্যাশে আইসা নয়া বসত বানছি (বেঁধেছি) কিন্তুক মনে সুখ নাই।'

'কেন ?' আমি উন্মুখ হলাম।

'এই জায়গাগুলির মালিক আছে। সত্য কথা, আমরা জোর কইরা দখল করছি কিন্তুক এতকাল তো পতিত আছিল, তখন নজর দ্যায় নাই। জঙ্গল কাইটা, সাপ-শুয়োর মাইরা, জলা জায়গা ভরাট কইরা ঘর বানাইছি। অখন টনক নড়ছে। আমাগো উচ্ছেদ করতে চায়। গুণ্ডার দল আইনা কতবার যে হামলা করছে হিসাব নাই। দাঙ্গায় দুই দলেই জখম হইছে কিন্তুক আমরা ছাড়ুম না।'

লোকটার চোখ উদ্দীপনায় চক চক করতে লাগল, 'গুণ্ডা পাঠাইয়া কখন ঘর দুয়ার জ্বালাইয়া দ্যায়, তার লেইগা (জন্য) সব সময় সাবধানে চোখ কান মেইলা থাকতে হয়। রাইতেও ঘুমাইতে পারি না। কওয়া যায় না; তখনও

তারা আইসা ঝামেলা বাধাইতে পারে।'

অন্তহীন দুর্ভাবনা আছে, মাথার ওপর বিপদ সর্বক্ষণ খাঁড়ার মতো ঝুলছে, তবু এরা কিছু করতে পেরেছে। সারি সারি এই ঘরগুলির গায়ে তাদের অফুরন্ত সংগ্রামের কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা।

আমি যেন সঞ্জীবনীর স্পর্শ পেলাম। কলকাতায় আসার পর এই প্রথম মনে হল, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। চেষ্টা করলে আমতলি গ্রামের উন্মূল জীবনকে আমিও এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

লোকটি আবার বলল, 'আমাগো কথা থাউক; আপনের পরিচয়টা কিন্তুক অখনও জানি না বাবু।'

আমিও আপনাদের মতো উদ্বাস্তু; দেশ থেকে কালই সবে এসেছি।'

আমার সম্বন্ধে লোকটির আগ্রহ এবার যেন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। পরিপূর্ণ উৎসুক দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ করে বলল, 'কাইল আসছেন? দ্যাশ ছিল কোন জিলায়?'

'ঢাকা জেলায়; আমতলি গ্রাম।'

'আপনেরা?'

'ব্রাহ্মণ।'

'বাম্ভন—পন্নাম।' হুঁকো নামিয়ে লোকটা মাথা নীচু করে হাতজোড় করল।

আমি সঙ্কুচিত হলাম। ব্রাহ্মণের প্রতি এখনও যে এতখানি ভক্তি জমা আছে; এ এক অভিজ্ঞতা বটে। বিব্রতভাবে বললাম, 'ছি-ছি, ব্রাহ্মণ বলে কি!'

'আইজ সকাল উইঠা বাম্ভনের মুখ দেখলাম; দিনটা ভাল যাইব।'

আমি আরো কুণ্ঠিত হলাম; কিছু অবশ্য বললাম না।

লোকটা বলল, 'আমরা যুগী; আমার নাম শিধর (শ্রীধর) নাথ। দ্যাশ আছিল বাবু ফরিদপুর জিলায়; ভোজেশ্বরে। দুই বচ্ছর হইল দ্যাশ ছাইড়া আইছি। মনে হয় কতকাল!'

শ্রীধরের বুকের ভেতরে অনেকগুলো স্তর ঠেলে ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। গাঢ় গভীর বিষণ্ণ সুরে সে বলতে লাগল, 'দ্যাশ থিকা আইসা এক বচ্ছর পইড়া আছিলাম শিয়ালদা ইস্টিশানে। তারপর এই জবর দখল কোলোনি পত্তন করছি।'

আমি শ্রীধরের কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার মাথার ভেতর অন্য একটা ভাবনা এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ-চমকের মত ফুটে উঠেছে। বললাম, 'আচ্ছা নাথমশায়—'

'বলেন বাবু—'

'আপনাদের এখানে আর জমিটমি আছে? খান দুই-তিন ঘর তোলার মতো?'

'আপনে আইবেন?' শ্রীধরের চোখ চকচকিয়ে উঠল।

বললাম, 'হ্যাঁ। আপাতত আমি দেশ থেকে এসেছি; এখানে একটা ব্যবস্থা করতে পারলে বাবা-মা-বোনকে নিয়ে আসব।'

'আছে কিছু জমিন; আমি আইজই বাঁশের খুঁটা কুইপা (পুঁতে) আপনের লেইগা দখল কইরা রাখুম। বাম্ভন পিতিবেশী (প্রতিবেশী) পাওয়া সুভাগ্য। তবে একখান কথা—'

'কী?'

'বেশিদিন কিন্তুক জমিন ফেলাইয়া রাখন (রাখা) যাইব না। তাড়াতাড়ি ঘর তুইলা লইতে হইব। না হইলে অন্য কেউ দখল কইরা ফেলাইব।'

কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, তাড়াতাড়িই ঘর তুলে নেব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শ্রীধরই নীরবতা ভাঙল, 'আইচ্ছা বাবু—'

'বলুন!'

'আপনে তো কাইল আসছেন। তা দ্যাশের অবস্থা কেমুন?'

'ভাল না।

'আমাগো ফরিদপুরের খবর কিছু জানেন?'

'সব জায়গারই এক অবস্থা।'

বিমর্ষ মুখে শ্রীধর এবার বলল, 'আপনে বাম্ভন মানুষ; অনেক লিখাপড়া জানেন—'

হেসে বললাম, 'অনেক লেখাপড়া জানি, কে বললে?'

'হে মানুষ দেখলে বুঝা যায়।'

'যায় নাকি?'

'নিচ্চয় তো বাবু এট্টা কথার উত্তর দ্যান।'

'কী কথা?'

'দ্যাশ কি ভাল হইব না? আর কুনোদিন ফিরতে কি পারুম না?'

'কেন এখানে তো ঘরবাড়ি করে আছেন।'

'কিসে আর কিসে বাবু। এক মাটি থিকা গাছ তুইলা আরেক মাটিতে আইনা বসাইলে কি বাঁচে? বাঁচলেও তেমন কইরা কি বাঁচে; তেমন তেজ কি

থাকে ? তেমন ফুল ফল কি ধরে ?'

উপমাটা চমৎকার লাগল। কাল এসেছি ; পিসেমশাইয়ের বাড়িতে আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই আমার জন্য মজুদ তবু সহজ হতে পারিনি। বনের ফুলকে টবে এনে বসালে শোভা হয়তো বাড়ে কিন্তু ফুলটা প্রাণে বাঁচে কি ? পুরনো মাটি, পুরনো আলো, পুরনো বাতাস এবং পুরনো পরিবেশ থেকে উপড়ে নতুন জায়গায় বসালে গাছের আর কিছু থাকে ?

আরো কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর বললাম, 'আজ চলি নাথমশায় ?'

'তাই কি হয় বাবু ; এট্টু চা না খাওয়াইয়া যাইতে দিতে পারি !'

পূর্ব বাংলা থেকে চলে এসেছে দু'বছর কিন্তু সেখানকার আতিথেয়তাটা ভোলে নি। অগত্যা আরো খানিকক্ষণ বসে চা খেয়েই উঠতে হল।

শ্রীধর আরেকবার উদার আমন্ত্রণ জানাল, 'তাড়াতাড়িই আইসা পড়বেন বাবু ; আমি আপনের জায়গা রাইখা দিমু।'

পাঁচ

এদিকে রোদ উঠে গেছে। পূব আকাশ থেকে হাজার হাজার পিচকিরি ভরে কারা যেন আলো ছুঁড়ে দিচ্ছে। কুয়াশা আর নেই। দু-পাশের গাছপালার পাতা সোনালী ঝালরের মত দুলছে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ধ্বংসস্তূপের মতো সেই পুরনো বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়লাম। ভোরবেলা এগুলোকে ঘুমন্ত দেখে গিয়েছিলাম। এখন ঘুমের দেশ থেকে সবাই জেগে উঠেছে। শুধু জাগেইনি ; প্রবলভাবে জেগেছে।

একটা বাড়ির সামনে বিচিত্র দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াতে হল। তিন থেকে চোদ্দ বছরের ভেতর দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে হাঁসের বাচ্চার মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কিচিরমিচির করছিল। সবারই মুখ-চোখের গড়ন একরকম। মনে হয় কুমোরবাড়ি থেকে একই ছাঁচে গড়া একদল পুতুল এখানে এসে পড়েছে। কুত-কুতে ক্ষুধার্ত চোখ, স্বাস্থ্যহীন অপুষ্ট শরীর, এই শীতসকালে তারা যা গায়ে দিয়েছে হিম ঠেকাবার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মলিনতা তাদের সর্বাঙ্গে শীলমোহরের মতো মারা রয়েছে। নিশ্চয়ই এরা ভাইবোন।

ছেলেমেয়েগুলো বসে আছে খোলা উঠোনে। একটা হিন্দুস্থানী নাপিত পর পর তাদের মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করে দিচ্ছে। একজন প্রৌঢ় ধুলো-ময়লা

কম্বল গায়ে জড়িয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে যুগপৎ পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করছে।

প্রৌঢ়ের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। তবে কতখানি উর্ধ্বে, বলা মুশকিল। শরীর রীতিমত স্থূল; মাথায় চুলের চাইতে টাক বেশি। প্রায়শূন্য সেই মরুভূমিতে যে ক'গাছি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তাদের রঙ কালো নয়, ধূসর। তবে মাথার শূন্যতা পূরণ হয়েছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। এমন উর্বর চামড়া, লোমের এমন উদার অভ্যুদয় আগে আর কখনও দেখিনি। কান-নাক থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে চুল ঝুলছে। পুরু ঠোঁট, ভাবলেশহীন চোখ। মুখখানা কাঁচাপাকা দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। মনে হয় আদি পুরুষের একটি আধুনিক সংস্করণকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ধারাল ক্ষুরের তলায় মাথা দিয়ে বাচ্চাগুলো নড়াচড়া করলেই প্রৌঢ় ধমক দিয়ে উঠছে, 'অ্যাই গুবরে; খবদ্দার নড়বি নি। মাথা চ্যালা হয়ে যাবে।'

ক্ষুরের নীচের মাথা তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে যাচ্ছে।

এতগুলো মাথা একসঙ্গে মুড়নো; দর্শনীয় ব্যাপার বটে। সবাই ন্যাড়া হবার পর কেমন দেখাবে, ভাবতেই ভারি মজা লাগছে।

এই মুহূর্তে যে ছেলেটির মাথা কামানো হচ্ছে সে উসখুস করে উঠল। মাটি কাঁপিয়ে প্রৌঢ় হুঙ্কার ছাড়ল, 'অ্যাই হারামজাদা—'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা সুশীল সুবোধ হয়ে গেল।

প্রথম দিকে কৌতুকই বোধ করছিলাম; অতর্কিতে অন্য একটি সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। এতগুলো ছেলে-মেয়েকে একসঙ্গে ন্যাড়া করা হচ্ছে। তবে কি এদের মা অথবা বাবা কেউ মারা গেছে?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু কই শোকোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে জন তিনেকের মত কামানো হয়ে গেছে। বাকি যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে অধীর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। একটা উত্তেজিত চেঁচামেচি চলছে সেখানে। প্রৌঢ় সেদিকে ফিরে গর্জন করল, 'অ্যাই চোপ, কে চেল্লাচ্ছে? কী ব্যাপার?'

একটি ছোট মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরু গলায় বলল, 'বাবা, নবু বলছে ন্যাড়া হবে না।'

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অন্তত এদের পিতৃদায় ঘটেনি। মা সম্বন্ধে সংশয়টা অবশ্য এখনও কাটেনি।

এদিকে প্রৌঢ়ের ভাবশূন্য ঘোলাটে চোখে আগুন জ্বলে উঠেছে। সে

হুমকে উঠল, 'নবা—'

নবা অর্থাৎ নবু নামক ছেলেটি জটলার মধ্য থেকে বলির পশুর মত উঠে দাঁড়াল। বছর বারো বয়েস। বাপ সম্বন্ধে ভীতি আছে, সেই সঙ্গে কেমন যেন ঘাড়-বাঁকানো দুর্বিনীত একটি ভঙ্গি মেশানো।

প্রৌঢ় বলল, 'তুই নাকি ন্যাড়া হতে চাস না?'

নবু চুপ।

প্রৌঢ় চেঁচিয়ে উঠল, 'কি, মুখ বুজিয়ে আছিস যে?'

চাপা বিদ্রোহের স্বরে নবু এবার বলল, 'বার বার আমি ন্যাড়া হতে পারব না।'

'ন্যাড়া হবে না! বাপের জমিদারি আছে তোর শোরের বাচ্চা?' প্রৌঢ় চিৎকার করতে লাগল, 'তোর বাপ ন্যাড়া হবে। তুই তো ছানা রে—'

নবু নিরুত্তর; ঘাড় গুঁজে সে বসে পড়ল।

বিদ্রোহ দমন হয়েছে দেখে প্রৌঢ় মোটামুটি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতের জন্য সে সাবধান করে দিল, 'আর যেন এমন কথা না শুনি। যেদিন নিজেরা রোজকার করতে পারবে সেদিন দশআনা ছ'আনা ছাঁট দেবে। আমার পয়সায় ছাঁটতে হলে মাথা মুড়োতেই হবে। মনে থাকে—'

গজ গজ করে আরো কি বলতে যাচ্ছিল প্রৌঢ়, সেই সময় আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। একটুক্ষণ থতিয়ে রইল সে; স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি!'

নাম বললাম। বলেই টের পেলাম, আমি এমন দেশবিশ্রুত ব্যক্তি নই যে নাম বললে সবাই চিনে ফেলবে।

ততক্ষণে প্রৌঢ় আবার বলে উঠল, 'আপনাকে আগে দেখিনি; আপনি কি এ পাড়ায় নতুন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সবে কালই পাকিস্তান থেকে এসেছি।'

প্রৌঢ়কে কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত দেখাল। সে বলল, 'ও তাই নাকি? তা এখানে উঠেছেন কোথায়?'

পিসেমশাইয়ের বাড়িটা দেখিয়ে বললাম, 'ঐ বাড়িতে—'

'ওটা তো চিত্তরঞ্জনবাবুর বাড়ি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ; উনি আমার পিসেমশাই।'

প্রৌঢ় নিস্তরঙ্গ স্বরে বলল, 'চমৎকার লোক চিত্তবাবু; আজ বিশ বছর পাশাপাশি আছি। এমন লোক দেখিনি।'

আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসাই করেছে প্রৌঢ়। সত্যি-সত্যিই প্রশংসা, না প্রশংসার ছদ্মবেশে অন্য কিছু করছে, বুঝতে পারলাম না।

এরপর কোথায় ছিলাম, কবে এসেছি, নাম কী ইত্যাদি ইত্যাদি গোটা কয়েক প্রশ্ন করল প্রৌঢ় ; আমি উত্তর দিলাম।

প্রশ্নোত্তর শেষ হলে প্রৌঢ় বলল, 'যাক আলাপ হল, প্রতিবেশী হলেন। সময়-সুবিধে পেলে আসবেন। ভাল কথা, আপনি এই সকালবেলা আমার বাড়ি এসেছেন, কিছু দরকার আছে?'

কেমন করে বলি মাথা-মুড়নোর পালা দেখবার জন্যই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কুণ্ঠিত স্বরে তবু বললাম, 'এই ওদের চুল কামানো হচ্ছে। ভাবলাম—'

নিষ্পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল প্রৌঢ়। তারপর বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন ওদের বাপ-মা কেউ মরেছে, তাই তো?'

চমকে উঠলাম। সত্যিই আমি তাই ভেবেছি। বিব্রতভাবে বললাম, 'না' মানে—'

প্রৌঢ় আপন মনে বলে উঠল, 'তা একরকম ভাবতে পারেন। ছ'মাস অন্তর অন্তর ওদের মাতৃ-পিতৃদায় হয়।'

তার বক্তব্য বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম।

আমার মনের কথা বোধ হয় পড়তে পারল প্রৌঢ়। বলল, 'বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়ই। বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বাড়িঘরের চেহারা দেখে নিশ্চয়ই রাজাবাদশা মনে হয় না। সত্যিই আমি গরীব ; খুব গরীব। এমনিতেই সংসার চলে না ; তার ওপর এতগুলোন মাথার চুল যদি একমাস পর পর ছাঁটতে হয় তো আমায় দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হবে। তাই ছ'মাস পর পর সবগুলোকে ধরে মাথা মুড়িয়ে দিই। তাতে অনেক দিক থেকে উপকার। এমনিতে একেক মাথা ন্যাড়া করতে তিন আনা লাগে। এতগুলোন মাথা কামালে পাইকিরি দর পাওয়া যায়। দশ পয়সা করে ফি মাথা। তা ছাড়া ছ'মাসের জন্যে নিশ্চিন্তও—'

কথা শেষ করতে পারল না প্রৌঢ় ; তার আগেই চাপা গলায় কে যেন বলে উঠল, 'বাবা—'

প্রৌঢ় চকিত হয়ে পেছন ফিরল। আমিও তাকালাম। একটু দূরে বারান্দা ; সেখানে এসে যে দাঁড়িয়েছে তাকে এই পরিবেশে কোনদিন যে দেখতে পাব তা ছিল অভাবনীয় ; আমার সুদূর কল্পনারও বাইরে।

বয়েস কুড়ির কাছাকাছি। গায়ের রঙ পাকা ধানের উপমা। রক্তাভ ঠোঁট

দুটি রসে ভরপুর। রাজহংসীর মত গলা, সরু কোমরের তলায় এবং ওপরে রীতিমত সুগঠনা সে। সরু তুলিতে টানা ভুরু; টলটলে দীঘির মত কালো ছায়াচ্ছন্ন চোখ। সুঠাম আঙুল; মনোরম বাহুলতা।

পরনে কালো জমির ওপর হলুদ ফুল-কাটা ছাপা শাড়ি আর কালো ব্লাউজ। সর্বাঙ্গে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই: দু'হাতে সবুজ কাচের দুটি নক্সাদার কঙ্কণ। এতেই তাকে রাজ্যেশ্বরী মনে হচ্ছে।

প্রৌঢ়কে বাবা বলেছে, নিঃসন্দেহে তার মেয়ে। এই স্থূল, রোমাকীর্ণ, মানুষ্যজাতির আদিম সংস্করণটির যে অমন একটি মেয়ে থাকতে পারে এ এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। এই গাছে ঐ ফল—জগতে কত বিচিত্র ব্যাপারই না ঘটে!

মেয়েটি বিরক্ত স্বরে আবার বলল, 'সবাইকে ডেকে ডেকে ঘরের কথা বলতে হবে? তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাবা।'

প্রৌঢ় আমাকেই বলছিল; অতএব অপরাধটা নিজের কাঁধে চাপিয়ে কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ হয়ে রইলাম।

মেয়েকে প্রৌঢ়ও রীতিমত সমীহ করে মনে হল। ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'তুইও যেমন বিনি। ঘরের কথা আর কোথায়! এই ওদের চুল কামানো নিয়ে —মানে, তেমন কিছু না।'

মেয়েটির নাম তবে বিনি। চোখ পাকিয়ে বিনি ধমকে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ঘন্টি বাজাতে বাজাতে একটি সাইকেল-রিকশা এসে থামল।

বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়াল প্রৌঢ়। লক্ষ্য করলাম, বিনি এবং উঠোনের ছেলেমেয়েগুলো স্থির নিষ্পলকে রিকশাটাকে দেখছে।

ভাড়া চুকিয়ে রিকশা থেকে যিনি নামলেন তাকে কী বলা যায়? মদালসা? মদিরেক্ষণা? চোখ দুটি ঢুলুঢুলু; নেশার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দৃষ্টি দূরভেদী কিন্তু খাঁচার পাখির মত ছটফটে, চঞ্চল। পানের রসে পাতলা ঠোঁট দুটি টুকটুকে। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। সৌন্দর্যের ঈশ্বর ঠিক নয়, কামের ঈশ্বর তাঁর সর্বাঙ্গে আকর্ষণের মন্ত্র লিখে রেখেছে। বয়েসের কিছু ভার পড়েছে, শরীরের অনেক ধারাল রেখা মেদের তলায় বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে। রূপে এখন আর মধ্যদিনের দীপ্তি নেই, তবে একেবারে অস্তগামীও নয়। সারাদেহ ঘিরে এমন এক আলস্য-ভরা কুহক তাঁর ছড়ানো যে দেখামাত্র স্নায়ু ঝিম ঝিম করতে থাকে। পরনে টকটকে লাল সিল্ক; কানে চুনীর দুল, নাকে লাল মীনে-করা নাকছাবি, গলায় লালপাথর-বসানো হার, পায়ে লাল স্লিপার। মহিলাকে ঘিরে যেন আগুন জ্বলছে। কপালে অথবা সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন

নেই। ফলে সে কুমারী, বিবাহিতা অথবা বিধবা বুঝবার উপায় নেই।

প্রৌঢ় ভীত স্বরে বলল, 'আবার আপনি কেন এসেছেন?'

বিচিত্র মধুর হেসে নবাগতা বললেন, 'সে তো আপনি জানেনই।'

অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠল প্রৌঢ়। ভয়ার্ত ব্যাকুল মুখে বলল, 'দরকার নেই আমার উপকারের; আপনি যান।' বলেই পেছন ফিরে বিনির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হারামজাদী মেয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সং দেখছ? যাও, ভেতরে যাও।'

মা-পাখি যেমন ডানা মেলে মেলে তার শিশুকে বিপদের মুখে আগলে রাখে ঠিক তেমনিভাবেই আড়াল করে করে বিনিকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল প্রৌঢ়।

সমস্ত ঘটনাটা যেমন অভাবনীয় তেমনি অস্বস্তিকর। সাইকেল রিকশায় করে যে মহিলাটি এসেছেন তাঁকে দেখামাত্র প্রৌঢ়র কেন ঐরকম ভাবান্তর ঘটল, কেন সে অমন চকিত হয়ে উঠল, কেনই বা ভীতভাবে দু-হাতে নিজের মেয়েকে ঢেকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল, জানি না। আমার জানবার কথাও না।

সুবেশ মহিলাটি কে, তাঁর সঙ্গে প্রৌঢ়র কী সম্পর্ক তা-ও আমার অজানা। সম্পর্ক যাই থাক, সেটা যে প্রীতির নয়, প্রৌঢ় যে আগন্তুক মহিলাটিকে ভয়ানক অপছন্দ করে, অপছন্দের চাইতে ভয় পায় অনেকগুণ বেশি, তা টের পেতে অসুবিধা হচ্ছে না।

এদের কারোকেই চিনি না। কোন ব্যাপারেই এদের সঙ্গে আমার সংযোগ নেই। পথ চলতে আকাশ দেখে, পাখি দেখে কিংবা অন্য কোন দৃশ্য দেখে মানুষ যেমন একটু দাঁড়ায় তেমনি তাদের দেখে খানিক কৌতুকে খানিক কৌতূহলে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। মহিলাটি রিকশা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়র যে রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে, আবহাওয়াটা যেরকম অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে তাতে আমার পক্ষে এখানে থাকা আর শোভন নয়। আমার চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু অশোভন জেনেও দাঁড়িয়ে আছি। কি এক বিমূঢ়তা—নাকি অন্য কিছু যার নাম আমার জানা নেই—আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

প্রৌঢ়ের ঐ রকম অভ্যর্থনার জন্য মহিলাটি কি প্রস্তুত ছিলেন? বুঝতে পারলাম না। স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলেন মহিলা। যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে এবার তিনি ডাকলেন, 'ভূষণ কাকা—'

আগে লক্ষ্য করিনি। এবার টের পেলাম, মহিলার কণ্ঠস্বর মিষ্টি, সুরেলা। তার সঙ্গে কড়া ধাতব রেশ মেশানো। পাতলা ব্রোঞ্জের চাদরে লোহার টুকরো

দিয়ে আস্তে আস্তে ঘা দিলে যে ঠিন ঠিন শব্দ হয় তার সঙ্গে স্বরটার যথেষ্ট মিল।

প্রৌঢ়র নাম যে ভূষণ এই প্রথম জানতে পারলাম। দরজার পাল্লার আড়ালে নিজেকে আধাআধি গোপন রেখে বাকি অর্ধেকটা বার করে জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল সে। গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে মিশ্র একটা আওয়াজ তুলে বলল, 'না, আপনি যান।'

'আমার একটা কথা শুনুন ভূষণ কাকা—'

'না কোন কথা নয়। আপনি যান—'

উঠোনের এক কোণে গাছতলায় মাথা কামানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেগুলো আর নাপিত এদিকে তাকিয়ে আছে।

এতক্ষণে মহিলার মুখ লাল হয়ে উঠল। প্রৌঢ়র কথায় কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। সামান্য ভদ্রতা দূরে থাক, সে তাঁকে প্রথম থেকেই রূঢ়ভাবে বিদায় দিতে চাইছে। মহিলার একটি কথাও শুনতে সে রাজী না।

অপমানটা খুব বেশিক্ষণ নিজের গায়ে জড়িয়ে রাখলেন না মহিলা। হাঁসের পালকে জলের মত মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'আপনি আমার ওপর শুধু শুধু রাগ করছেন ভূষণ কাকা।'

প্রৌঢ় একই সুরে বলে যেতে লাগল, 'না, আপনি যান।' নিজের যে আধখানা দরজার বাইরে ছিল তা ভেতরে টেনে নিয়ে ঝপাৎ করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। অবশ্য অনেক আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। মুখের ওপর দুয়ার বন্ধ করে দেওয়াতে মহিলাটির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেদিকে না তাকিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে সামনের রাস্তায় চলে এলাম।

পথে এসে অবাক হয়ে গেলাম। এই বিশাল নগরে আমি যেজন্য এসেছি তা বিস্মৃত হয়ে এখানে অকারণে এতখানি সময় কেমন করে যে নষ্ট করে ফেললাম সেটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার। আমার পায়ে পায়ে যে দুর্ভাবনাটা ফিরছে কিছুক্ষণের জন্য তা যেন একটু দূরে সরে ছিল; আবার সেটা আমার সঙ্গ নিল।

কাল আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন; অকালের বাদলা সমস্ত দিনটাকে মলিন বিষণ্ণ করে রেখেছিল। আজ অবশ্য রোদ উঠেছে। তবু আকাশের এ-কোণে ও-কোণে দু-চারটে মেঘখণ্ড চোখে পড়ছে। ভোরবেলা যখন বেরুই ঘন কুয়াশা দেখেছি; এখন আর তা নেই। অনেক দূরে ময়দার গুঁড়োর মত মিহি হাল্কা কি যেন উড়ছে। বৃষ্টি নাকি? ঠিক বুঝতে পারছি না।

কালকের মত মেঘলা না হলেও রোদটা খুব উজ্জ্বল না ; ঘষা কাচের ওপর থেকে আসা আলোর মতন ঘোলাটে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে টের পেলাম মোটামুটি বেলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে পিসেমশাই-এর বাড়ি চলে এলাম।

ছয়

পিসেমশাই এখনও বাগানেই আছেন। খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে, আগাছা তুলে, কাঁচি দিয়ে মরা ডালপাতা ছেঁটে গাছের পরিচর্যা করছেন।

কালকের বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে গেছে। পিসেমশাইয়ের হাত-পা-হাঁটু,সারা গা কাদায় মাখামাখি। কপালে এই শীতের সকালেও ঘামের দানা ফুটে বেরিয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিসেমশাই আমাকে একবার দেখলেন ; কিছু বললেন না।

নিজের ঘরে গিয়ে মুখটুখ ধুয়ে নিলাম। বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতে আটটা বেজে গেল। আড়ষ্ট বিবর্ণ রোদটা এখন একটু সজীব হয়েছে।

আমার ঘরের তিন দেওয়ালে বড় বড় জানলা। সেগুলো দিয়ে বাগানের সবটুকু চোখে পড়ে। পিসেমশাইকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব গাছেদের পরিচর্যা শেষ করে তিনি বাড়ির ভেতর চলে এসেছেন।

'দাদাবাবু—'

বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ফিরে দেখলাম মঙ্গল চা আর খাবার-টাবার নিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপর কাপ-টাপগুলো রাখতে রাখতে বলল, 'আরো দু'বার চা নিয়ে এসেছিলাম। আপনি ছিলেন না।'

বললাম, 'আমি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'রোজ বেড়ানোর আপনার অভ্যেস ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এই সময় রোজ আপনার চা নিয়ে আসব ?'

'তাই এনো।'

একটু চুপ। তারপর মঙ্গল বলল, 'আপনি খান, আমি যাই।' দরজার দিকে খানিক এগিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল, 'কথাটা বেস্মরণ হয়ে গিয়েছিল। এই নিন, বড়বাবু এটা আপনাকে দিয়েছেন।' ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটুকরো কাগজ বার করে আমার হাতে দিল মঙ্গল।

কাগজের টুকরোটা নিয়ে ঈষৎ বিমূঢ়ের মত বললাম, 'কী ব্যাপার ? এতে কী আছে ?'

'আমি জানি না।' মঙ্গল চলে গেল।

ভাঁজ খুলে দেখলাম, আমার উদ্দেশে ইংরেজিতে টাইপ-করা একটা নির্দেশ আছে। বাঙলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় ; নিরাপদে পৌঁছুবার খবরটা টেলিগ্রাম করে বাড়িতে আজই জানিয়ে দেবে।

চকিত হলাম। আজ ভোরবেলা উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ আর ভূষণের বাড়ির সেই ঘটনাটা আমার মনোযোগের দুই প্রান্তকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছিল যে বাড়িতে খবর পাঠানোর কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। অথচ পিসেমশাই কিন্তু ভোলেন নি। কাল পিসেমশাইকে কেমন যেন হৃদয়বর্জিত রুক্ষ কর্কশ মনে হয়েছিল ; আমার সেই ধারণাটায় একটু দোলা লাগল কি ?

কাল দুপুরে এখানে এসেছি। নিরাপদে যে পৌঁছেছি তা কালই বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সবাই, বিশেষ করে মা আমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত অস্থির হয়ে থাকবেন। খাবেন না, ঘুমোবেন না। তাঁকে তো আজন্ম চিনি। সংসারের হাজারটা কাজ করবেন, কোন কর্তব্যেই তাঁর ত্রুটি হবে না। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে সবাইকে গোপন করে কাঁদবেন।

বাবার আমতলি গ্রাম আছে, রাজেক কাকা আছেন, 'বাহির' বলে একটা বিস্তীর্ণ জগৎ আছে। বাড়ির বাইরে একবার পা বাড়াতে পারলেই হল ; হাজারটা স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু মা ?

আমতলি গ্রামটা বদলে যাবার পর মা আর বাইরে বেরোন না। যাবেনই বা কোথায় ? সারা গ্রামে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে ; জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা স্রোতের মত কেউ গেছে আসামের দিকে, কেউ আগরতলায়, কেউ কুচবিহারে; কেউ বা পাড়ি দিয়েছে কলকাতার দিকে। বারুইপাড়া কুমোরপাড়া যুগীপাড়ার বাড়িগুলো এখন শূন্য। জীবনের মৃদুতম স্পন্দনও সেখানে অনুভব করা যাবে না। ধরিত্রীর সেই বিশিষ্ট অংশটিকে ঘিরে একদিন যারা জমজমাট আসর বসিয়েছে, আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশের ধারা অব্যাহত রেখেছে, সুখে-দুঃখে-উৎসবে-উচ্ছ্বাসে কল্লোলিত হয়েছে, তারা আজ আর কেউ নেই। ভূগোলের সেই সুদূর ভূখণ্ড থেকে অস্তিত্বের সমস্ত কলরব আর বংশ-পরিচয়ের সকল চিহ্ন মুছে দিয়ে, পুরুষানুক্রমে অপার মমতা আর অসীম স্নেহে লালিত বড় সাধের কাম্য জীবনটিকে পেছনে ফেলে সবাই চলে যাচ্ছে। জনশূন্য স্তব্ধ ভিটায় মা কার কাছে যাবেন ? নীল পুজো, মাঘ মণ্ডলের ব্রত, অধিবাস,

জলসই, নাটাইচণ্ডীর মানত—বাবার মত সারা গ্রামখানায় একদিন মাও নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রসারিত সত্তাকে এখন আমাদের বাড়ির ছোট্ট সীমাবদ্ধ অন্তঃপুরে গুটিয়ে আনতে হয়েছে। ঐটুকুর ভেতরেই এখন তাঁর চলাফেরা ওঠাবসা। সবিতাকে যখের মত আগলে বসে আছেন মা। এদিকে সেদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারলে মানুষ খানিক ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু এখন ভাবনা ছাড়া মায়ের আর কোন সঙ্গী নেই।

চিঠি লিখব না টেলিগ্রাম করব? টেলিগ্রামে আর কতটুকু জানানো সম্ভব? তবু মা-বাবাকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ করতে হলে টেলিগ্রামই করা উচিত। ঠিক করলাম, দুই-ই করব। একেবারে চিঠি লিখেই পোস্ট অফিসে চলে যাব; ডাকে চিঠিটা দিয়ে ওখান থেকেই টেলিগ্রাম করব।

খাটের তলা থেকে স্যুটকেশ টেনে এনে কাগজ-কলম বার করে চিঠি লিখতে বসলাম। নারায়ণগঞ্জে স্টীমারে ওঠার পর থেকে পিসেমশায়ের বাড়ি পৌঁছুনো পর্যন্ত দীর্ঘ পথে যা যা ঘটেছে যত অভিজ্ঞতা হয়েছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দিলাম; আমার জন্য দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলাম। লিখলাম যত শীগ্‌গির সম্ভব একটা চাকরি যোগাড় করে সবাইকে নিয়ে আসব। চাকরির ব্যাপারে পিসেমশাই কাল আমাকে যা বলেছেন তা অবশ্য লিখলাম না।

চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিলাম। এখনই পোস্ট অফিসে যেতে হবে। কিন্তু সেটা কোথায় কোন্ দিকে জানি না। রাস্তায় গিয়ে কারোকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেই চলবে।

ঘরের বাইরে আসতে দীর্ঘ বারান্দার শেষ প্রান্তে অমলকে দেখতে পেলাম। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে। চোখাচোখি হতে একটু হাসল; ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'সুপ্রভাত—'

এ জাতীয় ভব্যতায় আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। বিড় বিড় করে প্রতিধ্বনি করলাম, 'সুপ্রভাত—', আমার গলার স্বর খুব সম্ভব অতদূর পৌঁছুল না।

অমল আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকল না; লম্বা লম্বা পায়ে কাছে চলে এল। বলল, 'ঘুম থেকে এই উঠলে নাকি?'

'না, অনেকক্ষণ উঠেছি; খানিকটা ঘুরেও এসেছি।'

'প্রাতঃভ্রমণ?' অমল হাসল।

কিছু না বলে আমিও হাসলাম।

'আমি কিন্তু ভাই লেট লতিফ। সূর্যোদয় কী বস্তু কোন দিন দেখিনি। একেক দিন প্রতিজ্ঞা করি ভোরবেলা উঠব। কিন্তু ঘুম ভাঙলেই দেখি সূর্যটা

কখন উঠে বসে আছে। এই নিয়ে বাবার কাছে কত মার যে খেয়েছি ছেলেবেলায়!'

অমলের বলার ভঙ্গিটাই খুব মজাদার। আমি হাসতে লাগলাম।

অমল একটু ভেবে বলল, 'এই গ্যাখো না, আজ সকাল উঠে এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু ঘুম ভাঙল এইমাত্র।' বলতে বলতে হাই তুলল। মট মট করে আঙুল ফুটিয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

অমলের চোখেমুখে এখনও ঘুমের রেশ আর আলস্য মাখা রয়েছে। সে বলতে লাগল, 'পিতৃদেব তোমাকে খুব লাইক করবেন।'

পিতৃদেব মানে পিসেমশাই। অমল কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। অমল আবার বলল, 'ওল্ড ম্যান এই বয়েসেও ভোরবেলা উঠে পড়েন; হী উইল সিওরলি লাইক ইউ।'

আমি চুপ। পিসেমশাই যে আমাকে পছন্দ করে বসে আছেন তা আর বললাম না।

আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করে এবার অমল বলল, 'তুমি যেন বেরুচ্ছ, মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম, 'বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করব; চিঠিও একটা ডাকে ফেলতে হবে। আচ্ছা পোস্ট অফিসটা কোন্ দিকে?'

'একটু ওয়েট কর। জাস্ট ফাইভ মিনিটস। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, 'আমাকে বলে দিলেই চলে যেতে পারব। আপনি আবার কষ্ট করে যাবেন—'

কথা শেষ করবার আগেই জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল অমল, 'উঁহু—উঁহু—উঁহু—'

আমি হকচকিয়ে গেলাম, 'কী হল?'

'বার বার তুমি শর্ত ভঙ্গ করছ। কাল ঠিক করে নিলাম না, দুজনে দুজনকে "তুমি" বলব। "আপনি" "আজ্ঞে" এসব তো কালই আমরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় করেছি।'

হেসে ফেললাম, 'আমার মনে ছিল না।'

অমলও হাসতে লাগল, 'এই শেষবারের জন্য ক্ষমা করা গেল। ভবিষ্যতের জন্যে কিন্তু সাবোধান—'

'সাবোধান' শব্দটা চোখ পাকিয়ে আঙুল উঁচিয়ে এমনভাবে উচ্চারণ করল অমল যাতে খুব মজা লাগল। প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'বেশ সাবোধান।'

কালই ছেলেটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল ; আমার প্রাণের অন্তঃপুরে সে তার স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছিল। মেঘলা বিষণ্ণ দিনে অমল যেন মনোরম রৌদ্রঝলক। তার স্বভাবের মধ্যে এমন এক সকৌতুক স্বাদুতা আছে যা নিমেষে অন্যকে জয় করে নেয়।

যাই হোক আমার কুণ্ঠা বা আপত্তি কিছুই শুনল না অমল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে একটা গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে বলল, চল—'

লক্ষ্য করলাম চুলটুল আঁচড়াল না অমল। কালই দেখেছি নিজের সম্বন্ধে ছেলেটা খুবই উদাসীন। বিচিত্র এক দূরমনস্কতা সব সময় তাকে ঘিরে আছে। বললাম, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'চা-টা তো কিছুই খেলে না।'

'বাইরে খেয়ে নেব'খন। চল—', আমাকে একরকম তাড়া দিয়ে দিয়ে রাস্তায় নিয়ে গেল অমল।

খানিক আগেও দু-চারখণ্ড নিরীহ ভবঘুরে মেঘ দেখেছি। দূর দিগন্তে ঝোপ-ঝাড়ে-ঘেরা যে শ্যামল বনানীরেখা রয়েছে সেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো ময়দার মত কুয়াশা উড়ছিল ; এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। নির্মেঘ নীলাকাশে এখন সোনালী রোদের ঢল খেলছে।

রাস্তায় নেমে কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ হাঁটলাম। বাড়ি থেকে বেরুবার পরই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে অমল। গভীর কোন ভাবনার মধ্যে সে ডুবে আছে ; কথা বলে তার ধ্যানকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা হল না। শুধু যেতে যেতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ একসময় অমল ডাকল, 'বিলু—'

আমার ডাকনামটা কালই জেনে নিয়েছিল অমল। আদর অথবা অবহেলায় ঐ নামেই সে আমাকে ডাকল। তক্ষুণি সাড়া দিলাম, 'কী বলছ ?'

'মনে আছে কাল তোমায় বলেছিলাম, আমি কোনদিন ইস্ট বেঙ্গলে যাইনি। অথচ—', বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল অমল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অথচ কী ?

'ওটা আমাদের দেশ। বাবা তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তারপর থেকে এখানেই আছেন। আমরা তিন ভাই কলকাতায় হয়েছি কিন্তু কোনদিন পূর্বপুরুষের দেশটাকে চোখের দেখাটুকুও দেখিনি।'

কী বলব ভেবে পেলাম না।

অমল আবার বলল, 'কতবার ভেবেছি দেশটা দেখে আসব। ভেবেছিই শুধু; যাব যাব করে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

এবারও আমি কিছু বললাম না।

অমল বলল, 'আচ্ছা বিলু—'

'বল—', আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

'তুমি সিরাজদীঘার নাম শুনেছ?'

'শুনেছি। কেন?'

'ওখানেই আমাদের বাড়ি ছিল।'

'সিরাজদীঘা খুব বড় গঞ্জ।'

'তুমি গেছ?'

'অনেকবার।'

অমলের চোখ চকচক করতে লাগল, 'জায়গাটা খুব চমৎকার, না?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটু চুপ। তারপর অমল শুরু করল, 'জানো বিলু, ইস্ট বেঙ্গল সম্বন্ধে কত লিজেণ্ড যে শুনেছি। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী দিয়ে ঘেরা দেশটা যেন রূপকথা—ফেয়ারি টেলসের দেশ। ময়মনসিংহ গীতিকা পড়ে তো চার্মড্ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা দেশ শুধু জলের ওপর ভাসছে ভাবতেই অবাক লাগে। তার নদীতে নৌকোর সারি, তার বাইচ খেলা, তার সারী-জারি, রয়ালি আর ঢপের গান, তার ন্যাচারাল বিউটি—সব মিলিয়ে ইস্ট বেঙ্গল আমার কাছে ড্রীমল্যাণ্ড। একেক দিন রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে যে দেশকে কখনো দেখিনি তার কথা ভাবি। ভাবতে ভাবতে আমাদের গ্রাম, পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী—সব চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় আর আমার নেশার ঘোর লেগে যায়। তখন কি ভাল যে লাগে বিলু, তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

জল বাঙলা সম্বন্ধে অমলের ধ্যান পুরোপুরি রোমাণ্টিক। না-দেখা সেই দেশটিকে নিয়ে মনে মনে সে এক স্বপ্নরাজ্য গড়ে নিয়েছে; সজল-শ্যামল সুদূর সেই ভূখণ্ডটিকে ঘিরে তার প্রাণে তীব্র মোহময় আকর্ষণ। সে সম্পর্কে অমলের উচ্ছ্বাস আবেগ হয়ত কিছু বেশি কিন্তু সেগুলো যে খাঁটি সোনা এবং অকপট তা তার চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামায় মুদ্রিত রয়েছে।

এরপর একটানা অনেকক্ষণ নীরবতা।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল অমলের। আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এখন ক'টা বাজে বলতে পার?'

বললাম, 'আমার সঙ্গে তো ঘড়ি নেই।

ঘড়ির খোঁজে এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে রাস্তার ধারে একটা পানের দোকানে তা আবিষ্কার করে ফেলল অমল। ঘাড় নুইয়ে সময় দেখে বলল, 'সবে ন'টা কুড়ি। পোস্ট অফিস খুলতে এখনও চল্লিশ মিনিট বাকি।'

'তা হলে ?'

'ফর নাথিং এখন পোস্ট অফিসে গিয়ে লাভ নেই। তার চাইতে চল তোমাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে যাই।'

'কোথায় ?'

'কাল রাত্তিরে বলেছিলাম, রবিবার নিয়ে যাব। মনে আছে ?'

'আছে।'

'হাতে যখন সময় আছে, এখনই চল। একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সময়টা ভালই কাটবে।'

উনিশশো' একান্নর এই যাদবপুর যতখানি শহর তার চাইতে অনেক বেশি গ্রাম। কলকাতার কাছাকাছি থেকেও কলকাতার কোন গৌরবেরই সে শরিক না। না তার রাজপথের, না তার আকাশছোঁয়া প্রাসাদের, না তার উচ্ছ্বসিত ঝকমকানির, না তার অসংখ্য মানুষের ফেনায়িত কলরবের। না তার উদ্দাম উদ্‌ভ্রান্ত দুর্বার বেগের।

কলকাতার এত কাছে থেকেও যাদবপুর আশ্চর্য রকমের নীরব, নির্জন। ঝোপ-ঝাড়-ডোবা-পুকুর আর মাঠ, গাছপালায় ঢাকা নিবিড় ছায়াচ্ছন্নতা—এ ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না ; এই বেলা সাড়ে ন'টার সময় ঘুঘুর ডাক কানে আসছে ; কাছাকাছি কোন একটা-ঝোপের ভেতর ঝিঁঝিঁদের বিলাপ শোনা যাচ্ছে। যাদবপুরের জীবনের আহ্নিক গতি বড় ক্ষীণ, বড় দুর্বল, বড়ই স্তিমিত।

অনেকগুলো ঝোপ-ঝাড়-মাঠ পেরিয়ে আমাকে অন্য একটা খোয়া-ওঠা কর্কশ পথে নিয়ে এল অমল। পথটার দু-ধারে ইতস্তত কিছু কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ে।

একটা বাড়ির সামনে এসে থামল অমল ; অগত্যা আমাকেও থামতে হল।

বাড়িটার গায়ে পূর্ব-বাঙলার আদল মাখা। চারধারে সেই রকম কাঁচা বাঁশের বেড়া ; মাথায় টিনের চাল ; মেঝেটা মাটির। বাইরের দিকে একটা টিনের সাইন বোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা,' 'বাস্তহারা সঙ্ঘ। স্থাপিত ১৯৪৯ সাল।'

বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম সামনে একটা ঘরে আট-দশটি যুবক বসে আছে। তারাও আমাদের দেখতে পেয়েছিল। সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে পিণ্টু যে, আসো আসো—'

ওরা যে পূর্ব বাঙলার ছেলে অনায়াসেই টের পাওয়া গেল। আর পিণ্টু যে অমলের ডাকনাম কালই জেনেছি।

'এসো বিলু—', আমার হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল অমল।

বাইরে থেকে ঘরের খানিকটা অংশ চোখে পড়েছিল। ভেতরে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পেলাম, একপাশে একটা তে-পায়া তক্তপোশ পাতা। বাকি পা'টার জায়গায় ইট সাজানো। খানকতক হাতল-ভাঙা চেয়ার, একটা সস্তা-দামের টেবিল, পাল্লাহীন আলমারি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মনে হল, সব যেন চেয়ে-চিন্তে আনা।

'বাস্তুহারা সঙ্ঘ' নিশ্চয় ক্লাবটাব গোছের কিছু হবে। আসবাবের দীনতার সঙ্গে 'বাস্তুহারা' শব্দটা বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

যুবকদের সবাই অমল আর আমার প্রায় সমবয়সী; দু-এক বছর কমবেশিও হতে পারে। তবে তাদের মধ্যে হাতল ভাঙা চেয়ারে একটি লোক বসে আছে; যাকে ঠিক যুবক বলা যায় না। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। চওড়া চওড়া হাড়, তামাটে রঙ, ভারী চোয়াল, চৌকোমতন মুখে ছোট ছোট ধারাল চোখ, থ্যাবড়া চিবুক, মাংসল বুক-কাঁধ সব তার অপরিমিত বলশালীতার প্রতীক। অপাতচোখে ধরা যায় না; তবু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে কাঁপন তুলে কে যেন জানিয়ে দিল তার ভেতর কোথায় যেন খানিকটা নিষ্ঠুরতাও লুকিয়ে আছে।

লোকটি বলল, 'অনেক দিন পর আসলা পিণ্টু।'

আমাকে নিয়ে তক্তপোশে বসতে বসতে অমল বলল, 'হ্যাঁ সুরেশদা; নানা ঝামেলা নিয়ে আছি, আসা আর হয়ে ওঠে না।'

'তারপর তোমার লেবার ফ্রণ্টের কাজ কেমন চলতে আছে?'

'মোটামুটি।' অমল বলল, 'কথা পরে হবে সুরেশদা। আগে চা আনতে বলুন; সেই সঙ্গে মুড়ি তেলেভাজা-টাজা যা হয়। কিচ্ছু না খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি।'

লোকটি অর্থাৎ সুরেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরের ভেতর অন্য যারা বসে ছিল তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফটিক যা তো ভাই, চা-মুড়ি-টুড়ি নিয়া আয়। এই নে টাকা।' পকেট থেকে একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বার করে তার হাতে দিল।

পয়সা পেয়েই ছেলেটা ছুটল।

সুরেশ লেবার ফ্রন্টের যে কথাটা বলেছে আমার মাথায় সেটাই ঘুরছে। লেবার ফ্রন্ট অর্থাৎ শ্রমিক সংক্রান্ত কোন ব্যাপার-ট্যাপার হবে। কিন্তু শ্রমিকের সঙ্গে অমলের কী সম্পর্ক? বুঝতে পারলাম না।

সুরেশের গলার স্বরে আমার ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল। সে বলছে, 'চা-টা আনতে পাঠাইছি, এইবার কও—'

অমল বলল, 'আমার কথা পরে শুনবেন। আগে এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—'

সুরেশ চেয়ারের ভেতর নড়েচড়ে বসল, 'হ-হ, নিশ্চয়ই। আগেই এর কথা আমার জিগান (জিজ্ঞেস করা) উচিত ছিল। ছেলেটা কে?'

'আমার মামাতো ভাই। ওর নাম বিলু; ভাল নাম চিরঞ্জীব।'

'বিলুই ভাল। চিরঞ্জীব পোষাইব না।' সুরেশ হাসল।

আমরাও হাসলাম।

অমল বলল, 'কাল ও পাকিস্তান থেকে এসেছে।'

'তাই নাকি?' সুরেশ চকিত হল, তার চোখমুখ ধারাল ছুরির ফলার মত ঝকঝক করতে লাগল।

অমল এবার আমাকে বলল, 'উনি আমাদের সুরেশদা; সুরেশচন্দ্র দাস। এই বাস্তুহারা সঙ্ঘের প্রাণ।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় ফটিক চা মুড়ি-টুড়ি নিয়ে ফিরে এল।

টেবিলে খবরের কাগজ পেতে মুড়ি ঢালল সুরেশ; আলুরচপ-বেগুনি-ফুলুরি একাধারে স্তূপাকার করে রাখল। বলল, 'ফইটকা (ফটিক) রে, সবই তো আনছিলি ভাই, এট্টু ত্যাল পাইলে ষোল কলা পূর্ণ হইত।'

'ত্যাল আনতে আছি। ঐটুকুর লেইগা (জন্য) আর অঙ্গহানি হয় ক্যান?' ফটিক ছুটল।

'যাইতে যখন আছস, কয়টা কাঁচা মরিচও নিয়া আসিস।'

ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে ফটিক জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

সুরেশ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'এট্টু লবণ—'

নুন এল, তেল এল, কাঁচালঙ্কা এল। তরিবত করে মুড়ি মেখে সুরেশ বলল, ব্রাদারেরা শুভ কাজ শুরু কইরা দাও।'

চারদিক থেকে আট-দশটা হাত মুড়ির স্তূপে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফুলুরিতে একটা কামড় বসিয়ে আয়েস করে চিবুতে চিবুতে সুরেশ বলল, 'যাই কও ভাই এমন বাইগনি (বেগুনি) ফুলুরি আলুর বড়া পূর্ববঙ্গে পাইবা না। ত্যালেভাজা কিন্তুক পুরাপুরি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কালচার। এইখানে ইস্ট বেঙ্গলের হাইর (হার), ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিত।'

সবাই হেসে উঠল।

আট-দশটা হাত বার বার হানা দিচ্ছে। তেলেভাজা আর মুড়ির পরমায়ু আর কতক্ষণ ? নিমেষে তা উধাও হয়ে গেল।

চা আগেই এসে গিয়েছিল। গেলাসগুলো ঢেকে রাখা হয়েছে। মুড়ি-তেলেভাজার পর শুরু হল চা-পর্ব।

খেতে খেতে সুরেশ আমার দিকে তাকাল। 'কাইলই তো তুমি পাকিস্তান থিকা আসছ ?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটু চিন্তা করে সুরেশ বলল, 'আমি আসছি নাইনটিন ফরটি এইটে; পার্টিশনের পরের বছর। তা অখন দ্যাশের খবর কী ?'

সংক্ষেপে আমার যেটুকু জানা, বললাম।

সাগ্রহে সব শুনে সুরেশ বলল, 'তোমার তো ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট ?'

'হ্যাঁ।'

'এট্টু আগে যা কইলা সব ডিস্ট্রিক্টেই সেই অবস্থা নাকি ?'

'তাই তো মনে হয়। যে ট্রেনে আমরা কলকাতায় এলাম তাতে সব জায়গার লোকই ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুরেশ। তারপর গভীর বিষণ্ণ সুরে বলল, 'একটা হিন্দুও পাকিস্তানে থাকতে পারব না। আমার কী মনে হয় জানো ?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

'ওরা চায় না একজন হিন্দুও পাকিস্তানে থাকুক ; নট এ সিঙ্গল পার্সন।'

অমল মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'সবাই চায় হিন্দুরা চলে আসুক—এ বোধ হয় ঠিক না।'

বিদ্যুৎ চমকের মত রাজেক কাকার কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমতলি থেকে নারায়ণগঞ্জের স্টীমারঘাটা পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে এসেছিলেন ; চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। আমতলি থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত দীর্ঘপথ তিনি ভাঙা শিথিল বিমর্ষ এবং অস্থির গলায় অবিরাম বলেছেন, 'তোমরাও চললা শ্যাষ পর্যন্ত ; তোমরাও চললা ! এ যে আমি কুনোদিনও

ভাবতে পারি নাই। হা খোদাতাল্লা!'

রাজেক কাকার কণ্ঠস্বর আমার সমস্ত সত্তার ওপর ঘন বিষাদের মত ছড়িয়ে আছে। স্টীমারঘাটার ঐ দৃশ্য আর রাজেক কাকার কণ্ঠস্বর জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছেও আমি বোধ হয় ভুলতে পারব না।

অমলের কথার প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'এমন লোকও আছে হিন্দুরা চলে আসার সময় বুক ফাটিয়ে কাঁদে।'

সুরেশ বলল, 'তারা আর ক'জন? হাজারে দুইটা কি পাঁচটা। তাগো ভরসায় তো আর থাকা যায় না।'

কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। অমলও চুপ করে রইল।

একটু কি ভেবে সুরেশ বলল, 'অইচ্ছা, জোর কইরা কনভার্সনের খবর তো এখানকার খবরের কাগজে প্রায় রোজই দেখি। এর কতখানি সত্য?'

বললাম, 'নিজের চোখে দেখিনি। তবে। নোয়াখালি, ফরিদপুর, কুমিল্লায় কিছু কিছু কনভার্সনের খবর পেয়েছি।'

'আর মাইয়া চুরি—চুরি ক্যান, মাইয়া কাইড়া নিয়া যায় না?'

'তা-ও কিছু কিছু নিচ্ছে। আমাদের গ্রামেই এরকম ঘটনা ঘটেছে।'

সুরেশের চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠল; উত্তেজনায় বিশাল বুক ঘনশ্বসিত। প্রকাণ্ড থাবা দুটো মুঠি পাকিয়ে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'এরই দামে ইণ্ডিয়া স্বাধীন হইছে; পার্টিশান মাইনা নেওয়া হইছে। সেই যে নেতা কইছিল ইণ্ডিয়া উইল নট বী পার্টিশান্‌ড্‌ ইন থাউজ্যাণ্ড ইয়ারস্‌। সে এখন কী কয়?'

সবাই নীরব।

সুরেশ সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, 'আমার কী ইচ্ছা হয় জানো? নেতাদের ধইরা ধইরা পাকিস্তানের গ্রামগুলি ঘুরাইয়া আনি। ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাঙলার মানুষ শ্যাষ হইয়া গেল।'

গলার স্বর চড়তে চড়তে অনেক উঁচুতে উঠে আবেগের তরঙ্গে কাঁপতে লাগল সুরেশের, 'এত বড় একটা জাত—জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায়-সাহসে সারা ইণ্ডিয়ায় যার তুলনা নাই, সেই জাতটা ধ্বংস হইতে বসেছে। এ-ও এক ধরনের জাতি-হত্যা; জেনোসাইড।'

সবাই চুপ। সুরেশের আবেগ উত্তেজনা আমাকে স্পর্শ করেছে, প্রাণের গভীর স্তরে দোলা দিয়ে যাচ্ছে।

সুরেশ একই সুরে বলতে লাগল, 'যারা ইণ্ডিয়ার অ্যাসেট হইতে পারত

তারা শিয়ালদার প্ল্যাটফরমে আর কইলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মরতে বসছে। ম্যান পাওয়ারের এমন অযথা ওয়েস্টেজ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও হইছে কিনা সন্দেহ।'

এবারও কেউ কিছু বলল না। শুধু সুরেশের স্বরের রেশ বিচিত্র প্রতিধ্বনির মত ঘরের বাতাসে কাঁপতে লাগল। আর আমার চোখের ওপর শিয়ালদা স্টেশনের সেই ভয়াবহ ছবিটি ভেসে উঠল। সীমান্তের ওপার থেকে সবে এসেছি; কলকাতার রাস্তাগুলোর খবর আমার জানা নেই। তবে শিয়ালদা স্টেশনের চত্বরে একটা উন্মূল জাতির চূর্ণ-বিচূর্ণ একটি অংশকে আশা হারিয়ে ভবিষ্যৎ হারিয়ে জীবনের সব আলোকিত দিক হারিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। এই মানুষগুলোর জন্য সুরেশের যন্ত্রণা বা আবেগ, উত্তেজনা অথবা তীব্রতা যে আন্তরিক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

একসময় সুরেশ বলে উঠল, 'যাউক গিয়া ঐসব; ইস্টবেঙ্গলের কথা ভাবলেই আমার মাথা খারাপ হইয়া যায়।'

কে একজন সায় দিল, 'সবারই যায়; তোমার একলার হইব ক্যান সুরেশদা—'

সুরেশ এবার আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'পাকিস্তান থিকা একলাই আসছ, না পুরা ফ্যামিলি আসছে?'

বললাম, 'আমি একাই এসেছি।'

'হ্যাশে আর কে কে আছে?'

'বাবা, মা আর একটা ছোট বোন।'

'তারা আসবো না?'

'আসবে। তবে—'

'কী?'

খানিক ইতস্তত করে জানালাম, 'একটা চাকরি-বাকরি না জুটলে তাদের আনা সম্ভব না।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সুরেশ বলল, 'সে তো ঠিকই। তা চাকরির ফিকির-টিকির দেখতে আছ?'

'সবে তো কাল এলাম। আজ থেকে চেষ্টা করব ভাবছি। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানকার কিছুই জানি না, কারোকে চিনি না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুরেশ অমলের দিকে তাকাল, 'চিরঞ্জীবের

চাকরির লেইগা আর ভাবনা কি। তোমার বাবা একবার কইয়া দিলেই তো হয়।'

অমলের মুখ নিমেষে মলিন হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা ইচ্ছা করলে হতে পারে হয়ত, কিন্তু বাবা কারো জন্যে কিছু বলেন না। অন্য কেউ তো দূরের কথা, আমাদের জন্যেও পর্যন্ত চেষ্টা করেননি। বাবা মনে করেন, সবারই নিজের নিজের ক্ষমতায় চাকরি-বাকরি যোগাড় করে নেওয়া উচিত।'

'অর্থাৎ সকলে স্বাবলম্বী হউক; এই তিনি চান। কিন্তু ব্রাদার, দিন কাল যা পড়ছে তাতে মামা-টামা না থাকলে চাকরি জোটে না।' সুরেশ হাসল।

অমল যা বলছে তা ঠিক। কালই পিসেমশাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের চেষ্টায় আমাকে সব কিছু করতে হবে। চাকরির ব্যাপারে তিনি আমাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুরেশ আমাকে বলল, 'এক কাম কর ভাই—'

'কী?' আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

'খবরের কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেইখা দরখাস্ত ছাড়তে থাকো। আর ডালহৌসিতে গিয়া অফিসে অফিসে হানা দাও। রিফিউজী হইলে চাকরি-বাকরি পাইতে সুবিধা হয়।' বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল সুরেশের। উৎসুক স্বরে বলল, 'ভাল কথা—'

আমি তাকিয়েই আছি।

সুরেশ বলতে লাগল, 'চাকরি-বাকরির দরকার কি তোমার? এক কাম কর না—'

'কী কাজ?'

'তুমি ত তো কাইল আসছ; বর্ডার স্লিপ নিশ্চয়ই আছে?'

চকিতে মনে পড়ে গেল কাল সীমান্তে আমার নাম উদ্বাস্তুদের তালিকায় উঠেছিল। আমি যে দেশের মাটি থেকে উন্মূল হয়ে এসেছি তার প্রমাণস্বরূপ একটা ছাপানো ফরমে আমার পরিচয় লিখে দেওয়া হয়েছিল।

বললাম, 'আছে।'

'তা হইলে আর কি; ঐটা নিয়া অকল্যাণ্ডে চইলা যাও—'

'অকল্যাণ্ড—অকল্যাণ্ড কী?'

'একটা অফিস। ঐখানে রিফিউজী বিজনেস লোন, হাউস লোন—সব দিয়া থাকে। 'বর্ডার স্লিপ' দেখাইলে ঐখানে ফরম পাইবা। হাজার কয়েক

টাকার একটা বিজনেস লোন নিয়া নাও।'

'কিন্তু লোন যে নেব, শোধ দেব কী করে?'

সুরেশ বলল, 'শোধ দিতে হইব বিশ বছর পর, আগে তো নিয়া নাও। ধর বিশ বছরের ভিতর তোমার বিজনেস উইঠা গেল কি তুমি মইরাই গেলা; তখন কে আর ঐ টাকা শোধ দিব? তা ছাড়া ভিটামাটি থিকা উচ্ছেদ হইয়া আসছ, তার দাম দ্যায় কে? ঐ কয়টা টাকার লেইগা গভর্নমেণ্ট তোমারে আর ফাঁসিকাঠে ঝুলাইব না।'

সুরেশের কথাগুলো আমার ভাল লাগল না। মনের ভেতর খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে দ্বিধান্বিত স্বরে বললাম, 'কিন্তু—'

'আবার কী হইল?'

'বর্ডার স্লিপ দেখেই আমাকে বিজনেস লোন দিয়ে দেবে?'

'তুমি একটা দরখাস্ত করই না; তারপর যা ব্যবস্থা দরকার আমি কইরা দিমু। আইজই তুমি অকল্যাণ্ড চইলা যাও। হ, আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'তোমার বাবা-মা সগলেই তো দ্যাশ থিকা চইলা আসবেন?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে আইসা থাকতে তো হইব কোথাও।'

'তা তো হবেই।'

একটু ভেবে সুরেশ বলল, 'আইচ্ছা, তোমাগো জমি-জমা নিশ্চয়ই আছে—'

'আছে বৈকি।' আমি বললাম, 'জমি-বাগান-পুকুর—'

'জমি কত আছে?'

'পঞ্চাশ কানির মত।'

'কানি মানে বিঘা তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর বাগান?'

'তা-ও ছয়-সাত কানি।'

'বাড়ি কি পাকা?'

'ভিত আর দেয়াল পাকা; ওপরে টিন। কিন্তু—', বলে থেমে গেলাম।

আমার বক্তব্যের ভেতর যে অনুচ্চারিত প্রশ্নটা রয়েছে তা বুঝতে পারল সুরেশ। বলল, 'আমি ক্যান এত খোঁজ-খবর নিতে আছি তাই জানতে চাও তো?'

'হ্যাঁ।'

'ধর যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঐ রকম জমি-বাড়ি পাও বদলাইয়া নিবা?'

সুরেশ কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম।

সুরেশ বলল, 'বুঝতে পারলা না? বেশ বুঝাইয়া দিতে আছি। হিন্দুরা যেমন পাকিস্তান ছাইড়া চইলা আসতে আছে, তেমন কিছু কিছু মুসলমানও ইণ্ডিয়া ছাইড়া বর্ডারের ওপারে যাইতে আছে। অনেকে ওপারের লগে জমি-জমা অদল-বদল কইরা নিতে চায়।'

আমি উদ্‌গ্রীব হলাম। জন্মভূমি ছেড়ে আসার জন্য আমরা তো পা বাড়িয়েই আছি। পূর্বপুরুষের জমিজমা ঘর-ভদ্রাসনের বদলে এপারে যদি একটু ভূমি মেলে আমরা নতুন করে বাঁচতে পারব। সেখানে দাঁড়িয়ে উন্মূল জীবনকে নতুন গৌরবে পল্লবিত করার স্বপ্নও অন্তত দেখতে পারব। সব-হারানোর ক্ষতি অনেকখানিই তাতে পূরণ হয়ে যাবে মনে হয়।

উদগ্রীবই শুধু না, আশান্বিতও হয়ে উঠলাম। কলকাতায় আসার পর নিরেট দেয়ালের মত চারদিক থেকে সীমাহীন অনিশ্চিয়তা যেন আমাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল। অনিশ্চয়তা আর হতাশা। হতাশা এবং দুশ্চিন্তা। দেয়ালটার কোন্ প্রান্তে বেরুবার পথ লুকিয়ে আছে, বুঝতে পারছিলাম না।

সুরেশের কথায় মনে হল, এতক্ষণে সরু সুতোর মত ক্ষীণ আলোর একটি রেখা আমার চোখে পড়েছে।

সাগ্রহে বললাম, 'যারা জমি-জমা বদলাতে চায় তাদের কারোকে আপনি চেনেন?'

'দু-একজনেরে চিনি।' সুরেশ বলল, 'ক্যান, বদল করবা নাকি?'

'বাবাকে চিঠি লিখব। যদি রাজী থাকেন, আপনাকে জানাব।'

'বেশ।'

এদিকে অমল হঠাৎ বেলা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে, 'এই, ক'টা বাজল? ফটিক ঘড়িটা দেখে এসো তো।'

ঘড়ি দেখে ফটিক এসে জানাল, 'এগারোটা বাইশ—'

অমল লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, 'আরে সর্বনাশ, এগারোটার সময় এক জায়গায় যাবার কথা ছিল আমার।' আমার দিকে তাকিয়ে তাড়া লাগাল, 'ওঠ—ওঠ, তুমি তো আবার পোস্ট অফিসে যাবে।'

'হ্যাঁ।' আমিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

অমলের পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এলাম। সুরেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি,

এরই ভিতর চললা যে! আসল কথাই তো কিছু হইল না।'

মুখ ফিরিয়ে অমল বলল, 'আসল কথা আব র কী।

'আমার এই বাস্তুহারা সঙ্ঘ সম্পর্কে চিরঞ্জীবরে তো কিছুই বলা হইল না। তোমরা আসলা, বসলা, হ্যাচ-প্যাচ কত কথা হইল কিন্তু বাস্তুহারা সঙ্ঘে বইসা বাস্তাহারা সঙ্ঘের কথাই বাদ রইল।'

অমল বলল, 'আমি ওকে বলে দেব'খন।'

'দিও কিন্তু—', সুরেশ বলতে লাগল, 'চিরঞ্জীবরে নিয়া আবার আইসো।'

'আসব।'

পোস্ট অফিসের দিকে যেতে যেতে সুরেশ এবং তার বাস্তুহারা সঙ্ঘ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই আমাকে জানিয়ে দিল অমল।

সুরেশের পুরো নাম সুরেশ্বর দাস। আদি ঠিকানা ফরিদপুর জেলার সুদূর অভ্যন্তরে কি একটা গ্রামে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তার বাড়ি-ঘড় পুড়েছে; বাপ-মা-ভাই সবাই মরেছে। একটি অবিবাহিতা যুবতী বোন ছিল; আদিম শ্বাপদদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাকে নিয়ে পানের 'বরজে' পালিয়েছিল সুরেশ। সেখানে বসে ঘর-বাড়ি জ্বলতে দেখেছিল; বাপ-মা ভাইদের মৃত্যুকরুণ অন্তিম চিৎকার শুনেছিল।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে সুরেশের মনে হযেছিল; চোখের তারা দুটো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। শিরা-উপশিরাগুলো কষে-বাঁধা ইস্পাতের তারের মত হযে উঠেছিল। বাপ-মা-ভাইয়ের চিৎকারগুলি ধারালো ফলার মত হৃৎপিণ্ডে বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল।

সুরেশের ইচ্ছা হয়েছিল একটা সড়কি হাতে শ্বাপদগুলোর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরক্ষণেই ছোট বোনটার কথা তার মনে পড়ে যায়। বোনটা সেদিন যেন দুই পায়ে শেকল দিয়ে পেছন দিকে টেনে রেখেছিল; হত্যা আর আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেয়নি।

সভ্যতার সমস্ত উত্তরাধিকার আর বিবর্তন অগ্রাহ্য করে ছেচল্লিশের সেই দিনগুলো বর্বর যুগের অন্ধকারে ফিরে গিয়েছিল। দাঙ্গা যে ক'দিন চলেছিল সে ক'টা দিন আর পানের 'বরজ' থেকে বেরোয়নি সুরেশরা।

রক্তস্রোত এবং আগুনের শিখা স্তিমিত হয়ে এলে সুরেশরা বেরিয়ে এসে দেখেছিল বাড়িঘরের চিহ্ন নেই, রাশি রাশি ছাইয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। বাপ-মা-ভাইয়ের মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। শিয়াল আর কুকুরদের দাঁতে দাঁতে আর শকুনের ঠোঁটে ঠোঁটে সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃতদেহের

সামান্ত একটু অংশ সংগ্রহ করে যে শেষকৃত্যটুকু করবে সে সুযোগ পায়নি সুরেশ।

যাই হোক, ভস্মস্তূপের ওপর নতুন করে আবার ঘর বেঁধে নিয়েছিল সুরেশ। প্রিয়জনের মৃত্যুতে জীবনটা প্রথম কিছুদিন অসাড় অবোধ জড়পিণ্ডের মত হয়ে গিয়েছিল। বোনটা দিন-রাত কাঁদত, সুরেশ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলত। কী সান্ত্বনাই বা দেবে? মানুষের জীবনে মৃত্যু হচ্ছে এমন পরিণতি যা রোধ করা যায় না। কিন্তু যেভাবে মা-বাবার জীবনে মৃত্যু এসেছে সেটা তো আর অনিবার্য ছিল না।

সুরেশ কেঁদেছে যেমন, অসহায় অক্ষম রাগে তেমনি ফুলে ফুলে উঠেছে। প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না। কিন্তু প্রতিশোধ নেবেই বা কিভাবে?

যে জীবনকে বিস্বাদ বিবর্ণ স্তব্ধ নিশ্চল মনে হয়েছিল ধীরে ধীরে তাতে বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। শোক যতই তীব্র হোক, বেদনা যতই প্রবল হোক, জীবনের রথ তার ওপর দিয়ে আপন মহিমায় চলে যায়ই। সেদিক থেকে সুরেশের জীবনও থমকে থাকেনি; ধীরে ধীরে হলেও চলতে শুরু করেছিল।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার এক বছরের মধ্যেই এই দেশভাগ--স্বাধীনতা।

তারপরও একটা বছর দেশের মাটিতেই পড়ে ছিল সুরেশ। বি.এ. পর্যন্ত পড়েছে সে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার আগে পর্যন্ত তার জীবন ছিল মোটামুটি শান্ত, তরঙ্গহীন। অবস্থা ছিল রীতিমত সচ্ছল। জমি-জমা, ধান, পাট, মুগ-মুসুর ইত্যাদি থেকে যা আয় হত তাকে প্রাচুর্যই বলা যেতে পারে। তা ছাড়া বাবার ছিল তেজারতি কারবার। কাজেই সুরেশ কিছুই করত না। তাস-পাশা, আড্ডা, নাটক—এই বৃত্তের ভেতরেই ছিল তার জীবনের রূপরেখা।

এই শতাব্দীর উষাকাল থেকে এ দেশ রাজনীতির আগুনে উত্তপ্ত হয়ে আছে। এর বাতাসে আগুন, মাটিতে আগুন, এর সমস্ত আবহাওয়া জ্বলন্ত।

এই আগুনের মাঝখানে জন্মেও রাজনীতির সঙ্গে সুরেশের সংযোগ ছিল না। রাজনীতি সম্বন্ধে তার যে বিরূপতা ছিল তা নয়। তবে উত্তাপ বা উত্তেজনা কিছুই পছন্দ করত না সুরেশ। টগবগ ফুটন্ত কিছুর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। জীবনের জুড়নো অংশটিকে আয়েশ করে তারিয়ে তারিয়ে চাখবার ভেতরেই ছিল তার যত আনন্দ।

রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও সে ব্যাপারে সুরেশ একেবারে উদাসীন ছিল না। রাজনীতির যত ঝড়, রাজ্য ভাঙার রাজ্য গড়ার যত খেলা

দূর থেকে কৌতূহলী দর্শকের মত সে লক্ষ্য করে গেছে।

দ্বিজাতি-তত্ত্বের বলি হয়ে দেশ যখন দু-খণ্ড হল তখন অনেকেই ভেবেছিল সব যুদ্ধ আর রক্তপাতের বুঝি অবসান ঘটল। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সন্দেহ আর থাকবে না। দেশভাগের জন্য যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তাদের দাবী তো মিটেছে। ব্যক্তিগত নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেলেও সুরেশের মনে হয়েছিল এবার তারা শান্তিতে থাকতে পারবে। বাপ-মা-ভাইয়ের ঘন রক্তে দ্বিজাতি বিদ্বেষের আগুন চিরকালের জন্য নিভে যাবে।

কিন্তু ধারণাটা যে কতখানি ভ্রান্ত তা দেশ ভাগের পরমুহূর্তেই বোঝা গেল। স্বাধীনতার প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কাটতে না কাটতেই পূর্ব বাংলার এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে আবার আগুন লাগল; ছুরির ফলায় আবার মৃত্যু ঝিলিক দিল। দীর্ঘকাল ধরে বিদ্বেষের যে দৈত্য দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল তাকে বোতলে পুরে ফেলা যায় নি। দেশভাগের ছুরি শুধু মাটিতেই বসে নি, জাতির সত্তার ভেতর আমূল ঢুকে গেছে।

স্বাধীনতার এক বছর পর দ্বিতীয়বার যখন ঘরে আগুন লাগল, সুরেশ বুঝল, দেশে আর থাকা যাবে না। নলঘাসের বনের ভেতর বোনকে নিয়ে দিন সাতেক লুকিয়ে থাকার পর রাতের অন্ধকারে একেবারে এক কাপড়ে বর্ডার পেরিয়ে ভারতবর্ষে চলে এসেছে সুরেশ।

বর্ডার থেকে কলকাতা।

শহরতলীর এই প্রান্ত অর্থাৎ যাদবপুর অঞ্চলটা তখন ছিল হোগলা আর শরবনে ভরা। যেদিকেই চোখ ফেরানো যেত শুধু জলাভূমি আর মাঠ।

সুরেশরাই প্রথম এই জনশূন্য প্রান্তরের দখল নিতে এসেছিল। রাতারাতি এখানে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ গড়ে উঠল। জীবন এসে নির্জন বনপ্রান্তর ঢেউয়ের দোলায় দুলিয়ে দিল।

এই যাদবপুর-গড়িয়া অঞ্চলে উপনিবেশ পত্তন সহজ ছিল না। এখানকার জনশূন্য জলা এবং বনভূমি বেওয়ারিশ নয়—কলোনী তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এর মালিকরা বেরিয়ে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে গুণ্ডা লেলিয়ে কতবার যে উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, হিসেব নেই। এখনও অতর্কিতে তারা হানা দেয়। অবশ্য হানাদারদের রুখবার জন্য কলোনীগুলোও সর্বক্ষণ প্রস্তুত। স্নায়ু সজাগ করে সারাদিন সারারাত তারা বসে আছে।

(আজ সকালেই একটা জবর-দখল কলোনীতে গিয়ে হানাদারদের আক্রমণ আর তার প্রতিরোধের কথা শুনে এসেছি।)

এখানে উপনিবেশ গড়ার সেই শুরু থেকেই সুরেশ নেতা। পূর্ব বাঙলার সুদূর অভ্যন্তরে ফরিদপুর জেলার অখ্যাত গ্রামটিতে থাকতে সে ছিল রাজনীতির নানা খেলার নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। এখানে এসে রাজনীতির ভেতর পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। বাস্তুহারা সঙ্ঘ তৈরী করেছে।

বাস্তুহারাদের নিযে যে সমিতি সুরেশ গড়ে তুলেছে তার পেছনে রয়েছে মহৎ প্রেরণা। উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ নিয়ে প্রায়ই সে মন্ত্রী-মহলে ছোটাছুটি করে। প্রায়ই দাবী পূরণের জন্য মিছিল নিয়ে যায় শহরে। এ অঞ্চলে সুরেশকে না চেনে এমন মানুষ নেই।

সুরেশের কথা শুনতে শুনতে আমরা পোস্ট-অফিসের কাছে এসে পড়লাম। এখানকার কাজ সারতে মিনিট পনেরর মত লাগল। তারপর অমল বলল, 'তুমি বাড়ি চলে যাও।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি যাবে না?'

'না, আমাকে একটু চাকুরিয়ায় যেতে হবে।'

'ফিরবে কখন?'

'তার কি কিছু ঠিক আছে। বিকেলও হতে পারে, সন্ধ্যেও হতে পারে, আবার মাঝরাতও হতে পারে।'

'খাওয়া-দাওয়া?'

'সে একটা কিছু জুটবেই।' অমল হাসল।

অবাক হয়ে এই বিচিত্র বোহেমিয়ান ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। অমল আমার মনোভাব বোধ হয় বুঝল। পিঠে আস্তে একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'এ রকম অনিয়মের অভ্যাস আমার আছে। সবে তো এসেছ; ক'দিন থাকলেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, সেই জেণ্টলম্যানস্ এগ্রিমেণ্টটা মনে আছে?'

'কোন্‌টা?'

'যদি রাত বেশি হয়ে যায়—'

'দরজা খুলে দিতে হবে তো? মনে আছে।'

অমল বলল, 'তুমি দু'দিনেই আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছ ডার্লিং।' হাসতে হাসতে সে চলে গেল।

সাত

অমল ঢাকুরিয়ার দিকে চলে গেল, আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

সুরেশ আমার হাতে দুটো সূত্র তুলে দিয়েছে। প্রথমত, চাকরির জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা। দ্বিতীয়ত, জমি বাড়ি অথবা লোনের জন্য অকল্যাণ্ডে একটা দরখাস্ত করে আসা।

কলকাতায় আসার আগে ভূগোলের যে প্রান্তে আমি থেকেছি তার সঙ্গে খবরের কাগজের সংযোগ একরকম ছিলই না। পূর্ব বাঙলার রাজধানী ঢাকা শহর আমতলি থেকে কতদূরেই বা। স্টীমারে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র। মাইল বা ঘণ্টার মাপে যে দূরত্ব, ঢাকা ছিল তার চাইতেও অনেক—অনেক দূরে; আমতলি নামে একটি অখ্যাত নিস্তরঙ্গ কৃষাণ গ্রামের নাগালের বাইরে। সকালবেলার কাগজখানা বাসি হয়ে যখন আমতলি পৌঁছত পৃথিবীর বয়েস তখন চোদ্দ ঘণ্টার মত বেড়ে গেছে।

পৃথিবীর দিগদিগন্ত জুড়ে যে ফেনায়িত কলরব, প্রতি মুহূর্তে জীবনকে ঘিরে যে ঘূর্ণাবর্ত, যে চমক, যে নাটক—তার সম্বন্ধে আমরা ছিলাম উদাসীন। খবরের কাগজ আমার কাছে উচ্চকণ্ঠ প্রবল প্রলাপের মত মনে হত। মনে হত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সারা পৃথিবীর খবর শুনিয়ে মানুষের শান্তি নষ্ট করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই।

আমতলি তার অসীম অপার স্নিগ্ধতা দিয়ে আমার ভিত এমন করে গড়ে দিয়েছিল যে জগতের ছোট বড় কোন ব্যাপারেই কৌতূহল বোধ করতাম না। খবরের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখতাম ঠিকই, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার সাধ্য ছিল না আমাকে চমকিত, চমৎকৃত অথবা আচ্ছন্ন করতে পারে।

কিন্তু এবার থেকে খবরের কাগজখানা আমাকে দেখতেই হবে। সবটা না দেখি, চাকরির বিজ্ঞাপন যে পৃষ্ঠায় থাকে সেটাকেই যে জপমালা করতে হবে সন্দেহ কি। আজ রাত থেকেই তার মহড়া শুরু করব। তার আগে একবার অকল্যাণ্ড গিয়ে দেখা যাক।

অকল্যাণ্ড কোথায়, এই শহরের কোন্ প্রান্তে আমার জানা নেই। সেজন্য দুর্ভাবনা বোধ করছি না। অনেক অজানা আর দুর্গমকে মাড়িয়ে যেতে হবে বলেই তো শরণার্থী স্পেশালে পাড়ি দিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে বেরুতে যাব, মঙ্গল এসে বলল, 'বড়বাবু আপনাকে ডেকেছেন।'

বড়বাবু অর্থে পিসেমশাই। দোতলায় তাঁর ঘরে আসতেই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, 'কোথাও বেরুচ্ছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়লাম।

'কোথায় ?'

কোথায় যাচ্ছি, জানালাম। কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, তা-ও।

শুনে এ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করলেন না পিসেমশাই। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন ফিরবে ?'

অকল্যাণ্ড কত দূর আমার জানা নেই। যে অফিসই হোক, আমার ধারণা বিকেল পাঁচটার বেশি নিশ্চয়ই কাজকর্ম চালু থাকে না। জায়গাটা যখন এই শহরেই তখন যাতায়াতে কতক্ষণ আর লাগা উচিত। অনেকখানি সময় হাতে রেখে বললাম, 'সন্ধ্যের ভেতরেই ফিরে আসব।'

'তুমি দেখছি আমার ছেলেদের মত কথা বলছ।'

বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

পিসেমশাই আমার কথা বোধ হয় শুনতে পান নি। আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'আগে আগে ওদের যখন জিজ্ঞেস করতাম, কখন ফিরবে, তিনজনের মুখেই এক জবাব। বলত, এই কিছুক্ষণ বাদে। ঐ সন্ধ্যের ভেতর-টেতর বুঝি না। ঠিক সময় বল। ছ'টা না সাতটা না আটটা ?'

'আজ্ঞে সাতটা।'

'সাতটা তো ?'

যেভাবেই হোক আর অকল্যাণ্ড যে প্রান্তেই থাক, সাতটার ভেতর যেমন করে পারি ফিরতেই হবে ; বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পিসেমশাই বললেন, 'তোমার কথামত ঐ সাতটার সময়েই কিন্তু হিরণ্ময়কে আসতে বলব।'

'হিরণ্ময় কে ?'

'তখনই জানতে পারবে।'

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে সাহস হল না। পিসেমশাইও আর কিছু বললেন না। আমি পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম।

আট

জিজ্ঞেস করে করে যখন অকল্যাণ্ডে পৌঁছলাম, শীত-বিকেলের রোদে বিষাদের ছোঁয়া লেগে গেছে। পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে সূর্যটা নেমে গেছে অনেকখানি। সাঁই সাঁই উত্তুরে বাতাস এই শহরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

এত বড় শহর আগে আর কখনও দেখিনি। আমতলি নামে এক ঘুমন্ত কুহকের দেশে বসে ভারতবর্ষের এই বিশালতম নগরী সম্বন্ধে হাজারো কিংবদন্তী শুনেছি ; ঐ শোনাই।

যাদবপুর থেকে অকল্যাণ্ড পর্যন্ত দু-ধারে কলকাতা অসংখ্য বিস্ময় ছড়িয়ে রেখেছে। তার বিপুলায়তন প্রাসাদের মেলায় উল্কাগতি গাড়ির মিছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত—সব কিছুকে কেউ যেন অস্থির উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

এখানকার মানুষ বোধ হয় নিঃশব্দে শান্তভাবে বাঁচতে পারে না ; চায়ও না হয়তো। কারো অমোঘ অঙ্গুলি-সংকেতে হৈ-চৈ বাধিয়ে চারদিকে আলোড়ন তুলে দুর্বার বেগে শুধু ভেসে চলেছে।

চারপাশের বিস্ময় আমার ওপর তেমন রেখাপাত করতে পারেনি। একটি মাত্র ভাবনাই আমার সমস্ত সত্তাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। চাকরি—একটা চাকরি আমাকে যে ভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে। সুদূর আমতলি থেকে কলকাতার দিকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাটা আমার পিছু নিয়েছে। রিফিউজি স্পেশ্যালে মানুষের পিণ্ডের ভেতর নিজেকে গুঁজে দিয়ে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে পাড়ি দিয়েছি। এখানে এসে চলছি, ফিরছি, উঠছি, বসছি—ভাবনাটা কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়েনি। বরং প্রতি মুহূর্তে চারদিক থেকে সেটা ক্রমশ ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

অকল্যাণ্ডে পা দিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। প্রথমটা মনে হল, কাকের মেলায় এসে পড়েছি, নাকি ভনভনে মাছিদের আসরে ? দুটো উপমাই যোগ্য মনে হল।

একটা অফিস বাড়ি ঘিরে অসংখ্য মানুষ কিলবিল করছে। ছোটাছুটি ব্যস্ততা এবং চেঁচামেচিতে জায়গাটা সরগরম। অফিসের সামনের দিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে গাছতলায়, পাঁচিলের ধারে নানারকম

ছাপানো ফরম্ নিয়ে কয়েকটি লোক বসে আছে ; তাদের ঘিরেও অগণিত মানুষের জটলা।

চারদিকের বিচিত্র ভনভনানির ভেতর কার কাছে গিয়ে লোনের জন্য হাত পাতব, বুঝে উঠতে পারছি না। বিমূঢ়ের মত একধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। নির্বিঘ্নে দাঁড়িয়ে থাকার কি উপায় আছে ? আমাকে ধাক্কা দিয়ে গুঁতো মেরে মানুষের ঢল ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে বয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হল, কে যেন আমাকে ডাকছে। এই অচেনা জায়গায় কে আমাকে ডাকতে পারে ? আমাকেই যে ডাকছে তার নিশ্চয়তা কী ? এক নামের কত মানুষই তো থাকতে পারে।

তবু চকিত হয়ে এদিক সেদিক তাকাতেই চোখে পড়ল। ট্রেনের সেই ভদ্রলোক—শিশির মুখুটি যাঁর নাম—অফিস-বাড়ির ভেতর থেকে লম্বা লম্বা পায়ে আমার দিকেই আসছেন। ভদ্রলোককে এখানে প্রত্যাশা করিনি। যত স্বল্প-পরিচিতই হোক, একটি চেনা মানুষকে পেয়ে আরাম বোধ করলাম।

কাছে এসে শিশির মুখুটি বললেন, 'আপনার সঙ্গে আজকেই যে দেখা হয়ে যাবে, ভাবিনি।'

হেসে বললাম, 'আমিও।'

বর্ডার থেকে আসতে আসতে শিশির মুখুটিকে ঘিরে যে বিষাদ দেখেছিলাম, এখনও তা তেমনই অনড় হয়ে আছে। তবে দাড়িটাড়ি কামিয়েছেন ; সেই উদভ্রান্ত বিহ্বল ভাব খানিকটা কেটেছে বলে মনে হল। ট্রেন আর স্টীমারের সেই দলিত নোংরা জামাকাপড়ও বদলেছেন।

আত্মীয়স্বজনদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, খানিক নিরুদ্বেগে ঘুমোতে পেরেছেন। ঘুম-বিশ্রাম-নিরাপত্তা তাঁর রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতার কিছু অংশ মুছিয়ে দিতে পেরেছে।

শিশির মুখুটি বললেন, 'ট্রেনে আপনি যা করেছিলেন—'

নাঃ, ভদ্রলোক দেখছি সেই সামান্য উপকারটুকুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। সঙ্কোচের সুরে বললাম, 'ঐ কথা বার বার বলে আমাকে বিব্রত করা কি ঠিক ?'

শিশির মুখুটি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যখন বিব্রত হন তখন আর বলব না। অফিস ঘর থেকে অনেকক্ষণ দেখছি, আপনি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারিনি, আপনি। তারপর অকল্যাণে কী মনে করে ?'

বললাম, 'এক ভদ্রলোকের কাছে খবর পেয়েছি, এখানে দরখাস্ত-টরখাস্ত করলে বিজনেস আর হাউস লোন পাওয়া যায়। তাই—'

'বুঝেছি। আমিও সেইজন্যেই এসেছি। কিছু লোন-টোন পেলে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করব। ভায়রার বাড়ি এসে উঠেছি। চিরকাল তো আর তার কাঁধে চেপে থাকা যায় না, থাকা উচিতও নয়। না কী বলেন?'

কালই জেনেছি শিশির মুখুটি সপরিবারে তাঁর ভায়রার বাসায় উঠবেন। শিয়ালদায় পৌঁছবার পর ভায়রা ভদ্রলোক তাঁদের নিতেও এসেছিলেন। স্টেশন থেকে বিদায় নেবার সময় বাগবাজারের একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন শিশির মুখুটি; সেটা তাঁর ভায়রারই বাসা। শিশিরকে সায় দিয়ে বললাম, 'তা তো বটেই।'

শিশির মুখুটি বললেন, 'ভায়রা তো আর লক্ষপতি কোটিপতি নয়; নেহাতই ছাপোষা কেরানী। বেশিদিন তার ঘাড়ে ছেলেপুলে নিয়ে পড়ে থাকলে লোকটা মারা পড়ে যাবে। নিজের সংসারটা চালাবার মত একটা ব্যবস্থা আমাকে শীগগিরই করে নিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

শিশির মুখুটি বললেন, 'যাক গে, তা দরখাস্তের ফর্‌ম্‌-টর্‌ম্‌ নিয়েছেন?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়লাম, 'কার কাছে পাওয়া যায়, বুঝতে পারছি না।'

'সেই জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন?'

অস্ফুটে বললাম, 'তা এক রকম বলতে পারেন। এমন জায়গায় কোন দিন আসতে হবে, ভাবিনি। একটু দেখে নিয়ে ফর্‌ম্‌-টর্‌মের খোঁজ করব, ভেবেছিলাম।'

বিষণ্ণ স্বরে দূরমনস্কের মত শিশির মুখুটি বললেন, 'যা বলেছেন। দেশ ভিটে মাটি ছেড়ে কোন দিন যে ভিক্ষের জন্যে হাত পাততে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল।'

উত্তর দিলাম না। আমাদের ঘিরে বিচিত্র এক বিষাদ ঘন হতে লাগল।

একটু পর শিশির মুখুটিই নীরবতা ভাঙলেন, 'বর্ডার স্লিপ এনেছেন? ওটা না হলে কিন্তু লোনের ফর্‌ম্‌ যে পাবেন না।'

বর্ডার স্লিপ না দেখালে লোনের ফর্‌ম্‌ যে পাওয়া যাবে না, সে কথা সুরেশ আমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে সেটাই আমাদের শেষ পারানির কড়ি. সেই নিধি পকেটে পুরে তবেই না অকল্যাণে পাড়ি দিয়েছি। বললাম, 'এনেছি।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

শিশির মুখুটির পিছু পিছু অফিস-বাড়ির ভেতর একটা খুপরিতে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে একটি কেরানী ফর্মের স্তূপ নিয়ে বসে আছে। আমার বর্ডার স্লিপটা দেখিয়ে তার কাছ থেকে একটা বিজনেস লোন আর একটা হাউস লোনের ফর্ম্ আদায় করলেন শিশির মুখুটি। তারপর বললেন, 'চলুন।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসে শিশির মুখুটি বললেন, 'ফর্মটা ফিল আপ করে এখানে জমা দিয়ে যাবেন।'

'আচ্ছা।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর শিশির মুখুটি বললেন, 'এখন আপনার কোন কাজ আছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে চলুন হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত যাই।'

ধর্মতলা নামটা আমার জানা। খানিক আগে যাদবপুর থেকে আমি ওখানে এসেই নেমেছি। তারপর জিজ্ঞেস করতে করতে অকল্যাণ্ডে পৌঁছেছি।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলাম। দক্ষিণে সবুজ কার্পেটে ঢাকা সুবিস্তৃত ময়দান ; শিশির মুখুটি জানালেন ওটা গড়ের মাঠ। উত্তর দিকে বিশাল কম্পাউণ্ডওলা প্রাসাদ দেখিয়ে বললেন, গভর্নরস্ হাউস। বুঝলাম কলকাতার সঙ্গে তাঁর ভালই পরিচয় আছে। রিফিউজি স্পেশালের কামরায় বসে কথায় কথায় কাল শিশির মুখুটি জানিয়েছিলেন, এ শহরে তিনি আরো অনেকবার এসেছেন।

কাল পরশু এবং তার আগের দিন অকালের মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন ছিল। তিনটে দিন ভারাক্রান্ত বিষাদমলিন হয়ে থাকার পর শীতকালটা আবার তার আপন মহিমা ফিরে পেয়েছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, দিগন্তের কোন্‌খানেই মেঘের চিহ্ন নেই। রোদটা অবশ্য অনুজ্জ্বল, স্তিমিত, বিবর্ণ। উত্তুরে হাওয়ারও বেশ জোর। তবু হাঁটতে মোটামুটি ভালই লাগছে।

হঠাৎ শিশির মুখুটির স্ত্রীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। আগেই পড়া উচিত ছিল। বললাম, 'উনি কেমন আছেন ?'

'কার কথা বলছ ?' বলেই জিভ কাটলেন শিশির মুখুটি, 'তুমি বলে ফেলেছি ; কিছু মনে করবেন না।'

একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সমানে আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলে যাচ্ছেন ;

আমি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম না। আপত্তি যে করব, আমার খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'তুমিই তো বলবেন; আপনি আমার প্রায় বাবার বয়সী।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। হ্যাঁ, কার কথা যেন জিজ্ঞেস করছিলে?'

'আপনার স্ত্রীর।'

শিশির মুখুটিকে ঘিরে গভীর বেদনা অনড় হয়ে আছে। নিমেষে সেটা যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠল। অর্ধস্ফুট বিমর্ষ গলায় বললেন, 'ঐ একই রকম; তবে অজ্ঞানটা আর হয়নি। তবে সারাদিন খুব কাঁদছে। খেতে, চান করতে চাই-ছিল না। ওর বোন মানে আমার শালী জোর করে খাইয়েছে, চান করিয়েছে। কপালে যে কী আছে, ভগবান জানে।'

পরশু দিন ইস্টবেঙ্গল মেলের কামরায় স্ত্রীর ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাবার কারণটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বলতে শুরু করেছিলেন শিশির মুখুটি। কিন্তু সেই মেয়েটি—চোখে মুখে যার দীঘল টান, নাম যার মালতী—তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে ডেকে উঠেছিল, 'বাবা!' ঐ ডাকটার ভেতর অনুচ্চরিত নিষেধ ছিল, শিশির মুখুটি থমকে গিয়েছিলেন।

অশোভন জেনেও কৌতুহলটাকে আজ আর গোপন রাখতে পারলাম না। বললাম, 'উনি ঐ রকম অজ্ঞান হয়ে যান কেন? কিছু অসুখ-টসুখ—'

'না—না—,' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন শিশির মুখুটি। তারপর নিজের কপালে একটা আঙুল রেখে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ না; আমার অদৃষ্ট—', তাঁর বুকের গভীর স্তর ঠেলে ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আমি চুপ করে থাকলাম।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর শিশির মুখুটি ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন, 'তোমাকে কি বলেছি, আমি পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে জানালাম, 'আপনি চাঁদপুরে পোস্টমাস্টার ছিলেন।'

আমার কথা বোধ হয় শুনতে পেলেন না শিশির মুখুটি। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'পার্টিশান হবার পর অনেকে চলে আসতে লাগল ইণ্ডিয়ায়। আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তারা কেউ কেউ গেল আসাম, কেউ আগরতলা, কেউ কুচবিহার, কেউ বা এল এই কলকাতায়। তবু অনেক হিন্দু তখন চাঁদপুরে রয়েছে। ব্যবসা-পত্তর করছে, চাকরি-বাকরি করছে, চাষ-আবাদ করছে। আমার স্ত্রী জেদ ধরল, হিন্দুস্থানে চলে আসবে। আমিই তাকে বুঝিয়ে বললাম,

দেশ তো ভাগ হয়ে গেল, যার জন্যে এত হাঙ্গামা-হুজ্জুত, এত রায়ট তা যখন হয়েছে তখন শান্তি হবেই। আর গোলমাল যদি না থাকে শুধু শুধু দেশ ছেড়ে যাব কোন্ দুঃখে। আমি 'অপসান' দিয়ে পাকিস্তানেই থেকে গেলাম।'

'তারপর ?'

'কিছুদিন ভালই কাটল। তারপর আবার ঝঞ্ঝাট শুরু হল। বাগানের ফলটা পাকুড়টা, পুকুরের মাছটা, জমির আনাজ ফসল প্রথম প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে নিয়ে যেত। কিছুদিন পর আর লুকোচুরির ধার ধারল না। বুক ফুলিয়ে সামনে দিয়েই নিয়ে যেত। মাছ-ফল-ফসলের উপর দিয়ে গেলেও না হয় সওয়া যেত। আরো কিছুদিন পর বেনামী চিঠি আসতে লাগল। খবর পেতে লাগলাম, নানা জায়গায় দাঙ্গা চলছে, আগুন লাগিয়ে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। শুনে ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, তবে দমে যাইনি।'

শিশির মুখুটি আমার চোখের সামনে যে ভয়ের ছবি আঁকছেন, আমার তা অজানা নয়। আমাদের আমতলিতেও সেই একই ইতিহাস।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'ভয় পেয়ে চাঁদপুরের আমরা কয়েকজন ঢাকায় গেলাম সরকারী কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা ভরসা দিলেন, ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় তা দেখবেন। কিন্তু কিছুই দেখলেন না। যা চলছিল তাই চলতে লাগল। আবার আমরা ঢাকায় ছুটলাম। আবার প্রতিশ্রুতি মিলল কিন্তু কাজ কিছু হল না। বার বার আমরা ঢাকায় ছুটতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম ঢাকায় গিয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু আদায় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। মাইনরিটির উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চলুক—ওখানকার সরকারী কর্তারা হয়তো এ চান না কিন্তু কিছু প্রতিকারও করলেন না।' একটু থেমে আবার, 'এদিকে উপদ্রব দিন দিন আরো বাড়তে লাগল। আমাদের চাঁদপুরেই খানিকটা গ্রামের দিকে কনভার্সনের খবর আসতে লাগল।

শুনতে শুনতে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। চারদিক থেকে অসংখ্য ভীতিকর সঙ্কেত দিয়ে একটা নিদারুণ অনিবার্য পরিণতির দিকে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছেন শিশির মুখুটি।

তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠল। বলল, আর না, চল —এখান থেকে চলে যাই। তখনও আমার আশা, এই সমস্ত উৎপাত সাময়িক। আবার সব কিছু স্বাভাবিক হবে। আসলে কী জানো চিরঞ্জীব—'

'কী ?'

'মায়া—মায়া। পিতৃপুরুষের জমিজমা বাড়ি-ঘর বাগান-পুকুরের ওপর টান।

সে সব ফেলে কোথাও চলে যেতে আমার মন চাইছিল না। আজন্ম যাকে জানি, যে মাটির ধুলো গায়ে মেখে যার বাতাস বুকে টেনে বড় হয়েছি তাকে ছেড়ে কোথায় যাব? ছেলেপুলে নিয়ে অচেনা বিদেশে যাবার ভয় আমাকে দেশে আটকে রেখেছিল। আর তারই ফলে সর্বনাশ ঘটে গেল।'

কিছু না বলে শঙ্কিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

শিশির মুখুটি বললেন, 'এতদিন গ্রামের দিকেই ঝঞ্ঝাট উৎপাত বেশি চলছিল। ফল-মাছ নিয়ে যাওয়া ছাড়া শহর ছিল মোটামুটি শান্ত। কিন্তু চারদিকে যখন বেড়া আগুন জ্বলছে তখন শহর আর কতকাল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। শহরেও সেই আগুন এসে ছুটে লাগল আর প্রথম লাগল আমারই ঘরে।'

লক্ষ্য করলাম, শিশির মুখুটির চোখ জলে ভরে গেছে। সেই জলের ভেতর মণি দুটো যে কোথায় ডুবে আছে, বুঝতে পারছি না। ঠোঁট দুটো থরথর, কণ্ঠার কাছটা সমানে লাফাচ্ছে! শ্বাস বোধ হয় রুদ্ধ। তার মধ্যেই তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'মালতীকে তুমি দেখেছ তো? আমার মেয়ে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ও আমার মেজ মেয়ে, মালতীর বড় আরেকটি মেয়ে আমার ছিল—কমলা। মালতীর চাইতেও সে দেখতে অনেক সুন্দর—একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা। কলেজে পড়ত। একদিন কলেজ থেকে ফিরবার পথে রাক্ষসেরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। অনেক থানাপুলিস করলাম, ঢাকায় গিয়ে কত লোকের যে পায়ে ধরলাম তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু কিছুই হল না। আর মেয়েটাকে হারাবার পর থেকে আমার স্ত্রী খাওয়াদাওয়া ছেড়েছে; ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে পড়ছে।' শিশির মুখুটির কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙে ভেঙে শিথিল হয়ে একসময় রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি যেন কিছুই শুনতে বা বুঝতে পারছিলাম না। চোখের সামনের বিস্তৃত ময়দান, শীতের অনুজ্জ্বল আলো, দূরের ঝাপসা গাছপালা—সব ধীরে ধীরে একাকার হয়ে গাঢ় অন্ধকারে ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কতক্ষণ পর জানি না, নিরাকার অন্ধকারের ভেতর থেকে শিশির মুখুটির গলা ভেসে এল, 'কমলার পর মালতী আছে। পাকিস্তানে থাকতে আমার আর ভরসা হল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এলাম। সেই এলামই; পার্টিসানের সময়ই যদি চলে আসতাম, আমার এত বড় সর্বনাশটা তা হলে হত

না। হা ভগবান!'

অতর্কিতে আমার রক্তের ভেতর বিচিত্র এক প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। সবিতা —সবিতাও তো দেশে রয়েছে। মাধবীর মত তাকেও কি? না—না। আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে দুরন্ত বেগে বরফের স্রোত নামতে লাগল। যেমন করে আর যে মূল্যেই হোক, একটা চাকরি যোগাড় করে কয়েক দিনের ভেতর সবিতাকে এখানে নিয়ে আসতেই হবে।

একসময় আমরা ধর্মতলায় পৌঁছে গেলাম।

শিশির মুখুটি ইতিমধ্যেই খানিকটা সামলে নিয়েছেন। বললেন, 'এখন বাড়ি ফিরবে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি বললাম।

একটু ভেবে শিশির মুখুটি এবার শুধোলেন, 'বাড়িতে খুব জরুরী কাজ আছে?'

'না—তবে—'

'তবে কী?'

'সাতটা নাগাদ ফিরে যেতে হবে। আপনাকে তো বলেছিই আমার এক পিসেমশাইয়ের বাড়ি উঠব। তিনি আমাকে ঐ সময় বাড়িতে থাকতে বলেছেন।'

দূরের টাওয়ারে ঘড়ি দেখে শিশির মুখুটি বললেন, 'সবে সোয়া তিনটে। সাতটা বাজতে যথেষ্ট দেরি। আমরা কোথায় উঠেছি, দেখে আসবে চল। তা ছাড়া তুমি আমার দেশের লোক; তোমার সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করলে আমার স্ত্রী কিছুক্ষণ অন্তত দুঃখের কথা ভুলে থাকতে পারবে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তোমাকে বাসে তুলে দেব। সাতটার ভেতর যাদবপুর পৌঁছে যেতে পারবে।'

খানিক ইতস্তত করে শিশির মুখুটির সঙ্গে ট্রামে গিয়ে উঠলাম।

ট্রাম থেকে নেমে অসংখ্য অলিগলির গোলকধাঁধা পেরিয়ে শিশির মুখুটি যেখানে আমাকে নিয়ে এলেন সেই জায়গাটা এ শহরের কোন গৌরব বা দাক্ষিণ্যের শরিক নয়। জায়গাটা কতকালের প্রাচীন, কত পুরনো—কে বলবে। এ শহর সৃষ্টির সেই আদিযুগে খুব সম্ভব এর পত্তন।

প্রকৃতির আলো প্রকৃতির বাতাস এখানে এসে পৌঁছয় না। দমবন্ধ সর্পিল গলির দু ধারে ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ির দুর্গ খাড়া করে আলো-বাতাসের বিরুদ্ধে নিয়ত এ জায়গাটা কি এক ষড়যন্ত্র যেন করে চলেছে। ভিজে ভিজে

হিমাক্ত অন্ধকার এর সর্বাঙ্গে জড়ানো।

দু ধারে স্তূপীকৃত আবর্জনা. ইঁদুর আর কাকের গলিত দুর্গন্ধ শব শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ করে আনছে। কলকাতা শহরে এমন একটা জায়গা থাকতে পারে, কে ভেবেছিল।

চলতে চলতে একটা পলেস্তারা-খসা একতলা বাড়ির সদরে এসে থামলেন শিশির মুখুটি। অগত্যা আমাকেও থামতে হল।

বাড়ির ভেতর থেকে মিলিত কণ্ঠের কান্নার শব্দ আসছে। শিশির মুখুটি চমকে উঠলেন। ভয়ার্ত মলিন মুখে বললেন, 'কী ব্যাপার ?' বলেই গলা তুলে ডাকলেন, 'দাদা, দাদা—'

আগেই জেনেছি, শিশির মুখুটি তাঁর স্ত্রীর বড় ভগ্নিপতির বাড়ি উঠেছেন। ভদ্রলোকের নাম রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বড় ভায়রাকে লোকে দাদাই বলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আর সেদিনের সেই মেয়েটি—মালতী যার নাম, চোখেমুখে দীঘল যার টান—আলুথালু বেশে, এলোমেলো রুক্ষ চুলে কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের পাখির মত ছুটে এসে শিশির মুখুটির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'আমাদের কী হবে বাবা ! আমাদের কী হবে !'

শিশির মুখুটির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার হৃৎপিণ্ড নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল।

নয়

শিশির মুখুটির বুকের ভেতর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে মালতী আর প্রাণ-ফাটানো বিকৃত ভাঙা গলায় একটানা কেঁদে চলেছে, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা ; আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেল !'

ওদিকে মালতীর ছোট ভাই দুটিও বেরিয়ে এসেছে। তারাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে চলেছে। শিশির মুখুটির ভায়রাভাই রাধামোহন-কেও দেখা গেল ; সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

রাধামোহনের মুখ আমার চেনা। কালকের বিষণ্ণ দুপুরে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁকে দেখেছিলাম ; ইস্টবেঙ্গল মেল থেকে শিশির মুখুটিদের আনতে গিয়েছিলেন তিনি।

এখন রাধামোহনকে দেখতে পাচ্ছি, কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। চোখ আরক্ত,

জলপূর্ণ। মুখ শুষ্ক, মলিন। প্রচণ্ড এক ঝড় তাঁকে সবলে ঝাঁকিয়ে গেছে বুঝি।

বিহ্বলের মত রাধামোহনের দিকে তাকালেন শিশির মুখুটি। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার দাদা? ওরা কাঁদছে কেন?'

সজ্ঞানে না, যেন ঘোরের মধ্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন রাধামোহন। শিশির মুখুটির একটা হাত ধরে ঝাপসা গলায় বললেন, 'শিশির ভাই—', তাঁর চোখের প্রান্তে যে জলের বিন্দুগুলি স্তব্ধ হয়েছিল, ঝর ঝর করে গাল বেয়ে নামতে লাগল।

আগের স্বরেই শিশির মুখুটি শুধোলেন, 'কী হয়েছে দাদা?'

রাধামোহন স্খলিত স্বরে বললেন, 'ভেতরে এসে দেখ ভাই; আমি বলতে পারছি না। বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে।'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না শিশির মুখুটি। অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে আচ্ছন্নের মত রাধামোহনের পিছু পিছু বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বিভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ আমাকে ভেতরে যেতে বলেনি। যাওয়া কি উচিত হবে? শিশির মুখুটি আমাকে ডেকে এনেছেন ঠিকই কিন্তু দ্বিধার দুই প্রান্তে দোল খেতে খেতে আমার মনে হল, যেভাবে রাধামোহন, মালতী এবং ছোট ছেলে দুটি আকস্মিক দুঃসংবাদে শিশির মুখুটিকে বিমূঢ় এবং অসাড় করে দিয়েছে তাতে আমার দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ তাঁর ছিল না। ডেকে এনে সদর দুয়ারে দাঁড় করিয়ে নিজে ভেতরে চলে যাওয়ার মধ্যে আতিথেয়তার কতখানি ত্রুটি ঘটেছে তা বুঝবার মত মানসিক অবস্থা শিশির মুখুটির নিশ্চয়ই ছিল না। সবাই যেন হাত ধরে একটা বিহ্বল অস্থির আচ্ছন্নতার ভেতর তাঁকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

কিন্তু দুঃসংবাদটা কী? কী এমন সর্বনাশ ঘটে গেছে যাতে মালতী, তার দুই ভাই এবং রাধামোহন এত অভিভূত? শোকাচ্ছন্ন? বুঝতে পারছি না।

আমি কি ফিরে যাব? শিশির মুখুট আমার আপনজন না; দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও তাঁর সঙ্গে নেই। এই সেদিন ইস্টবেঙ্গল মেলের তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় তাঁকে দেখেছি। আত্মীয়তা নেই, ঘনিষ্ঠতা নেই, তবু দেশভাগের অসীম দুঃখের ভাগাভাগি আমাদের আছে। একই দুঃখের শরিক হয়ে আমরা অনেকখানি কাছাকাছি এসে পড়েছি যেন।

শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারলাম না। বিষাদময় এক সম্মোহের ঘোরে পায়ে পায়ে কখন যে বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়েছি খেয়াল নেই।

কলকাতা শহরের আদি পত্তনের যুগে এ বাড়িটার বুঝি সৃষ্টি। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে গিয়ে কবেই ইট বেরিয়ে পড়েছে ; সেই ইটের গায়ে কবে যে নোনা ধরে বাড়িটাকে ধ্বংসের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে দিতে শুরু করেছে তাই বা কে বলবে। ভিত অনেক আগেই বসে গিয়েছিল ; সেখানে লম্বা লম্বা চিড়ের দাগ।

এ বাড়ির বাসিন্দারা বুঝিবা কোনদিন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত ছাখেনি। যত বিমর্ষ যত স্তিমিতই হোক, বাইরে শীতের রোদটুকু এখনও হঠাৎ-লজ্জা-পাওয়া মুখের রক্তাভার মত আটকে আছে কিন্তু এ বাড়িতে আসার দুয়ার তার কাছে রুদ্ধ। পৃথিবীর আলো এবং বাতাসের বিরুদ্ধে বাড়িটা চিরদিন দুর্গের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীতের ঠাণ্ডা আছে ঠিকই তবু আমার মনে হল, ছয় ঋতু বারো মাস সারাদিন এ বাড়িতে স্যাঁতসেঁতে শীতল একটা প্রদোষ ঘনিয়েই থাকে।

সদর পেরুলেই শ্যাওলা-ধরা পিছল উঠোন। একধারে জলের কল ; তার চারধার ঘিরে মাছের কাঁটা, ভাত, ছাই, চিবানো ডাঁটা ইতস্তত ছড়ানো।

কলতলার ডানপাশের ঘরটার সামনে ভিড় দেখতে পেলাম। ছেলে-বুড়ো-বৌ-বাচ্চা এ বাড়ির সবাই সেখানে জমা হয়েছে। সকলের মাথার ওপর দিয়ে শিশিরবাবুর ভায়রা রাধামোহনকে দেখতে পেলাম। ঘরের ভেতর থেকে শোকার্ত কান্নার অভিভূত বিহ্বল শব্দ আসছে। মনে হল অনেকে একসঙ্গে কাঁদছে।

উঠোন থেকে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠলাম। ভিড়ের ভেতর আসতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। যেমন অভাবিত, তেমনি করুণ এবং ভয়াবহ।

সেই মহিলাটিকে, শিশিরবাবুর স্ত্রীকে, মেঝের একটি বিছনায় শোয়ানো হয়েছে। চোখ খোলা ; তারা দুটি তার ভেতর স্থির হয়ে আছে। গালের পাশ দিয়ে জিভটা অনেকখানি বেরিয়ে রয়েছে। থকথকে গাঢ় রক্ত কষের কাছে জমাট বাঁধা। অসংখ্য মাছি উড়ছে সেখানে। গলার শির দড়ির মত পাকানো। জীবনের কোন লক্ষণই তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। মৃত্যু তার নিষ্ঠুর নির্দয় হাতের ছাপ সেখানে মুদ্রিত করে রেখেছে।

মৃতদেহটি ঘিরে ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনেরা সমানে কাঁদছে ; সে কান্নায় ছেদ নেই, বিরতি নেই। শিশিরবাবু একধারে আচ্ছন্নের মত বসে আছেন। তিনি কাঁদছেন না ; ঘোলাটে চোখে স্ত্রীর দিকে শুধু তাকিয়ে আছেন। আমার সন্দেহ হল, তাঁর সে চোখে বুঝি দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ—

সব কিছুর বাইরে এক অনুভূতিশূন্য নিরাকার অন্ধকারে তিনি যেন ডুবে আছেন।

দেখতে দেখতে বুকের ভেতর আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল। পরশুদিন শিশিরবাবুর স্ত্রীকে দেখেছিলাম ইস্টবেঙ্গল মেলে। একসঙ্গে শিয়ালদা পর্যন্ত এসেছি। খুব কাঁদছিলেন মহিলা; ঘন ঘন মূর্ছাও যাচ্ছিলেন। শরীর কৃশ, দুর্বল, করুণ। তবু আজই যে মৃত্যু তাঁর ওপর যবনিকা টেনে দেবে, এ ছিল আমার সুদূর কল্পনারও বাইরে।

আমি কি ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে সান্ত্বনার কথা বলব? এ রকম অবস্থায় কী করতে হয়, সামাজিক রীতিনীতি কি, আমার জানা নেই।

মৃত্যু মাত্রেই বিপুল বিশাল শূন্যতা। তার স্বপক্ষে অনেক জয়ধ্বনি শুনেছি; অনেক বিষাদময় দার্শনিক ব্যাখ্যা পড়েছি। পড়াশোনা ছাড়া বাকি থাকে চোখে দেখা আর অনুভব করা। আমার বাইশ বছরের জীবনে শ্মশানযাত্রী শবের মিছিল কি আর দেখিনি? অসংখ্য দেখেছি। কিন্তু সে শুধু দেখাই। যে মৃত্যু অনুভূতিকে অসাড় এবং বিমূঢ় করে দেয় তেমন মৃত্যু আমার অভিজ্ঞতার সীমার ভেতরে নেই। কেননা আমার কোন প্রিয়জনকে আজও হারাইনি।

বাইশ বছরের জীবনে আমি কোন শবযাত্রায় যাইনি। এত কাছে থেকে মৃত্যুকে আর কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। শিশিরবাবু আমার প্রিয়জন নন, আত্মীয় নন, এমন কি দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতাও তাঁর সঙ্গে নেই। তবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু আমার সমস্ত অস্তিত্বকে অতর্কিত তীব্র আঘাতে পঙ্গু করে দিয়েছে।

সান্ত্বনার কথা মনে পড়লেও ভেতরে যাওয়া হল না। পরম শোকের এই মুহূর্তে মামুলী কয়েকটি কথা আবৃত্তি করতে যাওয়া নিতান্তই অর্থহীন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর রাধামোহন ভিড় ঠেলে বাইরে এলেন। ভেতরে একটানা কান্না চলেছে।

রাধামোহনের একটা হাত ধরে উঠোনে নিয়ে এলাম। বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

জামার হাতায় চোখ মুছতে মুছতে রাধামোহন মাথা নাড়লেন, 'হ্যা। কাল আপনাকে শিয়ালদায় দেখেছিলাম।'

'শিশিরবাবুরা আর আমি একসঙ্গে পাকিস্তান থেকে এসেছি। সে যাই হোক, ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

—'কোন্ ব্যাপার?'

'শিশিরবাবুর স্ত্রীকে কাল পরশু দু-দিনই ট্রেনে খুব কাঁদতে দেখেছি ; মাঝে মাঝে উনি অজ্ঞানও হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু—'

কিছু জিজ্ঞেস না করে ঝাপসা সজল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাধামোহন।

একটু ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত স্বরে বললাম, 'কিন্তু আজই যে উনি—', বলতে বলতে থমকে গেলাম।

নিজের কপালে একটা আঙুল রেখে ভাঙা রুদ্ধ গলায় রাধামোহন বললেন, 'আমার কপাল ভাই, আমার কপাল। ও শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতে এসেই আত্মহত্যা করল—'

'আত্মহত্যা!' নিজের অজ্ঞাতসারে আমি প্রায় চিৎকারই করে উঠলাম কিন্তু গলা চিরে স্বরটা সম্পূর্ণ বোধ হয় বেরিয়ে এল না।

'হ্যাঁ, আত্মহত্যা। গলায় দড়ি দিয়েছে শান্তি।'

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, শিশিরবাবুর স্ত্রীর গালের কষে জমাটবাঁধা থকথকে গাঢ় রক্ত দেখেছি। ভনভনে মাছির ঝাঁক উড়তে দেখেছি ; খোলা চোখের মণি স্থির নিশ্চল হয়ে থাকতে দেখেছি। এতক্ষণে আমার খেয়াল হল, এ মৃত্যু সহজ স্বাভাবিক নয়। কিছু বলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু আতঙ্কিত বিহ্বল একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারলাম না।

গোঙানির মত স্বর তুলে একটানা বলে যেতে লাগলেন রাধামোহন, 'কে জানত এইরকম একটা সর্বনাশ ঘটবে! তা হলে সব সময় চোখে চোখে রাখতাম ; এক মিনিট কেউ কাছছাড়া হতাম না। শিশির সকালবেলায় বেরিয়ে গেল—'

আমি কিছু বললাম না।

রাধামোহন বলতে লাগলেন, 'শিশির গেল অকল্যাণ্ডে লোনের দরখাস্ত-টরখাস্ত করতে। এদিকে শান্তি করল কী জানেন?'

'কী?' রুদ্ধশ্বাসে তাকালাম।

'আমার স্ত্রীকে ডেকে চুলে তেল মাখিয়ে দিতে বলল। তেল মাখাটাখা হলে ভাল করে স্নান করে এল। তারপর বলল, আমি একটু ঘুমবো। আমার স্ত্রী বলল, খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমো। শান্তি বলল, না, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে নিই। তোর ভগ্নীপতি ফিরে এলে খাব। আমি তখন বাড়ি ছিলাম। ভাবলাম ক'টা দিন ট্রেনে স্টীমারে ধকল গেছে। চোখের পাতা এক করতে পারেনি। আচ্ছা ঘুমোক।'

মাঝখান থেকে আমি বলে উঠলাম, 'উনি তো ট্রেনে শুধু কেঁদেছেন আর বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন রাধামোহন। তারপর ভাঙা অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, 'তা তো কাঁদবেই ; অজ্ঞান হওয়াই বা বিচিত্র কী! কী যে যন্ত্রণা, কী যে কষ্ট ওদের ! আপনি কিছু জানেন—'

চকিতে আমার মনে পড়ে গেল। আজই খানিক আগে ময়দানের ধার দিয়ে আসতে আসতে দেশছাড়ার নিদারুণ ইতিহাস আমাকে শুনিয়েছেন শিশির মুখুটি। সেই ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর অনিঃশেষ কান্না এবং মূর্ছার কারণ জড়িত। ওঁদের বড় মেয়ে—মালতীর দিদি মাধবীকে ওঁরা এপারে নিয়ে আসতে পারেননি। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফেনায়িত বিষ যাদের বর্বর জন্তু করে দিয়েছে তারা মাধবীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

বাপ হয়ে মেয়েকে রক্ষা করতে পারেননি শিশির মুখুটি।

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল অস্তিত্বের তলদেশে কোন এক কোমল অদৃশ্য জায়গা তীরবিদ্ধ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানালাম, শিশির মুখুটি এবং তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক দুঃখের কিছুই আমার অজানা নেই।

রাধামোহন সেই আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। বললেন, 'শান্তি যখন ঘুমোতে চাইল আমি ভাবলাম, এতে শরীরটাও সুস্থ হবে। তা ছাড়া যতক্ষণ ঘুমোবে মেয়েটার কথাও ভুলে থাকতে পারবে। কিন্তু কে জানত, তার মনে এই আছে!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন রাধামোহন, 'আমার দুখানা ঘর। এক ঘরে ঢুকে শান্তি বিছানা পেতে দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জানলা বন্ধ করছ? শান্তি বললে, চোখে আলোটা বড় বিঁধছে। সরল মনে আমি তাই বিশ্বাস করেছি। তখন যদি বুঝতাম, দরজা-জানলা বন্ধ করার পেছনে অন্য কারণ আছে—', গলার স্বর কান্নায় ভারী হয়ে ক্রমশ বুজে আসতে লাগল রাধামোহনের।

ঝাপসা গলায় বললাম, 'তারপর—'

'তারপর আর কি—,' নির্জীব বিষণ্ণ স্বরে রাধামোহন বলতে লাগলেন', 'দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার সময় আমার স্ত্রী শান্তিকে ডাকতে গেল। অনেকবার ডাকল সে, দরজায় ধাক্কা দিল কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া এল না। তখন আমি গেলাম। ডাকলাম, জোরে জোরে দরজা ধাক্কালাম। কিন্তু এবারও কোন সাড়া নেই। আমাদের ডাকাডাকি করতে দেখে এ বাড়ির ভাড়াটেরা একে একে এসে

শান্তির ঘরের সামনে এসে ভিড় করল; ডাকতে লাগল। কত ঘুমোচ্ছে শান্তি যে এতগুলো লোকের ডাকাডাকি, দরজা ধাক্কাধাক্কি শুনতে পাচ্ছে না? প্রথমটা আমার সন্দেহ হল, তারপর ভয় পেয়ে গেলাম।'

রাধামোহন চুপ করেছেন। আমি কিছু না বলে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

রাধামোহন আবার শুরু করলেন, 'ভয় পেয়ে আমি দাঁড়ালাম না; সোজা থানায় ছুটলাম। পুলিস এসে দরজা ভাঙতে দেখলাম শান্তি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। একখানা চিরকুটে লিখে গেছে তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়; নিজের অদৃষ্টকেই শুধু এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করে গেছে শান্তি। যাই হোক, পুলিসের ঝামেলা মিটতে মিটতে ঘণ্টা তিনেক লাগল। তারপর থেকে শিশিরের জন্যে বসে আছি। শিশির আসার পর যা ঘটেছে তা তো আপনি জানেন।'

জানি যে, ঘাড় কাত করে জানিয়ে দিলাম।

রাধামোহন বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই; শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা করি গে। খাটুলি, কিছু ফুলটুল কিনে আনতে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার এখন কি কোন কাজ আছে?'

'না, তেমন আর কি কাজ—'

'আমি একা মানুষ। দয়া করে যদি আমার সঙ্গে একটু আসেন—'

'নিশ্চয়ই।'

আমরা বেরিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর খাটুলি, খই, ফুলটুল—শ্মশানযাত্রার যাবতীয় উপকরণ নিয়ে ফিরে এলাম।

এদিকে একটানা চলবার পর কান্নাটা কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছিল। খাটুলি দেখে সেটা উদ্দাম প্রবল হয়ে উঠল। বুকফাটানো সম্মিলিত চিৎকারের মধ্যে শিশির মুখুটির স্ত্রীকে খাটুলিতে তুলে শুইয়ে দেওয়া হল। পায়ে চওড়া করে আলতা পরানো হল। কপালে এবং সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুরের রেখা।

ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে ডেকে এনেছেন রাধামোহন। হরিধ্বনি দিয়ে এবং খই ছিটিয়ে শবযাত্রা শুরু হল।

শ্মশানগামী মৃতদেহের পিছু পিছু উদভ্রান্তের মত চলেছেন শিশির মুখুটি। চলেছে মালতী, তার ছোট ভাই-বোনেরা। চলেছে রাধামোহন, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। এই বিহ্বল শোকার্ত মিছিলে আমিও আছি। নিজের থেকে নয়, কি একটা নিরবয়ব স্রোত আমাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

'বল হরি—'

'হরিবোল।'

একসময় শ্মশানে পৌঁছে গেলাম। রাধামোহন যে ছেলেদের ডেকে এনেছিলেন তারাই হাতে হাতে চিতা সাজিয়ে ফেলল। মালতীরা মায়ের মৃতদেহ আঁকড়ে শেষবারের মত কেঁদে নিচ্ছে।

শিশির মুখুটি কিছুই করছেন না। কাঁদছেন না, কথা বলছেন না। টকটকে লাল চোখ মেলে উদ্‌ভ্রান্তের মত, বিভ্রান্তের মত, অভিভূতের মত স্ত্রীর শবের দিকে শুধু নিষ্পলকে তাকিয়ে আছেন।

শ্মশানে এসেই শুধু নয়, অকল্যাণ্ড থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর অস্বাভাবিক অকল্পনীয় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিশির মুখুটি সেই যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তারপর থেকে এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলেননি। তাঁর প্রাণের অতলে যে শোকার্ত আচ্ছন্ন আবেগ উদ্বেল হয়ে আছে, কখন কোন্ পথে তা উথলে বেরিয়ে আসবে সেজন্য শঙ্কিত হয়ে আছি। তাঁর শোকোচ্ছ্বাসের কি জাতীয় পরিণতি হবে, বুঝতে পারছি না।

দেখতে দেখতে মৃতদেহ স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে চিতায় শোয়ানো হল। মুখাগ্নি করল মালতীর এক ভাই। তারপরেই চিতার আগুন জ্বলে উঠল।

চিতাধূমের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে ভেঙে পড়লেন শিশির মুখুটি। বুকের ভেতর যা স্তব্ধ হয়ে ছিল, সব বাধা ভেঙেচুরে এবার প্রবল ধারায় বেরিয়ে এল। অবুঝ শিশুর মত তিনি কেঁদে উঠলেন, 'ছেলেমেয়েগুলোকে ফেলে তুমি তো চলে গেলে! ওদের কি হবে, ভেবে দেখলে না।'

হাত-পা কিছুই যেন শরীরের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ নয়। সব আলগা হয়ে ঝুলছে; শিথিল অসংলগ্ন প্রত্যঙ্গ নিয়ে শিশির মুখুটি চুরমার হয়ে যেতে লাগলেন।

চিতার আগুন যখন নিভল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। এতক্ষণ বিচিত্র ঘোরের ভেতর সময়টা কেটে গেছে। অস্বাভাবিক অতর্কিত মৃত্যু-দিয়ে-ঘেরা শিশির মুখুটির করুণ শোকাচ্ছন্ন পরিবারটি ছাড়া আর কোনদিকে আমার খেয়াল ছিল না। পৃথিবীর সব কিছু থেকে আমি যেন সেই বিকেল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি।

চিতাধূম অসীম নীলাকাশে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, পিসেমশাই আমাকে সাতটার ভেতর বাড়ি ফিরতে বলেছিলেন। তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন। কথাটা মনে পড়তেই চকিত হলাম।

পিসেমশাই মানুষ হিসেবে নিয়মানুবর্তী; সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বাঁধা। সময়ের এতটুকু হেরফেরে তিনি রেগে যান।

এখন ক'টা বাজে? এদিক সেদিক তাকাতেই একজনের হাতঘড়িতে দেখতে পেলাম আটটা বেজে গেছে। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে উঠল। যাদবপুরে ফিরলে অভ্যর্থনাটা কি রকম হবে ভাবতে সাহস হল না।

আমার উচিত শিশির মুখুটিদের সঙ্গে বাগবাজার পর্যন্ত যাওয়া। সেটাই বোধ হয় সামাজিক এবং মানবিক রীতি। পর' শোকের মুহূর্তে এ ছাড়া আর কি সহানুভূতির প্রকাশ থাকতে পারে আমার জানা নেই।

আমি কিন্তু বাগবাজার গেলাম না। শ্মশান থেকেই বিদায় নিলাম।

শিশির মুখুটি কিছু বললেন না। আরক্ত আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকালেন শুধু। আমার কথা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না।

রাধামোহন বললেন, 'সময় পেলে আমাদের বাড়ি আসবেন।'

'আসব।' লম্বা পায়ে আমি বাস-রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। একে ওকে জিজ্ঞেস করে দুটো বাস বদল করে যখন যাদবপুর এসে পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটায় রাতের বয়স কত জানি না। ন'টা হতে পারে, সাড়ে ন'টা হতে পারে। দশটা হওয়াও বিচিত্র না।

আজ সারাটা দিন আলো ছিল, রোদ ছিল। আকাশের কোন প্রান্তে একটুকরো ভবঘুরে মেঘও দেখিনি; দিগন্ত পেরিয়ে তারা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল।

সারাদিন যারা অদৃশ্য, সেই মেঘেরা সন্ধ্যে নামার পর থেকেই আবার হানা দিতে শুরু করেছিল। আমি তখন শ্মশানে। এমনই অভিভূত আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, আকাশের মেঘ দেখেও দেখিনি।

বাস থেকে নামতে না নামতেই বৃষ্টি শুরু হল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর বেশ জোরে জোরে। তার সঙ্গে উত্তুরে বাতাস সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এই হাওয়া আর বৃষ্টি যেন হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে।

আমার কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শীতের হিমাক্ত কনকনানি আমাকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করতে পারেনি। পিসেমশাইয়ের বাড়ির দিকে যত এগুচ্ছি, বুকের ভেতরটা ততই কাঁপতে লাগল। পিসেমশাই আমার আশ্রয়দাতা। তাঁর পছন্দ অপছন্দের কিছু আভাস ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। কোন কারণে তিনি অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হলে আমার পক্ষে তা বিপজ্জনক।

হৃৎপিণ্ডের অস্থির অসংযত উত্থান-পতন নিয়ে একসময় বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম একতলার করিডরে উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গল। আমাকে দেখেই ছুটে এল। উত্তেজিত ভীত স্বরে বলল, 'কি ব্যাপার দাদাবাবু, সারাদিন কোথায় ছিলেন ?'

মঙ্গলের ভয় নিমেষে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন মঙ্গলদা, কিছু হয়েছে ?'

'নিশ্চয়—'

'কী—'

'বড় কত্তাবাবু না-হক বিশবার আপনার খোঁজ করেছে।' মঙ্গল বলতে লাগল, 'আমি সেই আটটা থেকে ঠায় এখানে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। এলেই আপনাকে ধরে দোতলায় নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছে বড় কত্তাবাবু। দেরি করবেন না। চলুন—,' বলে আর দাঁড়াল না মঙ্গল; দোতলার সিঁড়ির দিকে বকের মত লম্বা পা বাড়িয়ে দিল।

আমি যে নিজের ঘরে গিয়ে শ্মশানের পোশাক বদলাব, চোখেমুখে একটু জল দেব—সে কথা মঙ্গলকে বলতে সাহস হল না। অদৃশ্য সুতোর টানে মন্ত্রচালিতের মত তার পিছু পিছু চলতে শুরু করলাম।

সিঁড়ি বাইতে বাইতে মঙ্গল বলল, 'আপনার তো সাতটার সময় ফেরার কথা ছিল—'

'হ্যাঁ।' আধফোটা গলায় উত্তর দিলাম।

'আপনি ফেরেননি, কত্তাবাবু খুব রাগারাগি করছিলেন।'

আমি উত্তর দিলাম না।

মঙ্গলের পিছু পিছু প্রায় নিঃশব্দে, অশ্রান্ত উন্মথিত বুকের কাঁপুনি অনুভব করতে করতে পিসেমশাইয়ের ঘরের সামনে এসে দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিসিয়ে মঙ্গল ডাকল, 'কত্তাবাবু—'

ভেতর থেকে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পিসেমশাই বললেন, 'কে, মঙ্গল ?'

'আজ্ঞা—'

'চিরঞ্জীব ফিরেছে ?'

'আজ্ঞা, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।' বলে আমার দিকে ফিরল মঙ্গল, 'যান, ভেতরে যান।' কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল আর দাঁড়াল না। আমাকে তোপের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে দোতলার সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটুক্ষণ ইতস্তত করে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। মুখোমুখি দুটো সোফায় পিসেমশাই এবং আরেকজন অচেনা ভদ্রলোক বসে আছেন; পিসেমশাইয়ের সমবয়সী হবেন তিনি। মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে বড় বড় দুটি ভাবুক চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা, গায়ের রঙ সোনায়-হলুদে মেশানো। মাথার মাঝখানে চকচকে টাক বাদ দিলে ভদ্রলোক নিখুঁত সুপুরুষ।

পিসেমশাই আমাকে দেখে উত্তেজিত হলেন না। কোন কারণেই তিনি উত্তেজিত হন না। স্বভাবটি তাঁর বিশেষ একটি সুরে বাঁধা; যে সুর কখনই মৃদু গম্ভীর একটি স্তর থেকে ওপরেও ওঠে না, নীচেও নামে না।

খুব স্বাভাবিক স্বরেই পিসেমশাই বললেন, 'দু'দিন এসেছ। এর ভেতরেই এ বাড়ির হাওয়া গায়ে লেগে গেছে দেখছি!'

ইঙ্গিতটা বুঝলাম। নিজের ছেলেদের সঙ্গে একই পর্যায়ে আমাকে নামিয়ে দিয়েছেন পিসেমশাই। চুপ করে রইলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'সাতটার ভেতর তোমার ফেরার কথা ছিল না? এখন ক'টা বাজে জানো? সোয়া ন'টা—'

কেন সাতটার ভেতর ফিরতে পারিনি তার স্বপক্ষে জোরালো কারণ আমার মুঠোয় ছিল। বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না; স্বরটাকে গভীর খাদ থেকে কিছুতেই তুলে আনা সম্ভব হল না।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'তুমি সাতটায় ফিরবে বলে এঁকে আসতে বলেছি।' সামনের সোফার সুদর্শন প্রৌঢ়কে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'উনি সাতটা থেকে বসেই আছেন। যাই হোক, ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম কোরো না।'

ঘাড় কাত করে জানালাম, করব না।

পিসেমশাই আমার নীরবতায় বোধ হয় খুশিই হলেন। সময়মত না ফেরার জন্যে আর কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। এসো, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। উনি আমার বন্ধু হিরণ্ময় সোম— বিখ্যাত সমাজসেবী। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন, খুব প্রয়োজন।' আমাকে দেখিয়ে হিরণ্ময়ের উদ্দেশে বললেন, 'এর নাম চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার শ্যালকপুত্র। এর কথা আপনাকে আগেই বলেছি।'

হিরণ্ময় সোম এবং আমি পরস্পরকে নমস্কার জানিয়ে প্রথম পরিচয়টাকে চিহ্নিত করলাম।

দশ

পরিচয়-পর্ব চুকে গেছে। হিরণ্ময় সোম আমার চোখে চোখ রাখলেন। উৎসুক স্বরে বললেন, 'আপনাকে দিয়ে আমার কাজ হবে মনে হচ্ছে।'

চুপ করে থাকলাম। নাম ছাড়া আর কিছুই যাঁর জানি না, জীবনে এইমাত্র যাঁকে প্রথম দেখলাম, সেইরকম একটি লোকের কোন্ কাজে আমি আসতে পারি বুঝতে পারছি না। প্রশ্ন করে যে জেনে নেব তেমন উৎসাহটুকু পর্যন্ত আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। সেই সকাল থেকে আমি ঘুরছি। শুধু ঘোরা হলেও কথা ছিল। শিশির মুখুটির স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু, শোকদৃশ্য, শ্মশানযাত্রা—সব একাকার হয়ে আমার সত্তার ওপর অসীম ক্লান্তি, 'আর জড়তা যেন অনড় হয়ে আছে। কিছুই শুনতে, বলতে অথবা ভাবতে ভাল লাগছে না। জড়স্তূপের মত একান্ত নির্জনে চুপচাপ থাকতে পারলে আমি এখন বেঁচে যাই। আমার দেহমন এই মুহূর্তে আমার সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে চলে গেছে।

হিরণ্ময় নিজের থেকে কাজের কথাটা ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'আমি উদ্বাস্তুদের মানসিকতা, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসার ব্যাকগ্রাউণ্ডে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর ধর্মীয় কারণ আছে—এসব নিয়ে একখানা অথেন্টিক বই লিখতে চাই। আপনি তো সবেমাত্র বর্ডারের ওপার থেকে এলেন, আপনার কাছ থেকে টাটকা-টাটকা পাকিস্তানের ভেতরকার খবর পাব। বইটার ব্যাপারে অনেক ডেটা কালেক্ট করেছি ; আপনাকে আমি দেখাব—'

পিসেমশাই এই সময় বলে উঠলেন, 'চিরঞ্জীব তোমার ছেলের বয়েসী ; ওকে আপনি-আপনি করছ কেন হিরণ্ময় ?'

হিরণ্ময় মৃদু হাসলেন, 'আজকালকার ছেলে ; আপনি করে না বললে হয়তো অপমান করে বসবে। সেদিন একটা ছেলেকে তুমি বলেছিলাম ; তার উত্তরে সে কি বললে জান ? বললে "তুমি বলবার রাইট আপনাকে কে দিলে মশাই ? আপনি আমার গার্জেন ? নিজের সম্মান নিজের কাছে ; আগে থাকতেই সেফসাইডে থাকা ভাল।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন।'

হিরণ্ময়কে সন্তুষ্ট দেখাল, 'বেশ।'

একটু চুপচাপ। তারপর হিরণ্ময়ই আবার শুরু করলেন, 'এবার তা হলে

কাজ আরম্ভ করা যাক।'

বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই ; তবু হিরণ্ময়ের দিকে তাকালাম।

হিরণ্ময় বলতে লাগলেন, 'আমি অনেকগুলো প্রশ্ন ঠিক করে রেখেছি ; তোমাকে সেগুলো একে একে করে যাবো। তুমি উত্তর দেবে।' বলতে বলতে পকেট থেকে একখানা ডাইরী বার করলেন।

সারা শরীরে জড়তা আর অবসাদ মাখা। এখন আর প্রশ্নোত্তরের পালা ভাল লাগছে না। কিন্তু আমি এ বাড়িতে আশ্রিত ; হিরণ্ময়কে যথাযথ আপ্যায়ন না করলে আমার আশ্রয়দাতা নিশ্চয়ই সুখী হবেন না। সব জেনেও মরীয়ার মত বলে উঠলাম, 'আমার একটা কথা আছে।'

হিরণ্ময় এবং পিসেমশাই দুজনেই জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন।

হিরণ্ময়ের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আজ আমি বড্ড ক্লান্ত ; সারাদিন শ্মশানে-টশানে কেটে গেছে। দয়া করে আজকের দিনটা যদি আমাকে ক্ষমা করেন—'

উদার সদয় স্বরে হিরণ্ময় বললেন, 'বেশ তো, বেশ তো—তা হলে অন্য একটা দিন ঠিক করা যাক। কবে হলে তোমার সুবিধে হয় ?'

'আপনি যেদিন বলবেন সেই দিনই আমার সুবিধে।'

একটু কি ভেবে হিরণ্ময় বললেন, 'আজ হচ্ছে বুধবার ; আসছে রবিবার সন্ধ্যেবেলা হলে আপত্তি নেই তো ?'

'বিন্দুমাত্র না।' আমি মাথা নাড়লাম।

হিরণ্ময় আবার কি ভাবলেন। বললেন, 'একটা কাজ করলে কি রকম হয় ?'

'কী ?'

'ভাবছি রবিবার আমি আসব না ; তুমিই একটু কষ্ট করে আমার বাড়ি যাবে। একেবারে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবে। অসুবিধে হবে ?'

পিসেমশাই এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'না না, অসুবিধে কিসের। ও যাবে।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'হিরণ্ময়ের ঠিকানা লিখে রাখো। আর মনে করে রবিবার সন্ধ্যেবেলা যেও।'

হিরণ্ময় ঠিকানা দিলেন : —নং সাদার্ন এভেনিউ। একটা কাগজে টুকে ঠিকানাটা পকেটে পুরলাম। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'তা হলে আমি এখন যাই ?'

হিরণ্ময় এবং পিসেমশাই মাথা নাড়লেন ; অনুকূল সঙ্কেত পেয়ে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না ; প্রায় টলতে টলতে একতলায় ছুট লাগালাম।

নিজের ঘরে এসে প্রথমে শ্মশানের জামা-কাপড়গুলো ছাড়লাম; তারপর বাথরুমে ঢুকে হাতে-মুখে জল দিয়ে এলাম। আজ রাত্রে আর খাব না, লেপের আরামদায়ক উষ্ণতার ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে আমাকে প্রবলভাবে পেয়ে বসেছে।

বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দেব, তার আগেই বাধা পড়ল। দরজায় টক টক শুনে চকিত হলাম। মঙ্গল নাকি? কিন্তু সে তো এমন জানান দিয়ে ঘরে ঢোকে না। অমলও তো এসবের ধার ধারে না; সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ে' তবে কে?

ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বললাম, 'কে?'

দরজার ওপার থেকে মার্জিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মে আই কাম ইন—

ইংরেজিতে অনুমতি চাইছে; প্রথমটা থতিয়ে গেলাম। তারপর খানিক কৌতূহলে খানিক স্নায়ুভয়ে বলে উঠলাম, 'আসুন—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে যে পা রাখল এই মুহূর্তে তাকে প্রত্যাশা করিনি। সেদিন ভোরবেলা যে আগন্তুককে দরজা খুলে দিয়েছিলাম, এ সে-ই। সেদিন পা এবং মাথা টলছিল, কণ্ঠস্বর ছিল জড়ানো; চোখ রক্তবর্ণ। সেগুলো কিসের চিহ্ন বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আজ কিন্তু সে-সবের কিছুই চোখে পড়ল না। আজ সে সহজ, স্বাভাবিক। আমি বিমূঢ় হই, শঙ্কিত হই, অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি—নিজের সর্বাঙ্গে এমন কোন ভীতিকর লক্ষণ সে ধরে আনেনি।

আমি তাকিয়েই আছি। সে বলল, 'বসতে পারি?'

কেউ এলে বসতে বলাটা যে সাধারণ ভদ্রতা, আমার খেয়াল ছিল না। রীতিমত লজ্জা পেয়ে গেলাম। বিব্রত স্বরে তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসুন—'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আগন্তুক বলল, 'আমার নাম বিমল, ডাকনাম পিন্টু। আমি কে তুমি জানো?'

সেদিন ভোরে দরজা খুলে দিয়েই আন্দাজ করেছিলাম। আমার অনুমান যে নির্ভুল তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কেননা, বিমলের চোখেমুখে পিসেমশাইয়ের চেহারা মুদ্রিত হয়ে আছে। বললাম, 'জানি।'

'কেমন করে জানলে?'

'আপনাকে দেখে। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল।'

তারিফের ভঙ্গিতে বিমল বলল, 'তোমার চোখ বেশ ধারালো তো। শুধু

দেখেই পরিচয় ধরে ফেলতে পার!'

'অন্যের বেলায় পারব কিনা জানি না, তবে আপনার বেলা ব্যাপারটা কিন্তু খুব কঠিন না। যার চোখ আছে সে-ই ধরে ফেলতে পারে।'

'তা অবশ্য ঠিক। বাবার চেহারার স্ট্যাম্প বয়ে বেড়াচ্ছি।' বলতে বলতে ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করল বিমল। আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে বলল, 'টেক ওয়ান—'

আমি প্রায় কুঁকড়ে গেলাম। বিনীত ম্রিয়মাণ স্বরে বললাম, 'আমি তো সিগারেট খাই না।'

'লজ্জার কিছু নেই : নাও নাও—'

'সত্যিই আমি খাই না।'

প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না বিমল ; অবাক বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'এ যে দেখছি, গুডি-গুডি আশ্রম-বালক ; তোমার কিচ্ছু হবে না ব্রাদার—'

ধিক্কারের বোঝা দুই কাঁধে ঝুলিয়ে নতমুখে বসে রইলাম।

একটু চুপচাপ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বিমলই আবার নীরবতা ভাঙল, 'এইবার নিয়ে তিনবার তোমার খোঁজ করতে এসেছি!'

চোখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার কাছে বিমলের কি এমন দরকার থাকতে পারে যে এতবার এসে খোঁজ করে গেছে!

আমার চোখের দৃষ্টিতে কি আছে, বিস্ময় অথবা কৌতূহল, বলতে পারব না। বিমল বলল, 'বার বার কেন তোমার ঘরে হানা দিচ্ছি, ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম।

বিমল বলল, 'আমি ভাই তোমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে বার বার আসছি।'

'ধন্যবাদ।' আমি বিমূঢ়।

'সেদিন ভোরবেলা তুমিই তো আমাকে দরজা খুলে দিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে-টাজ্ঞে আবার কি। অত রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলতে হবে না। উই আর অল ফ্রেণ্ডস্।'

সত্যিই বিমলদের উদারতা আছে। আশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি তাদের ব্যবহার সহৃদয়, প্রীতিপূর্ণ।

বিমল বলতে লাগল, 'সেদিন ভাই কথা বলার অবস্থা ছিল না ; আমার

আবার একটু ড্রিঙ্কের হ্যাবিট আছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ!'

আমি এবারও নীরব।

বিমল থামেনি, 'প্রায়ই আমার বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত কাবার হয়ে যায়। মঙ্গলকে কত তোয়াজ করে যে দরজা খোলাই! গলা চড়িয়ে ডাকাডাকিও করতে পারি না। হেড অফ দি ফ্যামিলির ঘুম আবার কাচের চাইতেও ঠুনকো; একতলার দরজায় টোকা দিলাম তো দোতলার শেষ মাথার ঘরে তিনি উঠে বসলেন। মঙ্গল ব্যাটাও বদমাইসের ধাড়ি; আমাকে ঝাড়া একটি ঘণ্টা দাঁড় না করিয়ে কোনদিন দরজা খোলে না। সেদিন দুবার ডাকতে না ডাকতেই চিচিং ফাঁক হল। ভাবলাম, মঙ্গল হারামজাদার এমন সুমতি হল কেন? তারপর দেখি অন্য লোক। তক্ষুনি আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এমন আনস্টেডি অবস্থা যে তখন ঘরে গিয়ে শুতে পারলে বাঁচি।'

একদমে কথাগুলো বলে সিগারেটে লম্বা টান দিল বিমল। মুখের ভেতর থেকে পর পর দশ-বারোটা ধোঁয়ার বৃত্ত ছুঁড়ে একসময় বলল, 'ঘুমের ব্যাপারে আমার নবাবিয়ানা আছে। বিছানা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় দুপুর গড়ায়। সেদিন ভোর-রাত্তিরে যে দরজা খুলে দিয়েছে, পরের দিন ঘুম ভাঙতেই তার খোঁজ করলাম। শুনলাম, পাকিস্তান থেকে তুমি এসেছ। দুই আর দুইয়ে চারের মত ধরে ফেললাম আমার সেভিয়ারটি কে? কিন্তু সেদিন আমার সময় ছিল না, আজ তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানতে এসেছি।'

এবারও আমি কিছু বললাম না।

কী যেন ভেবে বিমল বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল ভাই।'

'বলুন—'

'তুমি তো একতলায় এই ঘরটায় থাকো; পজিসনটা কিন্তু বেশ চমৎকার!'

বিমলের সাদামাটা কথাগুলোর পেছনে কোন্ গূঢ় গহন ইঙ্গিত আছে বুঝতে পারলাম না; আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

বিমল বলতে লাগল, 'তুমি ভাই আমার কাছে হেভেন-সেন্ট। নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছ রাত্তিরে ফিরতে ফিরতে আমার প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। আমি এসে আর মঙ্গলকে তেল মাখাব না; সোজা তোমার জানলায় টোকা দেব। তুমি টুক করে উঠে দরজাটা খুলে দেবে। এই উপকারটা কিন্তু করতেই হবে ভাই।'

সেদিন যা ভেবেছিলাম তাই হল। বিমলের দিক থেকে এইরকম একটা প্রস্তাব যে আসবে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় ছিলাম; শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটা এসেও গেল।

এ বাড়ির তিন ছেলেই রাতের পাখি ; বাইরে অনেকখানি সময় নিশিযাপন না করে তারা বাড়ি ফেরে না।

বিমল তো দরজা খুলে দিতে বলছে। তার আগে অমল আর রিন্টুও ঐ একই অনুরোধ জানিয়ে গেছে। এদিকে পিসেমশাই ছেলেদের সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছেন।

আমি যেন দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পিসেমশাইয়ের অবাধ্য হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ; আবার তাঁর ছেলেদের চটাতেও সাহস হয় না। তা ছাড়া অমল, বিমল বা রিন্টু—আমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং আমার প্রতি তাদের মনোভাব সহৃদয়, প্রীতিপূর্ণ।

আমাকে চুপচাপ দেখে বিমল তাড়া লাগাল, 'কি ভাই, এই উপকারটুকু করবে না ?'

খানিক ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত স্বরে পিসেমশাইয়ের নিষেধাজ্ঞার কথা বললাম।

সব শুনে বিমল বলল, 'ওল্ড ফেলা এই সব বলেছে বুঝি ! আমার বাবাটি একের নম্বর মরালিস্ট। সুনীতি-টুনীতি বলে কি যেন ভাল ভাল কথা আছে, ভদ্রলোক তার ভেতর নিজেকে পুরে রেখেছেন। আজকের ওয়ার্ল্ডে এই সব লোক চলে না। সে যাক গে ; কিছু ভয় নেই। চুপিচুপি এসে ডাকব, বুড়ো টেরও পাবে না।'

আমি হতবাক। পিসেমশাইয়ের তিন ছেলের পিতৃভক্তির সত্যি তুলনা নেই। কেউ বলে ওল্ড ম্যান, কেউ ওল্ড ফেলা, কেউ মেশিনগান ! যে পরিবেশে, মানসিকতার যে বলয়ে জীবনের প্রথম বাইশ-তেইশটা বছর কাটিয়েছি সেখানে বাবা-মা সম্বন্ধে এজাতীয় মন্তব্য অকল্পনীয়,আমার বিমূঢ়তার তাই তুলনা নেই।'

দুই আগুনের কোনটার আঁচই যাতে গায়ে না লাগে সেই ভাবে সন্তর্পণে পা ফেলা বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। ভয়ে ভয়ে স্খলিত স্বরে বললাম, 'আচ্ছা।'

আমার হাই উঠছিল। চোখেরপাতায় কেউ বুঝি মণ তিনেক ওজন ঝুলিয়ে দিয়েছে। সে দুটো আর মেলে রাখতে পারছি না। সারাদিনের ক্লান্তি অবসাদ আর তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া তার বৃত্তকে ক্রমশ আমার চারদিকে ছোট করে আনতে লাগল।

এতক্ষণে আমার সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হল যেন বিমল। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে !'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে উত্তর সারলাম।

যেজন্য আসা তা তো চুকেই গেছে। আমার ইচ্ছা বিমল এবার আমাকে মুক্তি দিক। আমি শ্রান্ত জানা সত্ত্বেও বিমলের দিক থেকে তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

বিমল বলল, 'আজ বাড়ি থেকে বেরুইনি, স্রেফ তোমার সঙ্গে গল্প করব বলে। সারাদিন কোথায় কাটিয়ে এলে? এখন টায়ার্ড বললে তো চলবে না!'

আমি ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও বিমল দেখছি সহজে আমাকে রেহাই দেবে না। মনে মনে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

বিমল কি ভেবে উৎসাহের স্বরে আবার বলল, 'দাঁড়াও, তোমার টায়ার্ডনেস এক্ষুণি ছুটিয়ে দিচ্ছি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে।

অমি শুধোলাম, 'কিভাবে?'

'আমার ঘরে স্বর্গের সুধা আছে, নিয়ে আসছি।'

ইঙ্গিতটা খানিক বুঝে খানিক না বুঝে ভীত-শিহরিত স্বরে প্রতিধ্বনি করলাম, 'স্বর্গের সুধা!'

'ইয়েস, ইয়েস—', চোখেমুখে আলো জ্বেলে বিমল ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ব্র্যাণ্ডি হে, ব্র্যাণ্ডি!'

আমি যুগপৎ চমকে এবং আঁতকে উঠলাম, ব্র্যাণ্ডি! না না, ওসব আপনাকে আনতে হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ মুখভঙ্গি করল বিমল, 'তুমি যে আশ্রমবালক, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সিগারেট খাও না, তা আবার ব্র্যাণ্ডি!'

আমি চুপ করে রইলাম।

বিমল বলতে লাগল, 'ভেবেছিলাম তোমাকে চাঙ্গা করে তুলে গল্পটল্প করব।'

বুঝলাম, সে এ ঘর থেকে নড়তে চায় না। ঘুমটা আজ নেহাতই জলাঞ্জলি দিতে হবে। ভদ্রতার খাতিরে বলতেই হল, 'বেশ তো, বসুন না।'

বিমল আবার চেয়ার দখল করল।

কিছুক্ষণ এলোমেলো অসংলগ্ন কথার পর হঠাৎ বিমল বলল, 'বাবার কাছে শুনছিলাম, তুমি নাকি চাকরি খুঁজছ?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম, 'পাকিস্তানে থাকা সম্ভব না। বাবা-মা ছোট বোনটা দেশেই রয়েছে এখন পর্যন্ত। আমি চাকরি পেলে ওদের নিয়ে আসব।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না বিমল। চোখ অর্ধেক বুজে কি এক ভাবনার গভীরে ডুবে গেল। বেশ খাণিকটা পর বলল, 'চাকরির ব্যাপারে তুমি সীরিয়াস?'

'মানে?'

'সত্যিই চাকরি করবে?'

'নিশ্চয়ই। সেজন্যেই তো আমার ইণ্ডিয়ায় আসা।'

'কিছু মনে করো না, কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

'বি-এ পাস করেছি। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল; সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছি।'

'ভেরি গুড। কাল বিকেলে তোমার কোন এনগেজমেন্ট নেই তো?'

'না।'

'তা হলে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। ঠিক পাঁচটায়। তুমি রেডি থেকো; আমি এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

একটা চাকরি পেয়ে যাব। নিমেষে আমার শিথিল স্নায়ুগুলো কষে-বাঁধা ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে গেল। সমস্ত সত্তার ভেতর দ্রুতবহ ঝড় বইতে লাগল। সারাদিনের যে ক্লান্তি অবসাদ আর মানসিক প্রতিক্রিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এখন আর তা নেই। চাকরি শব্দটা আমার অস্তিত্বে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছে।

রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। গা ঝাড়া দিয়ে বিপুল আগ্রহে বললাম, 'নিশ্চয়ই আমি রেডি হয়ে থাকব।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা হল। তারপর শীতের রাতটাকে তৃতীয় প্রহরের দেউড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিমল বিদায় নিল।

এগারো

পরের দিন সারাটা সকাল তিন-চারখানা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কাটিয়ে দিলাম। বিমল অবশ্য চাকরির ব্যাপারে ভরসা দিয়েছে। তবু খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন না দেখে পারি না; ওটা আমার নিত্য কর্মপদ্ধতির ভেতর পড়ে গেছে।

যাই হোক, আমার যোগ্যতার মাপে কোন কাজের হদিসই পাওয়া গেল না। ছাই উড়িয়ে উড়িয়ে কে যেন পরশ পাথর খুঁজে বেড়াত; আমার হয়েছে সেই অবস্থা। সারা সকালবেলাটা ছাপার অক্ষর হাঁটকানোই সার হল।

দুপুরবেলা চান-খাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে অলস চোখে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছি। একঝাঁক ফড়িং ফুলের গাছগুলো ঘিরে উড়ছে; পাঁচিলের ওপর ক'টা শালিক নাচানাচি করছে; শীতের মলিন রোদ ক্রমশ হলুদ হয়ে আসছে—সেই সময় মঙ্গল এল।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার মঙ্গলদা ?'

'কত্তাবাবু আপনাকে একবার ওপরে যেতে বলেছেন।'

'এখনই ?'

'হ্যাঁ।'

শীতের দুপুর, ঠাণ্ডা হিম-হিম রোদ, শালিক আর ফড়িংদের নাচানাচি ওড়াওড়ি বাগানের প্রান্তে ফেলে রেখে উঠে পড়লাম। তারপর মঙ্গলের সঙ্গে পায়ে পায়ে দোতলার দিকে রওনা হলাম।

যেতে যেতে বললাম, 'তুমি কিছু জানো মঙ্গলদা ?'

'কী ?' মঙ্গল শুধলো।

'পিসেমশাই কেন আমাকে ডেকেছেন ?'

'না।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। নিঃশব্দে দুজনে দোতলা পর্যন্ত এলাম। তারপর মঙ্গল বাঁদিকে ঘুরে চলে গেল। আমি দক্ষিণের শেষপ্রান্তে এসে পিসেমশাইয়ের ঘরে ঢুকলাম।

পিসেমশাই একখানা বইয়ের ভেতর ধ্যানস্থ হয়ে ছিলেন; মলাটে নাম লেখা ছিল—হিস্ট্রি অফ্ ফিলজফি—দর্শনের ইতিহাস।

আমাকে দেখে বইখানা মুড়ে ফেললেন পিসেমশাই। বললেন, 'বোসো।'

নীরবে একখানা সোফায় নিজেকে সঁপে দিলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'টাইপ জানো ?'

আস্তে করে ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি না।

একটু চুপ করে থেকে পিসেমশাই বললেন, 'ওটা শিখে ফেল, কাজ দেবে।'

অস্ফুট স্বরে বললাম, 'আচ্ছা।'

পিসেমশাই এবার কি ভেবে বললেন, 'তুমি যেদিন এলে সেদিন একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে ?'

সেদিন অনেক কথাই বলেছিলেন পিসেমশাই। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে কোনটা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছেন বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞাসু চোখে আমি তাকিয়ে রইলাম।

আমার মনোভাব বোধ হয় বুঝতে পারলেন পিসেমশাই। বললেন, 'আমার কিছু কিছু কাজ তোমাকে করে দিতে বলেছিলাম, মনে আছে ?'

মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সকালের দিকে ঘণ্টা দুয়েকের মত খাটতে হবে। আপত্তি আছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'তুমি ক'টা নাগাদ ওঠো?'

'সাড়ে পাঁচটার ভেতর।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি তো বেশ আর্লি রাইজার। ভালই হল, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় আমার ঘরে চলে আসবে; সাড়ে আটটায় ছুটি। রোজ আসতে হবে না। যেদিন আমার দরকার হবে, তার আগের দিন খবর দেব।'

পিসেমশাইয়ের ঘরে কী কী করতে হবে, আমার জানা নেই। বললাম, 'আচ্ছা।'

পিসেমশাই বললেন, 'তা হলে কাল থেকেই শুরু করে দাও।'

একটু চুপচাপ। তারপর পিসেমশাই বললেন, 'ভাল কথা, এই কাজের জন্যে তোমাকে কত দিতে হবে?'

যেখানে আশ্রয় পেয়েছি সেখান থেকে সামান্য পরিশ্রমের দাম আদায় করে নেব, আমার পক্ষে তা অভাবনীয়। বিব্রত মুখে বললাম, 'না-না, ওর জন্যে—'

'তুমি না বললে তো হবে না; আমি কারোকে বিনা মজুরিতে খাটাই না। নিজের ছেলে হলেও না। বল, কত নেবে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'তোমার যখন লজ্জা হচ্ছে, আমিই বলি। মাসে তুমি ষাট টাকা করে পাবে। পোষাবে তো?'

আমি এবারও নীরব।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'তা হলে ঐ কথাই রইল; এখন যাও। কাল একবার এসো; কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায়।'

আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

* * *

পাঁচটার অনেক আগেই বিমল এসে হাজির। পরনে ব্যাকরণসম্মত বিলিতি পোশাক; প্যান্ট-কোট-টাইতে নিখুঁত সাহেবটি সেজে এসেছে। পোশাকের মর্যাদা রাখতেই খুব সম্ভব ইংরেজিতে বলল, 'পারহ্যাপস আই অ্যাম এ বিট আর্লিয়ার। খানিকটা আগেই এসে পড়েছি।'

আমি বললাম, 'ও ঠিক আছে।'

'ঘরে বসে থেকে আর কী হবে; চল এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

'চলুন।'

আমি উঠে পড়লাম। পা থেকে আমার মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে

একবার দেখে নিল বিমল। ক্রমশ তার চোখ কুঁচকে যেতে লাগল।

বিমলের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের দিকে চোখ ফেরালাম। মোটমুটি ফর্সা একখানা ধুতি আর ফুল শার্ট আমার পরনে। বিমল বলল, 'তোমার প্যান্ট-ট্যান্ট নেই ?'

অপরাধীর মত মুখ করে বললাম, 'না।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল বিমল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, চল।'

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় এসে একটা সাইকেল রিকশা নিল বিমল। ছোটবড় অনেকগুলো গলি আর রাস্তা পেরিয়ে একখানা নতুন একতলা বাড়ির সামনে এসে যখন পৌঁছলাম সূর্যটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ; পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে পাখিরা সাঁতার কাটছিল তাদের মনও উড়ুউড়ু ; ঘরে ফেরার সময় হয়েছে।

সামনের দিকে সমান-করে-ছাঁটা ঘাসের লন, মরসুমী ফুল, নুড়ির পথ, মাধবীলতা—নতুন বাদামী রঙের ঝকঝকে বাড়িখানা পেছনদিকে। সব মিলিয়ে চমৎকার নয়নাভিরাম একখানা ছবি।

বিমলের পিছু পিছু ভীরু পায়ে সন্তর্পণে নুড়ির পথ মাড়িয়ে বাড়িটার কাছে চলে এলাম। কলিং বেলের বোতাম টিপতেই যিনি দরজা খুললেন তাঁকে দেখামাত্র আমার সমস্ত স্নায়ু ঝিম ঝিম করে উঠল ; এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মত আমার অস্তিত্বে কি যে প্রতিক্রিয়া হতে লাগল বলতে পারব না।

মহিলাটিকে আগেই দেখেছি। চোখেমুখে ধারাল দীঘল টান, সর্বাঙ্গে অন্তগামী রূপ আর আকর্ষণের অস্ত্রগুলি পর পর সাজানো। না, কোন ভুল নেই, ক'দিন আগে এক সকালে কবিরাজের বাড়িতে নিতান্ত অভাবিত ভাবে এঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'বিমল যে, এসো এসো। তারপর পথ ভুল করে নাকি ?' বলতে বলতে আমাকে দেখতে পেলেন। মুহূর্তে উচ্ছ্বাসটা থমকে গেল ; মহিলার দৃষ্টি ঈষৎ তীক্ষ্ণ এবং চকিত হয়ে উঠল। অস্ফুট ফিস-ফিসানির মতো করে বললেন, 'এ কে ?'

বিমল শুধাল, 'কার কথা জিজ্ঞেস করছেন অলকাদি ?' বলেই তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমাকে দেখতে পেল, 'ও আমার মামাতো ভাই।'

মহিলার নাম তবে অলকা। তিনি বললেন, 'ওঁকে যেন আগে কোথায় দেখেছি ; ঠিক মনে করতে পারছি না। কোথায় দেখেছি বলুন তো

আপনাকে ?' জিজ্ঞাসু চোখে মহিলা আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, 'ভূষণবাবুর ওখানে।'

'কোন্ ভূষণবাবু ?'

'ঐ যে যিনি ছেলেমেয়েদের পাইকারি দরে মাথা কামিয়ে দিচ্ছিলেন।'

এবার মনে পড়ে গেল। মহিলা যেন ভেতরে ভেতরে একটু গুটিয়ে গেলেন। হয়তো কিছুটা বিব্রত ; কেননা সেদিনকার স্মৃতি তাঁর পক্ষে খুব মনোরম নয়। নিস্পৃহ স্বরে বললেন, 'ও—'

বিমল অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে বলল, 'আপনাদের আগেই আলাপ-টালাপ হয়ে গেছে নাকি ?'

মহিলা বললেন, 'আলাপও হয়নি, পরিচয়ও হয়নি। আমরা দু'জন দু'জনকে দেখেছি শুধু।'

বিমল বলল, 'ভূষণ মানে আমাদের কবিরাজ—যিনি বলে যার একটা বিউটিফুল মেয়ে আছে ?'

চোখের পাতায় বিদ্যুৎ হেনে কেমন করে যেন হাসলেন মহিলা। রক্তাভ নরম ঠোঁটে দুটি ঝকঝকে দাঁত বসিয়ে মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ফিস-ফিসিয়ে বললেন, 'ইয়াস।'

'বাপটা বনমানুষ-মার্কা কিন্তু মেয়েটি খাসা। ঐ বাপের ঐ মেয়ে, দেখেও বিশ্বাস হয় না।'

'যা বলেছ। তবে—'

'কী ?'

'ভূষণ কবিরাজকে কমপ্লিমেণ্টস দিতে হয় ; পৃথিবীকে ঐ রকম একটা সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছে।'

'রীয়ালি !' বিমল বলতে লাগল' 'আর বাপকে নিয়ে আমাদের "হেডএক"-টাই বা কিসের ? মেয়েটিকে—', কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল সে।

বিমলের গালে আস্তে তর্জনীর টোকা দিয়ে মহিলা বললেন, 'নটি বয়।'

একটু চুপ। তারপর বিমল বলে উঠল, 'কি ব্যাপার অলকাদি, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি ? ভেতরে যেতে বলবেন না ?'

মহিলা লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললেন, 'ওমা, তাই তো। এসো তোমরা এসো।'

পর্দা ঠেলে সামনের ঘরে ঢুকলেন মহিলা ; আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম।

ঘরখানি চমৎকার সাজানো। সোফা, কৌচ, ডিভান, দরজায়-জানালায়

রুচি-শোভন পর্দা। দেওয়াল-ছাদ ডিস্টেম্পার করা। দুটো ঝকঝকে কাঁচের আলমারি চোখে পড়ল ; দেশ-বিদেশের নানারকম পুতুল। আরেকটাতে বই। বইগুলো কেউ কোনদিন খুলে দেখেছে বলে মনে হয় না ; চিরদিন ওগুলো অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট থেকে যাবে বুঝিবা। বই যে গৃহসজ্জার উপকরণ হতে পারে, ধারণা ছিল না। মাঝখানে একটা ত্রিকোণ পিলার ঘিরে দুষ্প্রাপ্য অর্কিডের টব বসানো। দেওয়ালে যামিনী রায়ের ছবি, সুদৃশ্য ওয়াল ক্লক—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহিলা বললেন, 'বসো।'

আমরা সোফায় বসে পড়লাম ; মহিলা একটি শ্রীনিকেতনী মোড়া টেনে মুখোমুখি বসলেন।

সেদিন সকালেই লক্ষ্য করেছিলাম মহিলার বয়েস অনেকদিন আগেই তিরিশ পেরিয়েছে। অস্তদিনেও না, মধ্যদিনেও না—দুয়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তাঁর রূপ থমকানো। উপমা দিয়ে বলা যায়, তাঁর দেহে বর্ষার ঢল আর নেই। আষাঢ়-শ্রাবণের প্লাবনে ভাদ্র-আশ্বিনের স্তব্ধতা এসেছে ; দু'চার বছরের ভেতরেই সেখানে যুগপৎ শীতের আর ভাঁটার টান ধরে যাবে হয়তো।

রূপ যাই হোক, শরীরময় আকর্ষণের বস্তুগুলো এখনও রীতিমত শাণিতই। কামের অমোঘ অস্ত্রে যে-কোন পুরুষকে বিদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর অটুট আছে।

বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে মহিলা বললেন, 'তারপর বিমল—'

'বলুন—', বিমল সোজাসুজি তাকাল।

'সূর্য আজ কোন্‌দিকে উঠেছে বলতে পার ?' সেই পুরনো রসিকতাটাই করলেন মহিলা।

'কেন ?'

'তুমি হঠাৎ এ-বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে—'

'বা রে, আমি তো প্রায়ই আপনাদের এখানে আসি।'

'প্রায়ই আসো ? রীযালি ?'

একটু থতমত খেয়ে গেল বিমল, 'প্রায়ই বলতে রোজ না। এই তো দিন দশেক আগে এসেছিলাম।'

'দিন দশেক !' চোখ গোল করে মহিলা বললেন, 'স্মৃতিশক্তির যে রকম নমুনা দেখাচ্ছ তাতে কিন্তু ভয় পেয়ে যাচ্ছি।'

'কি রকম ?'

'দশ দিন না, পাকা দেড়টি মাস পর তুমি এখানে হানা দিলে।'

'কখন আসি কখন যাই, আপনি কি তার দিন-তারিখ হিসেব করে রাখেন ?'

'নিশ্চয়ই।' মহিলা বলতে লাগলেন, 'ডাইরি খুলে দেখিয়ে দেব শ্রীমান বিমল চট্টোপাধ্যায় লাস্ট কবে আমার এখানে এসেছিল !'

বিমল অবাক, 'আপনি ডাইরিতে এসব লিখে রাখেন নাকি ?'

'রাখি বৈকি।'

'তাতে লাভ ?'

'লাভ কতখানি বলতে পারব না। তবে—,'দুই ঠোঁটের ফাঁকে উথলে-ওঠা একটা হাসিকে টিপে টিপে খুন করে ফেললেন মহিলা।

'তবে কি ?' বিমলকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল।

'আমি দেখতে চাই, কতদিন তোমাদের ধরে রাখতে পারি। যদি দেখি ছ'মাসেও একবার আসছ না, বুঝব আমার দাম কানাকড়ি হয়ে গেছে।'

'আপনার হিসেবমত দেড় মাস পর এলাম ; ছ'মাস পর এলে যদি কানা-কড়ি হয়ে যান এখন আপনার দাম কত ?'

'অঙ্ক-টঙ্ক করে পরে বলব।'

বিমল হাসতে লাগল।

মহিলা বললেন, 'থাক, ফাজলামি ঢের হয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বলব।' বলে আমার দিকে ফিরলেন।

আমি তাকিয়েই ছিলাম, এবার স্নায়ুগুলিকে সজাগ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মহিলা বললেন, 'তোমাকে কিন্তু "তুমি" করে বলব, আমার চাইতে বয়েসে ছোটই তো হবে।'

বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তুমিই তো বলবেন। আপনার চাইতে কি, ও আমার চাইতেও ঢের ছোট।'

বিমলের কথার উত্তর না দিয়ে মহিলা আমাকে বললেন, 'তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানি না।'

'আমার নাম চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'আমার নাম অলকা—বিমল আমাকে অলকাদি বলে। তুমিও তাই বলতে পারো।'

ঘাড় কাত করে জানালাম, অলকাদিই বলব।

মহিলা অর্থাৎ অলকাদি বললেন, 'তুমি কোথায় থাকো ? যাদবপুরেই কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওমা, আজ্ঞে-টাজ্ঞে আবার কি ?' অলকাদি গালে তর্জনী স্থাপন করে বললেন, 'আমি তোমার জ্যাঠশাশুড়ী নাকি ?'

ঠাট্টাই, তবু আমার কান গরম হয়ে উঠল। অস্ফুটে কি বললাম, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট হল না।

অলকাদি মোড়া থেকে উঠে একটা সোফায় নিজেকে অর্ধেক ঢেলে দিলেন; বাকি অর্ধেকের ভার রাখলেন একটি হাতের ওপর। তারপর শুধোলেন, 'যাদবপুরে কোথায় থাকো ?'

বললাম।

এবার বিমলের দিকে তাকালেন অলকাদি, 'তোমার একটি মামাতো ভাই তোমাদের বাড়ি থাকে এ কথাটা তো আগে বলনি ?'

'ও তো সবে আমাদের বাড়ি এসেছে; দু-তিন দিন মোটে হল।'

'তার আগে কোথায় ছিল ?'

বিমল সব বলল।

খানিক অন্যমনস্কের মত অলকাদি বললেন, পাকিস্তানে থাকা আর বোধ হয় সম্ভব না। তাই না চিরঞ্জীব ?'

অলকাদির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল না এ ব্যাপারে তাঁর খুব দুর্ভাবনা আছে। আমি ঢাকা থেকে এসেছি; তাই বোধ হয় পাকিস্তানের উল্লেখ করলেন। অলকাদি যে প্রশ্নটা করেছেন সীমান্তের এপারে পা দেবার পর থেকে তার উত্তর আরো অনেকের কাছে দিয়েছি। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'হাঁ।'

এই প্রসঙ্গে অলকাদি আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একটুক্ষণ নীরবতা তারপর বিমলকে বললেন, 'ভালো কথা, খালি বকবকই করছি। কি খাবে বল ? চা, কফি, না অন্য কিছু ?'

'চা ! কফি !' তেতো বড়ি গিলবার পর যেমন দেখায় বিমলের মুখখানা তেমনি হয়ে গেল, 'মাইরি অলকাদি, ফর গড্‌স্ সেক, চা-কফির নাম করবেন না। আপনার কাছে তেষ্টা মেটাতে আসি—'

চোরা চোখে দ্রুত একবার আমাকে দেখে নিয়ে অলকাদি বিমলকে শাসন করলেন, 'আঃ, বিমল তুমি বড্ড বাঁদর হয়েছ ! কাজুবাদাম দিয়ে লক্ষ্মীছেলের মত কফি খাও।'

বিমল কী বুঝল, কে জানে। হতাশ মুখভঙ্গি করে করুণ গলায় বলল, 'দেড়

মাস পর এলাম, কফি খেতে বলছেন ? বেশ।'

আমি ঢাকা জেলার সুদূর অভ্যন্তরে আমতলি নামে এক অখ্যাত নগণ্য গ্রামের ছেলে। ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক—অনেক দূরে সেই সামান্য জনপদটিকে তৃষ্ণা মেটানোর একটিমাত্র পানীয়ই আমাদের জানা, তার নাম জল। চায়ে না, কফিতে না—অন্য কোন্ তরলে বিমলের পিপাসা মেটে কে বলবে। বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম।

কফি এল, কাজুবাদাম এল। খাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। নাকের সামনে চাকরির টোপ ঝুলিয়ে এ আমাকে কোথায় নিয়ে এল বিমল! এই সুসজ্জিত চমৎকার ঘরে এক মোহময়ীর মুখোমুখি আরামদায়ক সোফায় শরীর সঁপে দিয়ে কফি আর কাজুবাদাম খেতে খেতে কোন্ স্বর্গলোকের চাবি হাতের মুঠোয় এসে যাবে, জানি না। অন্তত জীবিকার সন্ধান যে এখানে পাব না, সে ব্যাপারে আমি নিঃসংশয়।

কফিতে ছোট্ট চুমুক দিয়ে অলকাদি বললেন, 'তারপর বিমল—'

'বিমল তক্ষুণি সাড়া দিল, 'কি বলছেন ?'

'এতকাল পর হঠাৎ কি মনে করে ?'

'একটা বিশেষ দরকারে এসেছি অলকাদি।'

'বিনা উদ্দেশ্যে যে আসোনি তা বুঝতে পেরেছি ; তেমন সৌভাগ্য আমার নয়। কি দরকার বলে ফেল।'

একটু ইতস্তত করে বিমল বলল, 'চিরঞ্জীবের জন্যেই আপনার কাছে আসা।'

'বেশ তো—', অলস শিথিল শরীর আস্তে আস্তে তুলে সোজা হয়ে বসলেন অলকাদি। তাঁর দু-চোখে যুগপৎ কৌতূহল এবং প্রশ্ন।

খুক্ খুক্ কেসে গলা পরিষ্কার করে নিল বিমল। তারপর বলল, 'চিরঞ্জীবকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে হবে।'

'চাকরি ?'

'ইয়েস।'

একটা চাকরি পেলে আমি বেঁচে যাই ; বাবা মা সবিতাকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসে বাঁচাতে পারি। আমাদের প্রাণ-ভ্রমরা তা হলে এই মহিলাটির হাতে! উৎকর্ণ হয়ে আমি বসে থাকলাম।

অলকাদি বললেন, 'তুমি তো আমায় বিপদে ফেললে ভাই—'

বিমল শুধলো, 'কি রকম ?'

'চাকরি কি আমার হাতে যে দিয়ে দেব—'

'চাকরি আপনার হাতে নেই জানি। তবে—'

'তবে কি?'

'যাদের হাতে চাকরি তারা আপনার হাতে। হাতে কেন তারা আপনার আঁচলে বাঁধা।'

অলকাদি উচ্ছল গলায় বললেন, 'কি যে বলো ভাই, তার ঠিক নেই। চাকরি দেবার মালিকেরা নাকি আমার আঁচলে বাঁধা!'

তোষামোদের সুরে বিমল বলতে লাগল, 'আপনার কাছে যারা আসে, একটা আঙুল তুলে যদি তাদের বলেন, আগুনে ঝাঁপ দাও, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝাঁপ দেবে। যদি বলেন সাগরে লাফিয়ে পড়; তারা সাগরে লাফাবে। যারা প্রাণ দিতে পারে তারা আপনি বললে একটা চাকরি দেবে না?'

চোখের তারা নাচিয়ে সারাদেহে বিচিত্র সংকেত ফুটিয়ে অলকাদি বললেন, 'যারা আসে আমার কথায় প্রাণ দিতে পারে বলছ?'

'সিওর।'

'তুমি পার?'

'পরীক্ষা করতে পারেন।'

'মনে রইল। যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে।'

বিমল বলল, 'আমি সব সময় প্রস্তুত।'

'দেখা যাবে।' অলকাদি হাসতে লাগলেন।

স্তুতিতে তোষামোদে দেবী সন্তুষ্ট; যে কোন মুহূর্তে একটা বর দিয়ে বসা আশ্চর্য কিছু নয়। বিমল সুযোগটা ছাড়ল না, 'আপনি যদি সদয় হন একটা ফ্যামিলি বেঁচে যায়।'

বাধা দিয়ে অলকাদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সদয়-টদয়, ও কি কথা! চিরঞ্জীবের জন্য আমি চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা-টেষ্টা না, চাকরি একটা দিতেই হবে। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।'

'তাড়াতাড়ি বলতে?'

'আজ হলে আজই। এখন হলে এখনই।'

অলকাদি হেসে বললেন, 'এখন আর কোত্থেকে দিচ্ছি। আসছে উইকে একবার খোঁজ নিও, কেমন?'

'আচ্ছা।' বিমল ঘাড় কাত করল।

এরপর এলোমেলো অসংলগ্ন কথায় আরো অনেকটা সময় কাটিয়ে দিনের আয়ু কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে আমরা উঠে পড়লাম।

অলকাদি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আলাপ-টালাপ হল। সময় পেলে মাঝেসাঝে এসো।'

জানালাম আসব। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মহিলাকে যখন প্রথম দেখি তখন থেকেই বিচিত্র এক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছিল। ভেবেছিলাম, ভূষণের বাড়ি সেই দেখাই শেষ দেখা। কিন্তু নিতান্ত অভাবনীয়ভাবে তাঁর সঙ্গে যে আবার যোগাযোগ ঘটবে, তাঁর হাতেই যে আমার জীয়নকাঠি রয়েছে, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল? আমার পক্ষে তা ছিল, অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত।

বিমল তাঁর নামটাই শুধু বলেছে—অলকা, অলকাদি। কিন্তু কী তাঁর সামাজিক পরিচয়, তিনি কী করেন, সে-সব কিছুই বলেনি। বিমলের কথা থেকে যেটুকু ইঙ্গিত পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে সমাজের উচ্চ-চূড়োর বাসিন্দাদের সঙ্গে অলকাদির রীতিমত ঘনিষ্ঠতা আছে। সে ঘনিষ্ঠতা কী সূত্রে আমার জানা নেই। বিমলের সঙ্গেই বা তাঁর সম্পর্ক কী, বুঝতে পারিনি। তবে দুজনের ভেতর রহস্যময় অন্তরঙ্গতা যে আছে, অনায়াসেই টের পাওয়া যায়।

সে কৌতূহলটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল যেন। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একসময় দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'আচ্ছা বিমলদা—'

বিমল দূর আকাশে কি দেখতে দেখতে যাচ্ছিল; ফিরে তাকাল, 'কী বলছ?'

'মহিলাটি কে?'

'কেন, অলকাদি!'

'নামটা তো জানিই। বলছিলাম—,' বলতে গিয়েও চুপ করে গেলাম।

আমার না-বলা কথার মধ্যে একটা অনুচ্চারিত প্রশ্ন ছিল, সেটা বোধ হয় ধরতে পারল বিমল। বলল, 'বুঝেছি। কিন্তু—'

'কী?'

'মুখে বলে অলকাদির পরিচয় কতটুকু দিতে পারব? আর এক-আধদিন দেখে তাঁকে বোঝাও যায় না। অলকাদি তো তোমাকে মাঝে মাঝে আসতে বলল। আসতে থাকো, আসতে আসতেই একদিন তাঁকে চিনে ফেলবে; ওঁকে বুঝতে আমাদেরও অনেকদিন লেগেছিল।'

আমি চুপ করে রইলাম।

বিমল আবার বলল, 'একটা কথা শুধু তোমাকে বলতে পারি।'

অসীম আগ্রহ নিয়ে তাকালাম।

বিমল বলল, 'অলকাদিকে আমাদের প্রাণ-ভ্রমরা বলতে পার। সে না থাকলে যাদবপুরের অনেকেই আত্মহত্যা করে বসবে। সী ইজ দি হার্টথ্রব অব দিস লোকালিটি।'

ভয়-বিস্ময়-আকর্ষণ সব মিলিয়ে কি একটা সংকেত আমার স্নায়ুর ওপর ঝড় বইয়ে দিতে লাগল।

*　　　*　　　*

অলকাদিদের ওখান থেকে বাড়ি ফিরতে প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল সে মঙ্গল। মঙ্গল বলল, 'এই যে দাদাবাবু, কোথায় গিছলেন? আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান।'

বললাম, 'একটু দরকারে বেরিয়েছিলাম। খুঁজছ কেন?'

'এক ভদ্রলোক আপনার জন্যে দু-ঘণ্টা ধরে ধন্না দিয়ে আছে।'

'কে বল তো?'

'চিনি না। আপনার ঘরে বসিয়ে রেখেছি।'

বিমল সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে গেল, আর আমি লম্বা লম্বা পায়ে এক-তলায় নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরে পা দিয়ে আমি অবাক। সুরেশ বসে আছে। পরশু দিন অমল তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে; তার সর্বহারা সমিতি দেখিয়ে এনেছে।

এত তাড়াতাড়ি সুরেশ আমার খোঁজে আসবে, ভাবতে পারিনি। আমার কাছে তার কি প্রয়োজন, বুঝতে পারছি না। তবে ব্যাপারটা যে বিশেষ জরুরী অনুমান করা যাচ্ছে। নইলে ঝাড়া দেড়-দু ঘণ্টা সময় আমার জন্য সে বসে থাকবে কেন?

আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুরেশ, 'এই যে ব্রাদার, আসছ! তোমার লেইগা কতক্ষণ বইসা আছি জানো—'

'মঙ্গলের কাছে শুনেছি, অনেকক্ষণ এসেছেন;' মুখোমুখি একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'নিশ্চয়ই।' সুরেশ মাথা নাড়ল, 'না হইলে দ্যাড়-দুই ঘণ্টা বইসা আছি?'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

কেসে গলা সাফ করে নিয়ে সুরেশ আবার বলল, 'আইজ তো বুধবার—'

'হ্যাঁ।'

'শনিবার যাদবপুর থিকা একটা মিছিল বাইর হইব।'

'কিসের মিছিল ?'

'বাস্তুহারাগো (বাস্তুহারাদের)।'

আমি চুপ করে রইলাম।

সুরেশ বলতে লাগল, 'বিরাট ভাবে অর্গানাইজ করতে আছি, বুঝলা ? এই যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জে যত বাস্তুহারা আছে, কেউ সেদিন ঘরে থাকব না ; সগলে মিছিলে বাইর হইব।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল, ট্রাম-বাস-লরী-মোটর সগল সেদিন বন্ধ হইয়া যাইব ; কইলকা তা শহরের লাইফ একেবারে অচল কইরা ছাড়ুম।'

খানিক ইতস্তত করে বললাম, 'মিছিল বার করবেন কেন ?'

মুঠো পাকিয়ে হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে সুরেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দাবী, দাবী আদায় করতে যামু।'

'কিসের দাবী ?'

আমার অজ্ঞতায় যেন হতবাক হয়ে গেল সুরেশ। কিছুক্ষণ নিষ্পলকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমাগো, এই যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জ এলাকার বাস্তুহারাগো উপর গভর্নমেন্ট কত বড় অন্যায় করতে আছে তুমি জানো ?'

আমাকে জানাতে হল, জানি না।

সুরেশের উত্তেজনা এবার শীর্ষবিন্দুতে পৌছুল। তীক্ষ্মস্বরে সে বলল, 'এই সব জায়গায় আগে ছিল বন আর বিল ; শিয়াল-সাপ-শুয়োরের আস্তানা। মানুষ এদিকে আসত না। আমরা আইসা বন কাইটা সাপ-শিয়াল মাইরা শরীলের রক্ত জল কইরা কলোনী বসাইছি। অখন এর মালিক বাইর হইয়া পড়ছে ; ঘরে আগুন দিয়া পিছনে গুণ্ডা লাগাইয়া আমাগো উৎখাত করতে চায় কিন্তুক তা আমরা হইতে দিমু না।'

এ অঞ্চলে উপনিবেশ পত্তনের ইতিহাস কিছু কিছু শুনেছি। সীমান্তের ওপার থেকে যেদিন এখানে আসি তার পরদিনই একটা উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়ে সে-কথা শুনে এসেছি। কিন্তু গভর্নমেণ্ট কিভাবে অন্যায় করছে তা আমার অজানা। জানি না বলে কিছুটা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সুরেশ খাড়া হয়ে বসল। সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এই যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জে কতদিন হইল রিফিউজি কলোনী বসছে, তুমি জানো ?'

'না।'

'নাইনটিন ফরটি এইটের শ্যাষাশেষি থিকা।'

'তার মানে তিন-চার বছর!'

'হ।' সুরেশ ঘাড় কাত করল, 'এতদিন আমরা এখানে আছি কিন্তুক স্বত্ব অখনও পাকা হয় নাই। অথচ পতিত অনাবাদী জমি আর বনজঙ্গল বিল— কোনদিন এই সব কারো কামে লাগত না। গভর্নমেণ্ট ভরসা দিছিল যত জবর-দখল কলোনী আছে আইন কইরা লীগেলাইজ করব; আমরা এর স্বত্ব পামু। অবশ্য খালি হাতে না; এর জন্যে আমরা ন্যায্য যা দাম লাগে, দিমু। কিন্তুক সরকার নাকের সামনে প্রতিশ্রুতিখান ঝুলাইয়াই রাখছে; এর বেশি আর কিছুই করে নাই।'

একটু চুপ।

সুরেশ বলতে লাগল, 'অনেক আবেদন নিবেদন করছি, দিনের পর দিন অনেক ধরনা দিছি। যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জ থিকা কতবার যে রিপ্রেজেণ্টেশন পাঠাইছি তার হিসাব নাই। কিন্তুক সরকারের এক কথা, সবুর কর, সবুর কর। কতকাল সবুর করা যায় কও?'

অস্পষ্ট গলায় বললাম, 'তা তো বটেই।'

'স্বত্ব নাই তবু আমরা হাজার হাজার রিফিউজি এই জায়গার মাটি কামড়াইয়া পইড়া আছি; আমাগো অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। স্বর্গেও না, মর্তেও না—শূন্যে ঝুইলা রইছি। কিন্তুক এইভাবে কতকাল থাকা যায়! প্রতিশ্রুতির ফাঁকা আওয়াজের উপুর আর ভরসা রাখা সম্ভব না।'

এবার আমি কিছু বললাম না।

সুরেশ বলতে লাগল, 'আবেদন-নিবেদন আর হাতেপায়ে ধরাধরি অনেক হইছে, এ পথে আর না। দাবীটা এইবার অন্যভাবে আদায় করতে হইব।'

'কিভাবে?'

চোখের তারা দপদপিয়ে উঠল, সুরেশের, 'লড়াই কইরা, যতদিন না দাবীটা আদায় হয় আমাগো লড়াই থামবো না।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর সুরেশ বলল, 'তোমার কাছে যে জন্যে আসা এইবার কই।'

আমি উন্মুখ হলাম।

সুরেশ বলল, 'শনিবার তুমি আমাগো লগে মিছিলে যাইবা। কারণ—'

আমি তাকিয়েই আছি।

সুরেশ বলল, 'কারণ তুমি বাস্তুহারা; টাটকা টাটকা দ্যাশ ছাইড়া আসছ।

দাবী আদায় করতে তোমারও যাইতে হইব।

মিছিল শব্দটা আমার কাছে অপরিচিত কিছু নয়; মিছিল দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে। দেশে থাকতে ঢাকায় গিয়ে বারকয়েক জন্মাষ্টমী আর মহরমের মিছিল দেখে এসেছি। কিন্তু সে-সব নিতান্তই শোভাযাত্রা। বিশেষ করে জন্মাষ্টমীর মিছিল আমার কাছে রমণীয় স্বপ্নের মত। মানুষ-গাড়ি-ঘোড়া-হাতী —চতুরঙ্গে সুসজ্জিত সেই অন্তহীন প্রবাহ কোনদিন ভুলবার নয়; আমার স্মৃতির ভেতর বিচিত্র সম্মোহের মত তা মিশে আছে। মহরমের মিছিলও বেশ জমকালো।

কিন্তু মিছিল করে কিভাবে দাবী আদায় করা যায় আমার কাছে তা অভাবনীয়। কৌতূহল এবং সংশয়, মনের দুই বিপরীত প্রান্তে দোল খেতে খেতে বললাম, 'যাব। কিন্তু—'

'কী?'

'মিছিল বার করে কিভাবে দাবী আদায় করবেন?'

সুরেশ হাসল, 'গেলেই দেখতে পাইবা।'

একটু ভেবে বললাম, 'আরেকটা কথা—'

'কও।'

'আপনারা তো যাবেন কলোনী লীগেলাইজ করতে; আমি কলোনীতে থাকি না। শুধু শুধু আমি গিয়ে—'

আমার অনুচ্চারিত কথাগুলোর ভেতর একটা প্রশ্ন ছিল। সুরেশ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'খালি কলোনীর ব্যাপারেই যামু না; ঐটাই অবশ্য "মেইন" ব্যাপার। তবে অন্য ব্যাপারও আছে। এই মিছিলের লগে সব রিফিউজিরই স্বার্থ জড়াইয়া রইছে। তুমি যখন রিফিউজি তখন তোমার যাওয়া উচিত; নিশ্চয়ই যাইবা। তুমি; আমি, হাজারে হাজারে লাখে লাখে উদ্বাস্তু—সগলে যদি একজোট না হই, কাঁধে কাঁধ না মিলাই তা হইলে আর বাঁচনের আশা নাই।'

সুরেশের কথাগুলো আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনাদের মিছিল কখন কোথা থেকে বেরুবে, তা তো জানি না।'

সুরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'শনিবার দুফৈরবেলা তুমি আমাগো বাস্তু-হারা সমিতির অফিসে চইলা আইসো। মিছিল ঐখান থিকাই বাইর হইব।'

'আচ্ছা।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটু চুপ। তারপর সুরেশ বলল, 'মিছিলের কথা তো হইয়া গেল। তোমার লগে আরো একটা কথা আছে।'

'কী?'

সুরেশ বলল, 'সেদিন তোমার বাড়িঘর জমিজমা এক্সচেঞ্জের কথা কইছিলাম। করবা?

আমি রীতিমত উৎসাহিত হলাম। পাকিস্তানে যখন থাকা হবেই না তখন এই ব্যবস্থা মন্দ কি। দেশে বাড়িঘর খেতখামার আমাদের যা-যা আছে ইণ্ডিয়ায় যদি তা পেয়ে যাই তার চাইতে ভাল আর কী হতে পারে। পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ে যেতে দ্বিধান্বিত সুরে বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'ভারতবর্ষ ছেড়ে যে সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে তেমন কারোকে তো চিনি না।'

'চিনতে হইব না; তুমি রাজী কিনা সেই কথাটাই খালি কও। সব বন্দোবস্ত আমি কইরা দিমু!'

বললাম, 'আমার রাজী হওয়া না-হওয়া বড় কথা নয়; বাবার মতামতটাই আসল। বাবাকে একটা চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি।'

সুরেশ বলল, 'তরাতরিই লিখো, আমার হাতে দুই-চারজন লোক আছে। দেরি করলে তারা অন্য লোকের লগে এক্সচেঞ্জ কইরা ফালাইতে পারে।'

'আজই লিখব।'

'তা হইলে আইজ উঠি ব্রাদার; শনিবার দেখা হইতে আছে।'

'আচ্ছা।' আমি ঘাড় কাত করলাম।

সুরেশ উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

বারো

দিন দুয়েক পরের কথা। আগের রাত্তিরে পিসেমশাই খবর দিয়ে রেখে-ছিলেন। সকালবেলা কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় তাঁর ঘরে হাজিরা দিলাম।

পর্দা ঠেলে আমিও ঘরে পা দিয়েছি, দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হল। আমার সময়নিষ্ঠা পিসেমশাইকে হয়তো খুশীই করল। একবার ঘড়ির

দিকে, পরক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বোসো।'

খুব সন্তর্পণে একটা সোফায় বসে পড়লাম।

উচ্ছ্বসিতও না, আবার নিরুচ্ছ্বাসও নয়, এমন স্বরে পিসেমশাই বললেন, 'সাড়ে ছ'টার সময়ই তো তোমাকে আসতে বলেছিলাম !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সময়-জ্ঞানটা থাকা ভাল ; নইলে মানুষ উন্নতি করতে পারে না।'

'আমি কী বলব, চুপ করে রইলাম।

শীতের এই সকালবেলাটায় এখনও রোদ ওঠেনি। পাতলা নরম সিল্কের মত কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা, আড়ষ্ট। কলকাতার এই সুদূর শহরতলী এখনও ঘুমের আরকে ডুবে আছে। এ বাড়িতে পিসেমশাই, মঙ্গল আর আমি ছাড়া কেউ ওঠেনি। কাল অনেক রাত্তিরে অমল আর বিমল ফিরেছে ; আমিই তাদের গেট খুলে দিয়েছিলাম। তারা কখন উঠবে, আদৌ এ বেলা উঠবে কিনা, কেউ জানে না। রিন্টু কাল কখন ফিরেছে বলতে পারব না ; যখনই ফিরুক, ঘুমের ব্যাপারে দুই দাদা তার আদর্শ। তিন ভাইয়ের একজনও কোন দিন সূর্যোদয় দেখেছে কিনা সন্দেহ। সূর্যটা আকাশের সিকি ভাগ পার না করিয়ে কেউ বিছানা ছাড়ে না।

মঙ্গল যে উঠেছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। নীচের তলায় রান্নাঘর ; সেখান থেকে বাসনের আওয়াজ, চামচ নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে।

পিসেমশাই বললেন, 'চা খেয়েছ ?'

বললাম, 'আজ্ঞে না।'

'তোমার চা তো তোমার ঘরেই দিয়ে আসে মঙ্গল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পিসেমশাই বললেন, 'মঙ্গলকে বলে এসো, আজ যেন এখানে তোমার চা দেয়।'

একতলায় রান্নাঘরে গিয়ে মঙ্গলকে বলে তক্ষুনি ফিরে এলাম। একটু পর মঙ্গল ট্রে-তে কাপ প্লেট সাজিয়ে চা আর খাবার নিয়ে এল।

খেতে খেতে পিসেমশাই বললেন, 'তোমাকে আমার যে সব কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে আগেই একটু আলোচনা করে নেওয়া ভাল।'

আমি উন্মুখ হলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'প্রথমত, আমার কিছু হিসেবপত্তর তোমাকে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাঝে-সাঝে দু-চারখানা চিঠি ড্রাফট করে টাইপ

করতে হবে। তৃতীয়ত, কখনও-সখনও আমি বেরুলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

বললাম, 'আমি তো টাইপ জানি না।'

'তা আমার জানা আছে তুমি আগেও একদিন বলেছিলে।' পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'আমার দুটো টাইপরাইটার মেশিন আছে। সময় করে এসো ; আমি তোমাকে টাইপ শিখিয়ে দেব।'

'আসব।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর পিসেমশাই আবার বললেন, 'আচ্ছা চিরঞ্জীব—'

আমি তাকালাম।

'এ বাড়িতে রত্ন তিনটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?'

ঠিক কাদের কথা পিসেমশাই বলছেন বুঝতে পেরেও দ্বিধান্বিত গলায় বললাম, 'আজ্ঞে—'

পিসেমশাই বললেন, 'আমার ছেলে তিনটির কথা বলছি। পিণ্টু, মিণ্টু আর রিণ্টু ; তাদের ভাল নাম—বিমল, অমল আর নির্মল।'

নিজের ছেলেদের সম্বন্ধে পিসেমশাইয়ের যে অসীম বিতৃষ্ণা, প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। অমল বিমলদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সেদিনই তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তাদের সঙ্গে যে এরই ভেতর আলাপ হয়েছে, কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও তা বলতে সাহস হল না। দ্বিধান্বিত আধফোটা গলায় বললাম, 'আজ্ঞে—'

স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলেন পিসেমশাই। আমার বিব্রত ভাবটা নিশ্চয়ই লক্ষ্যও করেছেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আলাপ-টালাপ তা হলে হয়েছে !'

ফাঁদ-পড়া পাখির মত ছটফট করতে করতে বললাম, 'আজ্ঞে ওরা—'

হাত তুলে বাধা দিলেন পিসেমশাই, 'জানি, তোমাকে আলাপ করতে হয়নি, ওরাই এসে করেছে। ঐ গুণটি আছে ; যেখানেই নিজেকে লুকিয়ে রাখো না—ওরা ঠিক টেনে বার করবে।'

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। আস্তে আস্তে বুকের ভেতরকার আটকানো বাতাস সহজভাবে বার করে দিলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'ঐ তিনটি সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?'

আমার সঙ্গে অমলদের যেটুকু আলাপ-পরিচয় তাতে অভিযোগ করার কিছু নেই। ব্যবহার প্রায় নিখুঁত, ত্রুটিশূন্য। তাদের সম্বন্ধে যদি ভাল বলি, উচ্ছ্বসিত হই, তার প্রতিক্রিয়া পিসেমশাইয়ের ওপর কিরকম হবে বুঝতে পারছি না।

কাজেই চাতুরির খেলা খেলতে হল। বললাম, 'খুব সামান্য আলাপ হয়েছে। তা থেকে ভালোমন্দ ধারণা করতে পারিনি।'

গম্ভীর মুখে পিসেমশাই হাসলেন, 'তুমি খুব বড় ডিপ্লোম্যাট হতে পারবে। সে যাই হোক, আমার ছেলেদের আমার চাইতে কে আর ভালো চেনে! ওরা হল সাগর-ছেঁচা তিনখানি মুক্তো।'

চাতুরি ধরা পড়ে গেছে। কুণ্ঠিত মলিন মুখে চুপচাপ বসে রইলাম।

পিসেমশাই একটু ভেবে বললেন, 'বিমলের বয়স কত মনে হয় তোমার?'

'বছর তিরিশ।'

'প্রায় ঠিকই বলেছ; ওটা বত্রিশ হবে। আর অমলের?'

'পঁচিশ-ছাব্বিশ।'

'রাইট।'

'রিন্টুর?'

'সতের-আঠার।'

পিসেমশাই বললেন, 'রিন্টুকে বাদ দাও; আইনের চোখে সে এখনও মাইনর। অমল বিমলের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তারা রীতিমত অ্যাডাল্ট।'

পিসেমশাই কেন ছেলেদের বয়সের অঙ্ক নিয়ে বসলেন, বুঝতে পারছি না। পারছি না বলেই মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

পিসেমশাই থামেনি, 'অথচ দেখ দুজনেই এম-এ পাস করেছে কিন্তু কিছুই করে না। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেওয়া আমার কর্তব্য, তা আমি করে দিয়েছি। এর পর চাকরি-বাকরি কিংবা ব্যবসা করে যে নিজের নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত, সে হুঁশ ওদের নেই। কাজকর্ম না করে অলসভাবে পরগাছার মত দিনযাপন করলে মানুষের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। অনেক দিন থেকেই ভাবছি—,' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তিনি।

নিজের অজান্তেই যেন জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাবছেন?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে পিসেমশাই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ঐ টেবিলটার ওপর প্যাড আর কলম আছে; নিয়ে এসো।'

প্যাড-কলম নিয়ে এলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি; সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেল দেখি। এইভাবে লিখবে, ডিয়ার স্যার, ইউ আর সাফিসিয়েণ্টলি গ্রোনআপ—'

পিসেমশাই যা বললেন অনেকটা এই রকম।

'তোমাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে; উপার্জন করে নিজের নিজের খরচ চালানো অনেক আগে থেকেই উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে তোমাদের আদৌ কোনরকম প্রচেষ্টা নেই। রোজগার করে খরচ দিতে পার ভাল, নইলে আজকের তারিখ থেকে তিন মাসের ভেতর এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাধিত হব। ইতি—

তোমাদের বিশ্বস্ত—'

বক্তব্যটা সাজিয়ে গুছিয়ে পিসেমশাইয়ের হাতে দিলাম। চোখ বুলিয়ে অনুমোদনের স্বরে বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

তারপর তিন কপি টাইপ করে তলায় নিজের নাম সই করলেন, তারিখ দিলেন। দুখানা চিঠি দুটো খামে পুরে মুখ এঁটে একটায় অমলের নাম লিখে দিলেন, আরেকটায় লিখলেন বিমলের নাম। উত্তর দিকের দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আলমারিটা দেখিয়ে বললেন, 'ওটার ভেতর অনেক ফাইল আছে। সাতাশ নম্বরটা নিয়ে এসো।'

বিমূঢ়ের মত উঠে গিয়ে সাতাশ নম্বর ফাইল নিয়ে এলাম।

দুখানা চিঠি খামে পোরা হয়ে গিয়েছিল। বাকি চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে পিসেমশাই বললেন, 'আজকের তারিখ দিয়ে এটা রেখে দাও।' তারপর গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'মঙ্গল—মঙ্গল—'

একতলা থেকে সাড়া এল, 'যাচ্ছি বড়বাবু—'

ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ল, আগেও ছেলেদের তিনি অনেকবার অনেক রকম নোটিশ দিয়েছেন। যাই হোক আজকের তারিখ দিয়ে চিঠিটা রেখে দিলাম।

একটু পর মঙ্গল এসে পড়ল। চিঠি দুটো তাকে দিয়ে পিসেমশাই বললেন, 'পিণ্টু মিণ্টু বাড়ি আছে?'

মঙ্গল বলল, 'আছে। ঘুমুচ্ছে।'

'এই চিঠি দুটোর একটা পিণ্টুর একটা মিণ্টুর। তারা উঠলে দিয়ে দিস।'

'আচ্ছা।'

মঙ্গল চলে গেল। আর আমি বিহ্বলের মতন বসে রইলাম। দরকার হলে মানুষ আপন সন্তানকে বকে, মারে, ভর্ৎসনা করে। কিন্তু এভাবে নোটিশ দিতে আগে আর কখনও দেখিনি। এমন চমকপ্রদ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জীবনে এই আমার প্রথম।

মঙ্গল চলে যাবার পর পিসেমশাই বললেন, 'ঐ আলমারিটা খোল।' বলে

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড স্টীলের আলমারি ; প্রায় ঘরের সিলিং পর্যন্ত উঁচু।

আলমারিটার গায়ে চাবি লাগানোই ছিল ; ঘুরিয়ে হাতলে চাপ দিতেই খুলে গেল। ভেতরে আগের আলমারিটার মতন সারি সারি কত যে ফাইল সাজানো!

পিসেমশাই বললেন, 'ওখানে দু রকম ফাইল আছে।'

পেছন ফিরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

পিসেমশাই বললেন, 'ওপর দিকের তিনটে তাকে যে ফাইলগুলো রয়েছে তাতে আছে আয়ব্যয়ের হিসেব। কুড়ি বছর বয়েস থেকে রোজগার করছি, এখন সাতষট্টি চলছে। তার মানে সাতচল্লিশ বছর। ওখানে সাতচল্লিশটা ফাইল আছে। প্রতি ফাইলে একেক বছরের হিসেব লেখা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'তলার দিকের দুটো তাকে অনেকগুলো ডায়েরি আছে।'

চট করে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলাম। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতগুলো ডায়েরি আছে আন্দাজ করতে পার ?'

'সাতচল্লিশটা হবে।'

পিসেমশাই হাসলেন, 'ফাইলের সংখ্যাটা বুঝি ডায়েরির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ?'

ব্যাপারটা তা-ই। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—মানে—'

পিসেমশাই বললেন, 'সাতচল্লিশ না, বাহান্ন। পনের বছর বয়েস থেকে আমার দিনলিপি লেখার অভ্যেস। বাহান্ন বছরে বাহান্নটা ডায়েরি জমেছে।'

আমার কিছু বলার ছিল না ; নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'প্রথম ছখানা ফাইল আর সাতটা ডায়েরি নিয়ে এস।'

কথামত খুঁজে খুঁজে ফাইল আর ডায়েরিগুলো বার করে ফিরে এলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'প্রতিদিন ছ'টা করে ফাইল আর সাতখানা করে ডায়েরি তোমার ঘরে নিয়ে যাবে ; বুঝলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সাত-আটদিন সময় তোমায় দিলাম। এর ভেতর' সব ডায়েরি আর

ফাইল পড়া শেষ করতে হবে।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

পিসেমশাই কি এক ভাবনার ভেতর যেন ডুবে রইলেন। অনেকটা সময় পর বললেন, 'সাতচল্লিশ বছরের প্রতিটি পয়সার হিসেব ওতে লেখা আছে। শুধু—', বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

ভয়ে ভয়ে শুধোলাম, 'শুধু কী ?'

'একশো' পঁচিশ টাকার হদিস ওতে নেই। কবে কিভাবে টাকাটা খরচ করেছি, মনে করতে পারি না।' বলতে বলতে চুপ করে গেলেন পিসেমশাই। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'খুব ভাল করে ফাইলগুলো দেখবে চিরঞ্জীব। আমার জীবনে হিসেবের গরমিল থেকে যাবে, ভাবতেই পারি না। যেমন করে পার, ঐ একশো' পঁচিশ টাকার ব্যাপারটা তোমাকে বার করতেই হবে।'

'চেষ্টা করব।'

'আরেকটা কথা।'

'বলুন—'

ডায়েরিগুলোও খুব ভাল করে পড়বে। জীবনে কারো ওপর কোন অন্যায় কোন অবিচার করেছি কিনা দেখবে। যদি তেমন কিছু পাও, আমাকে তক্ষুণি জানাবে।'

ঘাড় কাত করে বললাম, 'জানাব।'

পিসেমশাই বললেন, 'তা হলে এখন তুমি যাও। ডায়েরি আর ফাইলগুলো সাবধানে রেখো ; হারিয়ে না যায় আবার।'

'আচ্ছা।' আমি উঠে পড়লাম।

তেরো

দেখতে দেখতে সেই শনিবারটা এসে গেল। সুরেশের কথা আমার মনে ছিল।

দুপুরবেলা এ বাড়িতে সাড়ে বারোটার আগে পাত পড়বার নিয়ম নয়।

এগারটা বাজতে না বাজতেই চানটান সেরে মঙ্গলকে ধরলাম, 'মঙ্গলদা, আজ আমাকে এখনই খেতে দিতে হবে।'

মঙ্গল শুধলো, 'এত তাড়াতাড়ি ?'

'জরুরী দরকার আছে ; এক্ষুণি না বেরুলেই না।'

'কিন্তু দাদাবাবু—'

'কী ?'

একতলার করিডরের শেষপ্রান্তে একটা দেয়ালঘড়ি আটকানো সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মঙ্গল বলল, 'সবে তো এগারটা বাজল, সাড়ে বারোটার আগে এখেনে খাবার দেবার হুকুম নেই।'

মলিন মুখে বললাম, 'তা হলে থাক ; আমি ফিরে এসেই খাব। আমার ঘরে ভাত-টাত ঢাকা দিয়ে রেখো।'

আমার চোখমুখ দেখে বুঝিবা করুণাই হল মঙ্গলের। বলল, 'আচ্ছা এট্টু দাঁড়ান দিকিন ; আমি আসছি—'

'কোথায় চললে ?'

'এসে কইচি।'

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল মঙ্গল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পর ফিরে এসে হতাশ স্বরে সে বলল, 'না, হল না। ভাত-তরকারি ঢাকা দিয়ে রাখব'খন। আপনি ফিরেই খাবেন।'

আমি অবাক। বললাম, 'গিয়েছিলে কোথায় ?

'বড়বাবুর কাছে। কিন্তুক অডার (অর্ডার) মিলল না।'

বুঝলাম আমার জন্য বিশেষ হুকুমনামা আদায় করতে গিয়েছিল মঙ্গল। কিন্তু যিনি সারাজীবন অঙ্ক কষে চলেছেন, হিসেব করে পা ফেলেছেন, আমার জন্য তিনি যে তুচ্ছ অনিয়মটুকুও মেনে নেবেন এমন আশা নেহাতই দুরাশা। অন্য কোন সাংঘাতিক ব্যাপারে না, নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগে সামান্য খাওয়ার জন্য দরবার করতে হল, ভাবতে গিয়েই লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল।

বললাম, 'পিসেমশাইয়ের কাছে তুমি কেন গেলে মঙ্গলদা ?'

মঙ্গলও বিব্রত হয়ে পড়েছিল। বিব্রত যতখানি, তার চাইতে ঢের বেশি দুঃখিত। আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, যাওয়াটা ঠিক হয়নি। দেড় ঘণ্টা আগে খেলে কি মহাভারত যে অশুদ্ধ হয়ে যায় ভগমান জানে।'

আমি আর কিছু বললাম না ; নিশব্দে সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম—সোজা সুরেশের 'বাস্তুহারা সমিতি'র দিকে।

'বাস্তুহারা সমিতি' পর্যন্ত আর যেতে হল না। ভূষণ কবিরাজের বাড়ির পাশ

দিয়ে খানিকটা যাবার পরই দেখা গেল মিছিল আসতে। খুব বড় অবশ্য না; সব মিলিয়ে আড়াই শো' তিন শো' লোক। সুরেশ যে সেদিন বলে গিয়েছিল, যাদবপুর-গড়িয়ার তাবত উদ্বাস্তু জুটিয়ে আনবে, তা আর পারেনি। মিছিলে পুরুষের চাইতে শিশু আর মেয়েমানুষই বেশি। তাদের হাতে অনেকগুলো পোস্টার চোখে পড়ল; খবরের কাগজের ওপর ভুসো কালিতে বড় বড় করে নানারকম দাবীদাওয়ার কথা লেখা। সবার আগে স্বয়ং সুরেশ; এই মুহূর্তে তাকে বেশ 'নেতা-নেতা' মনে হচ্ছে।

জনকতক ছোকরা ব্যস্তভাবে মিছিলটার গায়ে গায়ে চলেছে। চলছেই না, হাঁকডাক করে মিছিলটাকে ঠিক পথে সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারলাম; অমলের সঙ্গে 'বাস্তুহারা সমিতি'তে গিয়ে দেখে এসেছিলাম। এরা সুরেশের চেলা।

ছোকরাদের কেউ কেউ হাওয়ায় মুঠি পাকিয়ে স্লোগান দিচ্ছে, 'আমরা কারা?'

সমস্ত মিছিলটা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'বাস্তুহারা।'

'আমাদের দাবী—'

'মানতে হবে।'

'যাদবপুর-টালিগঞ্জ-গড়িয়ার সব কলোনী—'

'বৈধ করতে হবে।'

'রাত্রিবেলা মালিকের গুণ্ডাবাজি—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

'রুজি-রোজগারের—'

'ব্যবস্থা চাই।'

সুরেশ দেখতে পেয়েছিল। চোখাচোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। কাছে যেতে খুশী গলায় বলল, 'আসছ তা হইলে?'

হেসে বললাম, 'সেদিন তো আসতেই বলে এসেছিলেন—'

'কইলেই কি সগলে আসে? ইচ্ছা কইরা ভুইলা যায়। এই ত্যাখো না, টালিগঞ্জ-যাদবপুর-গড়িয়ার এমুন জায়গা নাই যেখানে খবর দেয় নাই। এখানে পঞ্চাশ-ষাইট হাজার রিফিউজি থাকে। অথচ মিছিলটার দিকে তাকাইয়া ত্যাখো, কয়জন আসছে।' সুরেশকে ক্ষুব্ধ দেখাল।

'আমি কিন্তু আসার কথা ভুলিনি। ঠিক এসে গেছি।'

'সগলের যদি তোমার মত দায়িত্ববোধ থাকত!'

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। এদিকে মিছিলটা আমাদের ফেলে কিছুটা এগিয়ে গেছে। সুরেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চল—চল—'

যেতে যেতে সে বলতে লাগল, 'লোকে মনে করে কি ; এইটা খালি আমার কাম ? তাগো (তাদের) কোন স্বার্থ নাই ? আইজ কলোনী লিগেলাইজ্‌ড্‌ হইলে, রুজিরোজগারের একটা ব্যবস্থা হইলে তার ফল কি একা আমি পামু, না সগলে পাইব ?'

বললাম, 'সকলে পাবে।'

সুরেশ বলল, 'এই কথাটা কেউ ভাইবা ভাখে না। মাত্তর আড়াইশ'তিনশ' মানুষ নিয়া দাবী জানাইতে যাইতে আছি ; এতে দাবী কখনও জোরদার হয় ? আইজ যদি যাদবপুর-টালিগঞ্জের বেবাক (সব) মানুষ একজোট হইয়া যাইতে পারতাম, চিন্তা করতে পারো, কী হইত ?'

'কী হত ?'

সুরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে বলল, 'সরকারের গদি টইলা যাইত। ইউনিটির মত শক্তি জগতে আর নাই।'

'তা তো ঠিকই।' আমাকে ঘাড় নাড়তেই হল।

একটু চুপ। তারপর সুরেশ বলল, 'যাও, মিছিলে খাড়ইয়া (দাঁড়িয়ে) পড় গিয়া।' পরক্ষণেই কি চিন্তা করে মতটা বদলে ফেলল, 'থাউক, মিছিলে যাইতে হইব না ; তুমি আমার লগে লগেই চল।'

স্লোগান দিতে দিতে মিছিল এগিয়ে চলেছে। আমরাও হাঁটছি।

সুরেশ বলল, 'অবশ্য মিছিল এতটুকুই থাকব না ; চলতে চলতে আরো কিছু লোক জুইটা যাইব।

আমি কিছু বললাম না।

হঠাৎ কি মনে পড়তে সুরেশ বলল, 'ভালো কথা—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম, 'কী বলছেন ?'

'তোমারে যা কইছিলাম তার কদ্দূর কি হইল ?

'কোন্ ব্যাপারে বলুন তো ?'

'সেই যে বাড়িঘর এক্সচেঞ্জের—'

'আপনি যেদিন বলেছেন সেইদিনই বাড়িতে চিঠি লিখেছি।'

'উত্তর আইছে ?'

'না।' আমার মনে পড়ে গেল এই চিঠিরই শুধু না, আমার আগের চিঠিরই

জবাব আসেনি দেশ থেকে। অন্যমনস্কতা, দুর্ভাবনা—একসঙ্গে দুদিক থেকে যেন আমাকে ঘিরে ধরল। বেশ ক'দিন হয়ে গেল কলকাতায় এসেছি, এখনও কেন যে বাবা উত্তর দিচ্ছেন না? আমার চিঠি কি তিনি পাননি? দেশে কি আরো গণ্ডগোল হল? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মন বিচিত্র অস্থিরতায় দুলতে লাগল।

সুরেশ বলল, 'আমার হাতে যে পার্টি রইছে তারা কিন্তুক ঘন ঘন তাগাদা মারতে আছে। কবে লাগাত (নাগাদ) চিঠির জবাব আসব, মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না।' আবছাভাবে বলতে লাগলাম, 'এর ভেতর এসে যাওয়া তো উচিত ছিল।'

সুরেশ আর কোন প্রশ্ন করল না।

মিছিল চলেছে তো চলেইছে।

সুরেশ যা বলেছে তা-ই। যেতে যেতে আরো কিছু লোক জুটে গেল। শিশু-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে এখন সবসুদ্ধ শ'চারেকের মত মানুষ।

একসময় যাদবপুর পেরিয়ে, ঢাকুরিয়ার লেভেল ক্রশিং পেছনে ফেলে রাসবিহারী এভিনিউতে এসে পড়লাম। এতক্ষণ আমরা যেখানে ছিলাম সেটা কলকাতার সব চাইতে অন্ত্যজ আর উপেক্ষিত অংশ। ঢাকুরিয়া পেরুবার পর এই শহরের জমকালো জমজমাট রূপের শুরু।

ঢাকুরিয়া-যাদবপুরে থাকতে নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্যই যেন স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল; তার মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না।

রাসবিহারী এভিনিউতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা কারা?'

মিলিত কণ্ঠের চিৎকারে আকাশ চৌচির হয়ে যেতে লাগল, 'বাস্তুহারা।'

'যাদবপুর-গড়িয়া-টালিগঞ্জের সব কলোনী—'

'বৈধ কর।'

'অন্ধকারে গুণ্ডাবাজি—'

'চলবে না, চলবে না।'

শীতের এই দুপুরে রাস্তাঘাট লোকজনে পরিপূর্ণ। আকস্মিক চিৎকারে অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে; দু চোখে বিরক্তি আর বিস্ময় ফুটিয়ে নতুন কালের নতুন ইহুদীদের দেখছে।

যত এগুচ্ছে মিছিলের চিৎকার ততই বাড়ছে। এর পেছনে কোন্ মানসিকতা কাজ করছে? হয়তো যারা সুখে আছে, আনন্দে আছে, প্রগাঢ়

তৃপ্তির ভেতর দিন কাটিয়ে চলেছে—তাদের স্নায়ুতে ধাক্কা দিয়ে বলা হচ্ছে, আমাদের দিকে একটু তাকাও, আমাদের কথা একটু শোন, একটু ভাবো। নইলে তোমাদের সুখ, তোমাদের শান্তি, তোমাদের নিরাপত্তা, তোমাদের পরিতৃপ্ত বিশ্রাম—সব, সব কিছু তছনছ করে দেব।

রাসবিহারী এভিনিউর পর রসা রোড। তারপর আশুতোষ মুখার্জী রোড হয়ে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গীর পর রাজভবন। সেখানে যখন আমরা পৌছুলাম দূর প্রাসাদশীর্ষের বড় ঘড়িটায় দেড়টা বেজে গেছে।

আসতে আসতে সুরেশ জানিয়েছিল, আমাদের গন্তব্য রাইটার্স বিল্ডিং। উদ্দেশ্য চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে দশ-দফা দাবী পেশ।

রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত যাওয়া হল না; রাজভবনের কাছে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য একদল পুলিস অপেক্ষা করছিল। বিদ্যুৎ গতিতে সারা রাস্তা আটকে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এগুবার পথ নেই। সুরেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'বইসা পড়, বইসা পড়।'

পুলিস দেখে বুড়ো-বাচ্চা-মেয়ে-পুরুষের দলটায় গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। সুরেশের চিৎকারে কলের পুতুলের মত ঝপাঝপ সবাই বসে পড়ল।

আমি অবশ্য বসিনি; সুরেশের গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপ্টেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ উদ্দীপ্ত সুরে বক্তৃতা শুরু করে দিল সুরেশ। পুলিসকে দেখে ভয় পাবার কারণ নেই। আমরা এখানে চুরি ডাকাতি বা রাহাজানি করতে আসিনি; কোনরকম অনুগ্রহ কিংবা করুণার জন্যও নয়। আমরা এসেছি ন্যায্য দাবী নিয়ে। নেতাদের রাজনৈতিক পাশাখেলায় ঘরবাড়ি সর্বস্ব গেছে; সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাযাবরের মত ভেসে বেড়াচ্ছি। ক'টি লোকের অবিবেচনার জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা; যতদিন দাবী আদায় না হয় ততদিন সংগ্রাম চলবে। তার জন্য চাই একতা। আমরা যদি জোট বাঁধি, এক হই, পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের রুখতে পারবে না। সুরেশের বক্তৃতা সংক্ষেপে এই রকম।

বক্তৃতা শেষ হবার পর সমস্ত এস্প্ল্যানেড অঞ্চলকে চমকে দিয়ে স্লোগান উঠল, 'আমরা কারা?'

'বাস্তহারা।'

'আমাদের দাবী—'

'মানতে হবে।'

'টালিগঞ্জ-গড়িয়া-যাদবপুরের সব কলোনী—'

'বৈধ কর, বৈধ কর।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্লোগান শেষ হবার পর সুরেশ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একজন পুলিস অফিসার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সুরেশ বলল, 'মিছিল আটকাবেন না; আমাদের যেতে দিন।'

লক্ষ্য করলাম যে-সুরেশ পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় আঞ্চলিক সুরে ছাড়া কথা বলে না, সে এখন অনায়াসে দীর্ঘকালের কলকাতাবাসীদের মত কথা বলছে।

অফিসার বললেন, 'তা হয় না।'

'কেন?'

'আপনারা যেখানে যেতে চাইছেন সেখানে হানড্রেড্ ফরটি ফোর রয়েছে। কী করে যেতে দিই বলুন—'

'কিন্তু চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়।'

'এ ব্যাপারে আমি হেল্প্লেস।'

'আমাদের ব্যাপারটা কিন্তু লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের।'

একটু চিন্তা করে পুলিস অফিসার বললেন, 'একটা কাজ তো করতে পারেন—'

সুরেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সবাইকে তো একসঙ্গে যেতে দেওয়া হবে না। কেউ একজন গিয়ে চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে দাবীটাবীগুলো জানিয়ে আসুন। আপনি যান না।'

'কথাটা মন্দ বলেননি।' বলেই ফিরে এল সুরেশ। আমাকে বলল, 'চীফ মিনিস্টারের লগে এট্টু দেখা কইরা চার্টার অফ ডিমাণ্ডটা পেশ কইরা আসি।' মিছিলের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা বস; আমি যামু আর আসুম।'

আমাদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে পূর্ব বাংলার টান এসে গেল।

যাই হোক সুরেশ চলে গেল। তার দৃপ্ত ভঙ্গি, নেতৃত্ব, উদ্বাস্তু উপনিবেশের জন্য দুর্ভাবনা, পুলিস অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা—সব মিলিয়ে আমার মধ্যে একটি বীরের ছবি যেন মুদ্রিত হয়ে গেল। আমি মুগ্ধ হলাম, অভিভূত হলাম। সুরেশের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সুরেশ ফিরে এল। এদিকে শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেছে। রোদ এখন মলিন নিস্তেজ। উত্তুরে বাতাস এলোমেলো ছোটাছুটি করছে।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।' ঘাড় নাড়ল সুরেশ।

'তবে?'

'চীফ মিনিস্টার খুব ব্যস্ত। তেনার সেক্রেটারির কাছে আমাগো দাবী-টাবীগুলি লেইখা দিয়া আসলাম।'

'তাতে কিছু কাজ হবে?'

'দেখা যাউক।' সুরেশ বলতে লাগল, 'যদি কিছু না হয়, আবার মিছিল লইয়া আসুম। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাগো আসতেই হইব। এক-বারে না হয় দুইবার। দুইবার না হইলে তিনবার। তেমন দরকার হইলে হাজারবার আসুম।'

এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন না করে বললাম, 'এখন কী করবেন?'

সুরেশ বলল, 'মিছিল লইয়া যাদবপুর ফিরুম। তুমি আমাগো লগে যাইবা তো?'

এখানে আমার কোন কাজ নেই। তবু যখন এসেই পড়েছি, এত তাড়া-তাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হল না। বললাম, 'আপনারা যান; আমি পরে ফিরব!'

'আইচ্ছা।'

মিছিল নিয়ে ফেরার ব্যবস্থা করতে লাগল সুরেশ। আর আমি লক্ষ্যহীনের মত সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ খেয়াল হল, খিদে পেয়েছে। মিছিলে বেরুবার পর থেকে বিচিত্র এক উত্তেজনা আমাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল; আচ্ছন্নের মত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ল, দুপুরবেলা আমার খাওয়া হয়নি। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

একটা খাবারের দোকান থেকে কিছু পুরী আর মিষ্টি খেয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে শিয়ালদায় চলে এসেছি, টের পাইনি।

সূর্যটাকে এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বলে দিনের আয়ু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। হঠাৎ-লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মত শীতের আকাশ এখনও আরক্ত হয়ে আছে।

পায়ে পায়ে স্টেশনের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ভেতরে সেই পরিচিত দৃশ্য। কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে গিয়েছিলাম যেসব ছিন্নমূল মানুষ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের কোন প্রান্তেই আশ্রয় পায়নি, শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ডেলা পাকিয়ে দিনের পর দিন পড়ে

আছে। আট-দশ ফুটের মত জায়গা ইঁট দিয়ে ঘিরে একটা পরিবার নিজের নিজের সীমানা ঠিক করে নিয়েছে।

সেদিন চারদিকে লাল সালুর অসংখ্য ফেস্টুন ঝুলতে দেখে গিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে দেখার মত শারীরিক বা মানসিক কোন অবস্থাই তখন ছিল না। আজ দেখতে পেলাম সেগুলোর ওপর নানা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা। 'মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি', 'হিন্দু সৎকার সমিতি', বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'। উদ্বাস্তদের সেবায় এই শহরের অসংখ্য মানুষ নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছে।

যাই হোক, এই মুহূর্তে খাবার ঘণ্টা চলছিল। স্টেশনের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে লঙ্গরখানা। শত শত অর্ধোলঙ্গ ক্ষুধার্ত শীর্ণ মানুষ থালা-বাটি-মগ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটছে।

কৌতূহলের বশে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে লোকগুলো কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সামনের দিকে কতকগুলো স্বেচ্ছাসেবক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি আর ডেকচি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁড়িগুলো হলুদ রঙের তরল খিচুড়িতে বোঝাই; ডেকচিতে কালচে থকথকে তরকারি।

কি একটা টিকিট দেখিয়ে লাইনের লোকগুলো দু-হাতা করে খিচুড়ি আর খানিকটা করে তরকারী নিয়ে ফিরে আসছে।

একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'টিকিটটা কিসের?'

সে বলল, 'আমরা যে সত্যকার রিফুজ (রিফিউজি) তার চিহ্ন। আগে আগে বাইরের ভিখারীরা আইসা খাইয়া যাইত। কে রিফুজ আর কে রিফুজ না ভিড়ের মধ্যে চিনার উপায় নাই। তাই এই টিকিটের ব্যবস্থা হইছে। এইটা না দেখাইলে খাইতে দ্যায় না।'

'দিনে ক'বার খেতে দ্যায়?'

'খাওয়ার কথা আর কইয়েন না বাবু। দুইবার অবশ্য দ্যায়। সকালে একবার আর এই সময় একবার। এই তো খাওনের নমুনা।' বলে খাদ্যসমেত হাতের মগটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'কন, মাইনষে এই বস্তু খাইতে পারে, না এইতে প্যাট ভরে! নেহাত বাঁচতে হইব, তাই খাওয়া।'

লোকটার টিকিটখানাও দেখলাম। তাতে একটা রিলিফ সোসাইটির ছাপ মারা আছে।

আরেকটা লোককে দাঁড় করিয়ে দেখলাম, তার টিকিটে অন্য একটা

প্রতিষ্ঠানের ছাপ। অনুমান করলাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই মানুষগুলোকে ভাগ ভাগ করে সেবার ভার নিয়েছে।

একটা না, খাবার নেবার জন্য অনেকগুলো লাইন। খুব সম্ভব একসঙ্গে এখানে রান্নাবান্না হয় না। নানা প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা 'কিচেন' খুলে তাদের তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তুদের খাওয়ায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ কার চেঁচামেচিতে চকিত হয়ে চোখ ফেরাতে হল। একটা রোগা বুড়ো মানুষ দেখি উদ্‌ভ্রান্তের মত একবার এ-লাইনে, একবার ও-লাইনে, একবার সে-লাইনে ছোটাছুটি করছে। আর কেঁদে কেঁদে গোঙানির মত সুর করে বলছে, 'বড় ক্ষুদা পাইছে ; আমারে কিছু খাইতে দ্যান। কিছু না পাইলে আমি মইরা যামু।'

কিন্তু কেউ তার কথা গ্রাহ্য করছে না। বরং যে লাইনেই যাচ্ছে সেখান থেকেই ধাক্কা মেরে বার করে দিচ্ছে।

আমার ডান দিক দিয়ে একটা লাইন গেছে। সেখান থেকে একটা লোক এইমাত্র বুড়ো মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরলাম, 'কী ব্যাপার, তুমি বুড়ো লোকটাকে ফেলে দিলে যে ?'

আমার মুখচোখ দেখে সে ভয় পেয়ে থাকবে। সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, 'অর টিকিট নাই।'

'টিকিট নেই মানে ?'

'আইজই বুইড়া (বুড়ো) পাকিস্তান থিকা আইছে। অখনও কোন পিতিষ্ঠানের টিকিট পায় নাই। টিকিট না পাইলে খাওন মিলব না।'

এদিকে বুড়োটা উঠে পড়েছিল ; আবার সে অন্য একটা লাইনের দিকে ছুটল। সেখান থেকে বাধা পেয়ে আরেক দিকে।

আমার একবার ইচ্ছা হল, লোকটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দিই। সেজন্য এগিয়েও গেলাম। কিন্তু তার আগেই বুড়োটা মুখ থুবড়ে পড়ল। ক্ষীণ জীবনীশক্তি যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ খাদ্যের জন্য ছোটাছুটি করেছে ; এবার আর সে উঠতে পারল না।

চারিদিকে এত অসংখ্য মানুষ। কিন্তু কেউ লাইন ছেড়ে বুড়োটার দিকে গেল না। মানুষ কত নির্দয় হয়ে গেছে।

আমার সত্তার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোতের মত কি যেন বয়ে গেল। একরকম লাফ দিয়েই বুড়োটার কাছে এসে তাকে কোলে তুলে নিলাম। এদিক

সেদিক তাকাতেই একটা রেডক্রশের গাড়ি চোখে পড়ল। বুড়োকে নিয়ে তাতে তুলে দিলাম। আর সেই মুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'চিরঞ্জীব—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল—অলকাদি!

অলকাদিকে এখানে শিয়ালদা স্টেশনের এই পটে দেখব, ভাবিনি। বিমূঢ়ের মত বললাম, 'আপনি!'

হ্যাঁ, আমিই। খুব অবাক হয়ে গেছ, না?' অলকাদি হাসলেন, 'আমি কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম। বুড়ো মানুষটাকে তুমি ওখান থেকে তুলে এনে রেডক্রশের গাড়িতে উঠিয়ে দিলে—সারভিস টু দি হিউম্যানিটি। অ্যা—'

বিব্রত মুখে বললাম, 'সারভিস আর কি—'

অলকাদি বললেন, 'মনে মনে ক'দিন ধরে তোমাকে খুব খুঁজছিলাম।'

অলকাদির সঙ্গে আমার মোটে একদিনের আলাপ; বিমলের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। আমি আর ক'টা কথা বলেছি; দু-একটা হুঁ-হাঁ ছাড়া প্রায় সারাক্ষণ মুখ বুজেই ছিলাম। যাই হোক তাঁর প্রতিধ্বনি করে বললাম, 'আমাকে খুঁজছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'বা রে, সেদিন বিমল তোমার চাকরির কথা বলে এল না? মোটামুটি একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।'

আমার হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে হাতখানেক ওপরে উঠে এল। প্রায় চিৎকারই করে উঠলাম, 'চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন অলকাদি। বললেন, 'তোমাকে পেয়ে ভালই হল। নইলে আবার খবর দিতে হত। আচ্ছা, এখন তোমার কোন কাজ আছে?'

'না।'

'তবে এসো আমার সঙ্গে।'

আচ্ছন্নের মত অলকাদির পিছু পিছু পা বাড়িয়ে দিলাম।

চোদ্দ

শিয়ালদা স্টেশন জুড়ে ছিন্নমূল মানুষের যে অস্থায়ী উপনিবেশ তা পেছনে রেখে একসময় আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

উল্টোদিকের ফুটপাথের গায়ে একটা নতুন মডেলের সুদৃশ্য মোটর দাঁড়িয়েছিল। অলকাদি সোজা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দরজার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে বললেন, 'ওঠো।'

সম্মোহিতের মত উঠে বসলাম। অলকাদিও উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করল। অলকাদিই স্টিয়ারিং ধরে বসেছেন। তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকলাম।

যাদবপুরগামী পথটা আমার চেনা। অলকাদি কিন্তু সেদিকে গেলেন না; অন্য রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন।

আধফোটা গলায় বললাম, 'যাদবপুর যাবার রাস্তাটা তো ওদিকে—'

গাড়ি চালাতে চালাতে আমার দিকে মুখ ফেরালেন অলকাদি। হেসে বললেন, 'দেশ থেকে ক'দিন হল এসেছ?'

হঠাৎ এ-রকম প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলাম। বিমূঢ় মুখে বললাম, 'আট-দশ দিন।'

'কলকাতার সব রাস্তা কি চেন?'

'না।'

ধীরে ধীরে উইণ্ড স্ক্রীনের বাইরে দৃষ্টিটাকে নিয়ে গেলেন অলকাদি। চাকার তলা দিয়ে মসৃণ রাজপথ দ্রুত সরে যাচ্ছে। জানলার ফ্রেমে বড় বড় বাড়ি, দোকান-পসার, জনস্রোত—নিমেষে নিমেষে দৃশ্যপট বদলের পালা চলেছে। অলকাদি বললেন, 'যাদবপুর যাবার একটা রাস্তা না; অনেক দিক দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়।'

আমি চুপ করে রইলাম; এরপর বলারও কিছু নেই।

কিছুক্ষণ চলবার পর বিরাট এক ম্যানসনের সামনে গাড়ি থামালেন অলকাদি। দরজা খুলে নামতে নামতে বললেন, 'এ বাড়িটায় আমার একটু দরকার আছে। তুমি গাড়িতে বোসো; যাব আর আসব। জাস্ট ফাইভ মিনিটস্। কেমন?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে দিলাম।

অলকাদি চলে গেলেন। পাঁচ মিনিটের কথা বলে গিয়েছিলেন ; ফিরলেন আধ ঘণ্টা পর। গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, 'খুব রাগ করেছ, না ?'

বিব্রত মুখে বললাম, 'রাগ করব কেন ?'

'একটু দেরি হয়ে গেল ভাই, গিয়ে এমন এক ঝামেলায় পড়ে গেলাম! কিছু মনে কোরো না, প্লীজ।'

মাথা নেড়ে আমি না-না করতে লাগলাম।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। এদিকে লম্বা পায়ে শীতের রাত কখন নেমে এসেছে, খেয়াল করিনি। আলোয় আলোয় আর নিওন সাইনে কলকাতা মদিরেক্ষণা হয়ে উঠেছে। রাতের এই নগরী আশ্চর্য মোহময়ী', তার সর্বাঙ্গে হাজার আকর্ষণের মেলা সাজানো।

কিছুক্ষণ চলার পর আবার গাড়ি থামল। সামনেই চমৎকার একখানা তিনতলা বাড়ি ; কম্পাউণ্ডের ভেতর অগণিত নতুন মোটর ছড়ানো আর দেখা যাচ্ছে নানা জাতের সুখী পরিতৃপ্ত সুসজ্জিত মানব-মানবীর ভিড় ; তাদের ফাঁকে ফাঁকে উর্দিপরা বয়-বেয়ারাদের ব্যস্ত পায়ে ছোটাছুটি।

অলকাদি বললেন, 'এটা আমাদের ক্লাব। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। তোমাকে তাই আরেকটু কষ্ট করে একলা একলা থাকতে হবে। এবার আর দেরি হবে না। টু মিনিটস্—'

'আচ্ছা।'

দু' মিনিটের নাম করে এবারও কুড়ি মিনিটের বেশী কাটিয়ে এলেন অলকাদি। বললেন, 'ভেরি সরি, চিরঞ্জীব ; ওরা এমন আটকে দ্যায়! আমাকে তো আসতেই দিচ্ছিল না!'

আমি চুপ।

এরপর আরো কত জায়গায় যে থামলেন অলকাদি আর দু' মিনিট পাঁচ মিনিটের নাম করে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে লাগলেন হিসেব নেই। মনে হল সারারাতই বুঝি আমাকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন অলকাদি। হঠাৎ উঁচু টাওয়ারের মাথায় একটা ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ন'টা বাজে। দশটার ভেতর পিসেমশাইয়ের বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমি চঞ্চল হলাম। ভীত স্বরে ডাকলাম, 'অলকাদি—'

সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অলকাদি সাড়া দিলেন, 'কী বলছ ?'

'অনেক রাত হয়ে গেছে।'

সুগোল হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলেন অলকাদি। বললেন, 'মোটে সাড়ে ন'টা ; একেই তুমি অনেক রাত বলছ!'

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'না—মানে—'

'কী?'

'আমি যেখানে থাকি সেখানে তাড়াতাড়ি গেট বন্ধ হয়ে যায়।'

'আমি জানি।' অলকাদি বলতে লাগলেন, 'বিমলরা তো রাত্তিরবেলা পাঁচিল টপকে ঢোকে। ওদের কাছে ট্রেনিং নিয়ে নাও। রাত্তি দশটার ভেতর একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক বাড়িতে ঢুকবে? আমি কল্পনাই করতে পারি না। বিমলের বাবার এ ভারি জুলুম ; ভদ্রলোক একজন ছোটখাটো অটোক্র্যাট।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমি ওঁর ওখানে উঠেছি। ওঁর কথামত—'

'বুঝেছি। আচ্ছা চল, ফেরাই যাক।' বুঝিবা অনিচ্ছাসত্ত্বেই গাড়ির মুখ যাদবপুরের দিকে ফেরালেন। যেতে যেতে অস্ফুট ফিস ফিস গলায় বললেন, 'তুমি দেখছি একটা ভীতু খরগোস।'

উত্তর দিলাম না ; দেবার কিছু নেইও। সুদর্শনা এক মহিলার ধিক্কারে ঘাড় গুঁজে বসে রইলাম।

অলকাদি আগের স্বরেই আবার বললেন, 'সময় লাগবে দেখছি!'

তাঁর স্বরে এমন কিছু ছিল, এমন এক তরঙ্গ—যাতে চকিত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'কিসের সময়?'

অলকাদি উত্তর দিলেন না ; শব্দ করে একটু হাসলেন শুধু।

যাদবপুর এসে কিন্তু পিসেমশাইয়ের বাড়ির কাছে আমাকে নামিয়ে দিলেন না অলকাদি ; বাড়িটাকে ডাইনে রেখে তাঁর গাড়ি এগিয়ে চলল।

বললাম, 'পিসেমশাইয়ের বাড়িটা ফেলে এলেন অলকাদি ; ঐ যে ওখানে—'

আমার মনে হয়েছিল, রাত্রিবেলা বাড়িটা চিনতে পারেননি অলকাদি। কিন্তু খুব শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'জানি।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'গাড়ি থামালেন না?'

'এখানে না।'

'তবে?'

'চলো না!'

ভেতরে ভেতরে আমি অস্থির হলাম, ছটফট করতে লাগলাম। কিন্তু মুখ

ফুটে জোর করে কিছুতেই বলতে পারলাম না, 'গাড়ি থামিয়ে দিন, আমি এখানেই নামব। পিসেমশাই আশ্রয় দিয়েছেন, আমি তাঁকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারব না।' বলতে পারলাম না, কেননা এই মহিলাটির হাতেই আমার জীবন-কাঠি রয়েছে ; তিনি আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবেন। আর ওটা পেলেই বাবা মা আর সবিতাকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে পারি।

অলকাদির গলা আবার শোনা গেল, 'বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাব না, দশ মিনিট—টেন মিনিটস ওনলি।'

দু'মিনিট পাঁচ মিনিটের নমুনা আগেই দেখেছি ; মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

গাড়িটা সোজা নিজের বাড়ির কম্পাউণ্ডে নিয়ে থামালেন অলকাদি। নিজে আগে নামলেন, তারপর আমাকে নামতে বললেন।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'নাবব ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নামবে বৈকি !'

'কিন্তু এত রাত্তিরে—'

'আরে এসোই না—'

আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন শক্তিই বুঝি অবশিষ্ট নেই। অলকাদির ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে নেমে এলাম।

আমাকে সঙ্গে করে বারান্দায় উঠলেন 'অলকাদি। তারপর কলিং বেলের বোতামে আঙুলের চাপ দিলেন। একটু পর মধ্যবয়সী একটি বিধবা মেয়েছেলে দরজা খুলে দিল। বিমলের সঙ্গে প্রথম যেদিন এখানে আসি সেদিনই তাকে দেখেছিলাম। মেয়েছেলেটা এ বাড়িতে কাজ-টাজ করে। অলকাদি অবশ্য বলেছিলেন; 'ও আমার গার্জেন অ্যাঞ্জেল।'

ভেতরে এসে একখানা সোফা দেখিয়ে অলকাদি বললেন, 'বোসো চিরঞ্জীব।'

বসলাম। অলকাদি আবার বললেন, 'সারাদিন ঘোরাঘুরি করছি ; কাপড়-টাপড়গুলো একটু বদলে আসি।' মাঝবয়সী সেই মেয়েছেলেটাকে বললেন, 'হিটারে কফির জল চড়িয়ে দাও মনোদিদি। আজ বড্ড শীত।'

মেয়েছেলেটার নাম সেদিনই জেনে গেছি—মনোরমা।

মনোরমা আর অলকাদি দু'জনেই এ-ঘর থেকে ভেতর দিকে চলে গেলেন। খানিক পরেই আটপৌরে সাজের ওপর একখানা নক্সাপাড় শাল জড়িয়ে আমার মুখোমুখি এসে বসলেন অলকাদি। মধুর হেসে বললেন; 'আমার ওপর মনে মনে

খুব চটে যাচ্ছ তো ?'

রাগ ঠিক করিনি, তবে পিসেমশাইয়ের বাড়ির কথা ভেবে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বিব্রত মুখে কি উত্তর দিলাম, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়।

অলকাদি বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানো চিরঞ্জীব—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

অলকাদি বলতে লাগলেন, 'সেদিন বিমলের সঙ্গে এলে ; ভালো করে তোমার সঙ্গে আলাপই হয়নি। বিমলটা যেখানে থাকে সেখানে আর কারোকে কথা বলতে দ্যায় না ; একাই বকে মাথা ধরিয়ে দ্যায়। তাই আজ তোমাকে ধরে আনলাম। জমিয়ে গল্প-টল্প করব আর কি।'

অলকাদির ইচ্ছার ভেতর আপত্তিকর কিছু নেই ; বরং সেটা লোভনীয়ই। তবু আমার বুকের ভেতরকার অদৃশ্য কোন প্রান্তে ছায়া পড়েছে। আমি কিছু বললাম না।

অলকাদি বললেন, 'গল্প-টল্প শুরু করার আগে কাজের কথাটা সেরে নিই।'

'বলুন—', আমি উন্মুখ হলাম।

'তুমি তো গ্র্যাজুয়েট ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। আমিও তাই ভেবেছিলাম।' অলকাদি বলতে লাগলেন, 'তোমার জন্যে একটা কোম্পানিতে চাকরি ঠিক করেছি ; আপাতত কিছুদিন ট্রেনিং নিতে হবে। ধরো মাস দুয়েকের মত। তারপর জুনিয়ার অফিসারের চাকরি পাবে। ট্রেনিং পীরিয়ডে মাইনে আড়াইশো। চাকরি হয়ে গেলে স্টার্টিং চারশো'র। অসুবিধে হবে ?'

এ আমার পক্ষে আশাতীত, তায় অকল্পনীয়। অবরুদ্ধ গলায় কোন রকমে কিছু বলতে পারলাম না।

অলকাদি বললেন, 'জানুয়ারী মাস তো শেষ হতে চলল।'

'হ্যাঁ ; আজ আটাশ তারিখ।'

'ফেব্রুয়ারিতে কিন্তু তোমার কাজটা হচ্ছে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার ব্যাপারে কোম্পানির কিছু অসুবিধে আছে এ মাসে।'

মনে পড়ে গেল, পিসেমশাই আমাকে ছ'মাস পর্যন্ত সময় দিয়েছেন ; তার ভেতর চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলেই হয়। ছ' মাসের মাত্র দিনকয়েক কেটেছে। জানালাম, মার্চে চাকরি পেলেই চলবে।

এই সময়ে মনোরমা কফি বিস্কুট-টিস্কুট দিয়ে গেল।

পূর্ব বাংলার দূর-অভ্যন্তরের এক অজানা ভুবন থেকে আমি এসেছি ; চা বা কফি কোন কিছুতেই অভ্যস্ত নই। তবু যে-মানুষ চাকরি যোগাড় করে দ্যায় তাকে খুশি করার জন্য কফির পেয়ালা তুলে নিলাম।

অলকাদি এবার মনোরমাকে বললেন, 'ওবেলা তো খাইনি। কী কী রেঁধেছিলে মনোদি?'

মনোরমা বলল, 'পোনামাছ, মাংস, নিরিমিষ তরকারি, ডাল, কপির বড়া আর চাটনি।'

'গ্র্যাণ্ড। আমার ওবেলার ভাত নিশ্চয় পড়ে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠাণ্ডায় আর ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, তিনজনের মত লুচি ভেজে নাও। মাছ-মাংস আছে, ডিম থাকলে একটু ডালনা কোরো।'

'আচ্ছা।' মনোরমা চলে গেল।

নিঃশব্দে কফির পালা শেষ করলেন অলকাদি। টীপয়ের ওপর শব্দ করে শূন্য পেয়ালা রাখতে রাখতে বললেন, 'নাঃ, কফি দিয়ে সুবিধে হল না।'

আমি তখনও আস্তে আস্তে জিভ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। মুখ তুলে এবার অলকাদির দিকে তাকালাম।

অলকাদি বললেন, 'এত ঠাণ্ডায় এমন নিস্তেজ পানীয়ে গা গরম হচ্ছে না। তাই না চিরঞ্জীব—'

বললাম, 'কেন, বেশ তো—'

'তুমি একটা হোপলেস।' চোখের তারায় নাচন দিয়ে কেমন করে যেন হাসলেন অলকাদি। বললেন, 'শীতে জবুথবু হয়ে বসে আছ ; কফিতে তোমার কিচ্ছু হচ্ছে না। দাঁড়াও এক সেকেণ্ডে তোমাকে চাঙ্গা করে দিচ্ছি।'

'কেমন করে?'

'দাঁড়াও না একটু—'

অলকাদি উঠে ভেতরে চলে গেলেন ; খানিক পর যখন ফিরে এলেন তাঁর হাতে চ্যাপটা মতন মাঝারি বোতল আর দুটো সুদৃশ্য কাচের গেলাস।

এ বোতল আমার চেনা ; যুদ্ধের সময় আমেরিকান টমিরা আমাদের আমতলি পর্যন্ত হানা দিয়েছিল ; তাদের হাতে হাতে এই বোতলগুলো দেখেছি। এগুলোর ভেতর কোন্ সুধা পোরা থাকে, আমার অজানা নয়।

সোফায় বেশ তরিবত করে বসলেন অলকাদি। ছিপির মুখ খুলে ফেনায়িত সোনালী তরল পদার্থ ঢালতে ঢালতে ঘাড় বাঁকিয়ে চোরা চোখে আমাকে বিদ্ধ

করলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব; একটি চুমুক—জাস্ট ওয়ান সিপ, সঙ্গে সঙ্গে গা গরম হয়ে যাবে। এই শীতের রাতে মনে হবে বসন্তের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।'

বোতলের ছিপি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র মিষ্টি গন্ধ স্নায়ুতে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। চকিতে সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল; বিমল বলেছিল সে এখানে তৃষ্ণা মেটাতে এসেছে। সে কি এইজন্যই? এই সুধা দিয়েই? বিমল আড়ালে আমাকে জানিয়েছিল,অলকাদিকে ঘিরে যাদবপুরের যৌবন সব সময় মৌচাকের মত ভন্‌ভন্‌ করতে থাকে। সে কি অলকাদি' হাতে এই অমৃত আছে বলে? যাই হোক, আমার তালুর ওপর চুলগুলো খাড়া খাড়া সরল রেখায় দাঁড়িয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দুটো গেলাস ফেনায়িত রঙীন তরলে ভর্তি করে ফেলেছেন অলকাদি। একটা গেলাস আমার দিকে এগিয়ে দিলেন; অন্যটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, 'কফি রেখে দাও চিরঞ্জীব; ঐ গেলাসে চুমুক লাগাও—'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল; জিভটা একরাশ খরখরে ধারাল বালির মত মনে হচ্ছে; ঢোক গিলতে পারছি না।

এ আমি কোথায় এসেছি? মেয়েমানুষে মদ খায়—বিশেষ করে বাংলা দেশের মেয়েরা, অলকাদির মত শিক্ষিতা সুদর্শনা মেয়েরা—কোনদিন কল্পনাও করিনি। মনে হল, চোখের সামনে যা দেখছি তা যেন সত্যি না। কেউ বুঝি নিদারুণ এক দুঃস্বপ্নের ভেতর আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

অলকাদি চুমুকের পর চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন। দিতে দিতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আমি কাঠ হয়ে বসে আছি। একটুক্ষণ অবাক থেকে প্রেরণা দেবার মত করে বললেন, 'ও কি, এখনও হাত দাওনি; তুলে নাও—'

গোঙানির মত একটা শব্দ আমার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, 'আমি—আমি—আমি—'

'আমি কী?'

চোখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল অলকাদির। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলতে লাগলেন, 'বল—বল, তুমি কী?'

'আমি কখনও মদ খাইনি।' বলে নিজের অজান্তে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

ফোঁপানি শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন অলকাদি। তারপর ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড়্‌ টানার মত শব্দ করে বেঁকেচুরে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসতে লাগলেন। হাসির তোর কিছু কমে এলে গলা চড়িয়ে

ডাকতে লাগলেন, 'মনোদিদি, মনোদিদি—একবার এ-ঘরে এসো।'

মনোরমা রান্নাবান্না করছিল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল, 'কী বলছ ?'

'চিরঞ্জীব বলছে ও কখনও মদ খায়নি। বলে ছেলের সে কি কান্না!' আগের মত আবার গড়িয়ে গড়িয়ে হাসতে লাগলেন অলকাদি।

'তোমার যত কাণ্ড দিদিমণি!' হাসতে হাসতে মনোরমা চলে গেল।

হাসি একেবারে থামিয়ে এবার ঢুলঢুল চোখে তাকালেন অলকাদি। স্বরে কাঁপন দিয়ে বললেন, 'তুমি না পুরুষমানুষ! মদের গেলাস দেখে কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিলে! নাঃ, একেবারে কচি খোকাটি হয়ে আছ দেখছি। ঝিনুক-বাটি দিয়ে দুধ খাবে ?' বলে আবার হাসি শুরু করলেন।

ধিক্কারে মাথা তুলতে পারছিলাম না। কার্পেটে-মোড়া মেঝের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে কাঁপা গলায় বললাম, 'অনেক রাত হল, এবার যাব।'

'এক্ষুণি কি করে যাবে ?'

'কেন ?'

'বা রে, তোমার জন্যে খাবার তৈরি করতে বললাম না মনোদিদিকে! আজ রাত্তিরে এখানে খেয়ে যাবে।'

'কিন্তু—', গলার ভেতর স্বর আটকে গেল আমার।

অলকাদি আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, মনোরমা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, 'আমার রাঁধাবাড়া শেষ, গরম গরম খেয়ে নাও, নইলে ভাল লাগবে না।'

আমার সব আপত্তি আর অনিচ্ছা তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে খেতে নিয়ে বসালেন অলকাদি। মাছ-মাংস-লুচি-তরকারি। নানারকম সুস্বাদু খাবার আমার সামনে সাজানো। খাচ্ছিও। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না: জিভ তার আস্বাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

গোগ্রাসে খাচ্ছিলাম। অলকাদি বললেন, 'ও কি, অমন নাকেমুখে গুঁজছ কেন ? আস্তে আস্তে খাও।'

কোনরকমে খাওয়ার পালা চুকিয়ে বললাম, 'এবার আমি যাব অলকাদি—'

'এসে থেকেই তো শুধু যাই-যাই করছ!'

এ কথার উত্তর দিলাম না।

অলকাদি আমার চোখের ভেতর তাকিয়ে বললেন, 'আজ রাত্তিরে তোমার কি কোন কাজ আছে ও-বাড়িতে ?'

'আজ নেই। তবে কাল সকালে আছে।'

'এত ঠাণ্ডায় আর রাত্তিরে তা হলে গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালেই যেও।'

বলছেন কি অলকাদি ! তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একটু গল্প-টল্প করেই ছেড়ে দেবেন। এখন বলছেন এ বাড়িতে রাত কাটিয়ে যেতে। সর্পিনীর মত শতপাকের বেষ্টনীতে তিনি কি আমাকে জড়াতে চান? ভীত স্বরে বললাম, 'রাত্তিরে এখানে থাকব !'

'হ্যাঁ, থাকবে।' চোখের তারায় বিচিত্র সম্মোহন ফুটিয়ে অলকাদি তাকালেন। ওধার থেকে উঠে এসে আমার পাশে নিবিড় হয়ে বসলেন। তারপর আমার একখানা হাত নিয়ে খেলতে লাগলেন।

অলকাদির চুলের অরণ্য থেকে, শাড়ির ভাঁজ থেকে, গলার খাঁজ থেকে মিষ্টি মোহময় গন্ধ উঠে আসছে। গন্ধটা আমার নাকের ভেতর দিয়ে সমস্ত সত্তায় বুঝি ছড়িয়ে পড়ল ; স্নায়ুগুলো ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হল চেতনার শেষ অন্তরীপটি ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে আর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে দ্রুতবহ শীতের স্রোত ওঠানামা করতে লাগল।

সীমাহীন আচ্ছন্নতার মধ্যেও অলকাদির গলা আবার শুনতে পেলাম, 'আমি একলা থাকি এ বাড়িতে ; আমাকে ফেলে আজ রাত্তিরে যেও না চিরঞ্জীব।'

নির্জীব ডুবন্ত স্বরে কোনরকমে বলতে পারলাম, 'আমার বড্ড ভয় করছে অলকাদি।'

'কিসের ভয় ? আমাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো অবলা মেয়েমানুষ। আমি আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারি।' গাঢ় গলায় অলকাদি বললেন। তারপর দুটি কোমল বাহু সাপের মত আমাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করল।

চেতনার যেটুকু তলানি এখনও অবশিষ্ট আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেটুকু আর থাকবে না। আমার নাক কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল, চোখের সামনে সব কিছু ঝড়ের দোলার মত দুলতে লাগল। অলকাদির হাত দুটো কোনরকমে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন—,' বলেই দরজা খুলে বাইরের হিমাক্ত অন্ধকার ভেদ করে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

অলকাদির দিকে ফিরে তাকাইনি ; তাঁর চোখমুখের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলতে পারব না।

সেই যে ছোটা শুরু করেছিলাম, একেবারে পিসেমশাইয়ের বাড়ির সামনে এসে থামলাম।

এখন কত রাত, কে জানে। গেটে ইতিমধ্যেই তালা লাগানো হয়েছে। এতকাল অমল-বিমলরা পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছে। আজ প্রথম আমি তাদের দলে নাম লেখালাম।

তালা গেটেই শুধু নয়, সদর দরজাতেও। গেট পেরুলেই তো আর বাড়ির ভেতর ঢোকা যায় না। এত রাত্রে কাকে ডেকে যে সদরের তালা খোলাই! ডাকাডাকি করতে গেলে পিসেমশাই যদি টের পেয়ে যান? আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বাগানের মাঝখানে যে নুড়ির রাস্তাটা, তার ওপর দিয়ে শিথিল কাঁপা পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল আমার ঘরে আলো জ্বলছে।

আমার ঘরে তো কেউ আসে না! তবে আলো জ্বলছে কেন? কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বুকের মাঝখানের সেই দুরন্ত কাঁপুনির শব্দ শুনতে শুনতে পায়ে পায়ে ঘুরপথে নিজের ঘরের জানলায় উঁকি দিলাম।

কী আশ্চর্য! আমার বিছানায় অমল বসে আছে।

আস্তে করে ডাকলাম, 'অমল—'

অমল মুখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি হতে বলল, 'একটু দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।'

আমি আবার ঘুরে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

পনেরো

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিয়ে অমল বলল, 'এসো।'

আমি ভেতরে ঢুকতেই আবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল অমল। তারপর দুজনে আমার ঘরে চলে এলাম।

অমল আমার বিছানায় বসল। সারাদিনের ধুলোবালি-মাখা চটকানো জামাকাপড় খুলতে খুলতে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, তুমি আমার ঘরে বসেছিলে!'

অমল বলল, 'কেন থাকতে নেই?'

এ বাড়িতে অমলের কাছেই আমি সব চাইতে সহজ হতে পেরেছি। শুধু এ বাড়িতে কেন, সীমান্তের এপারে এই একটিমাত্র মানুষ যার কাছে অসঙ্কোচে নিজেকে মেলে দিতে পারি ; অবশ্য এ ব্যাপারে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল হয়ে যদি উঠতে পেরে থাকি তা অমলেরই জন্য। ছেলেটা এমনই, নিজের চারদিকে যে দেয়াল তুলে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে পারে না এবং অন্য কারোকেও ঐভাবে থাকতে দেয় না। যাই হোক বললাম, 'না, ঠিক তা নয়। তবে—'

'কী ?'

'আমার ঘরে আগে আর কখনও তোমাকে এমন করে বসে থাকতে দেখিনি তো। তাই—'

'অবাক হয়ে গেছ, না ?'

'তা একটু হয়েছি।'

মৃদু হেসে অমল বলল, 'কৃতজ্ঞতা বুঝলে ভাই, স্রেফ কৃতজ্ঞতার জন্যে আমি তোমার ঘরে বসে তোমার অপেক্ষা করছিলাম।'

ঈষৎ বিমূঢ়ের মতন বললাম, 'কৃতজ্ঞতা !'

'ইয়েস।' আস্তে করে মাথা নেড়ে অমল বলল, 'রোজ রোজ তুমি আমাদের দরজা খুলে দাও ; একটা দিন তোমাকে না দিলে কখনও চলে ? এটা হল মিউচুয়াল কো-অপারেশন—পারস্পরিক সহযোগিতা।'

হেসে ফেললাম, 'প্রতিদান দিচ্ছ ?'

'যা বলো।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর অমলই শুরু করল, 'তুমি তো জান, মনুষ্যকুলে আমি পুরোদস্তুর নিশাচর ; মাঝরাতের আগে বাড়ি ফেরা আমার কুষ্টিতে নেই। আজ কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসেছিলাম।'

'রেকর্ড করেছ তা হলে !' আমি হাসতে লাগলাম।

'রেকর্ডই বটে।' অমল আমার গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

'তা হঠাৎ এ রকম দুর্মতি কেন ?'

'শরীরটা ভাল লাগছিল না, তাই চলে এসেছি। আর এসেই—'

'কী ?'

'তোমার খোঁজ করেছি কিন্তু হিজ ম্যাজেস্টির পাত্তাই নেই। মঙ্গলের কাছে শুনলাম, 'বেরিয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

'সারাদিন, তারপর এতখানি রাত পর্যন্ত ছিলে কোথায় ?'

'সুরেশবাবু—ঐ যে তুমি যাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে—,' আমি বলতে লাগলাম, 'তাঁদের সঙ্গে মিছিলে বেরিয়েছিলাম।'

'মিছিল !'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম, 'উদ্বাস্তদের নিয়ে ওঁরা আজ মিছিল বার করেছিলেন।'

'কিন্তু—,' অমলকে চিন্তিত দেখাল, 'সুরেশদা তোমাকে পেল কি করে ?'

'পরশুদিন উনি এ বাড়িতে এসেছিলেন। মিছিলে যাবার জন্যে বার বার করে অনুরোধ করে গেছেন।'

'তাই নাকি ! বেশ—,' অমলের চোখ কৌতুকের আলোয় চিকচিক করতে লাগল, 'সুরেশচন্দ্র তা হলে তোমাকে বাগাতে পেরেছে ! ওর মিছিলে এখন পর্যন্ত তুমিই তা হলে লাস্ট রঙ রুট !'

'রঙ রুট ?'

'ঐ রিক্রুট আর কি !'

জামাকাপড় ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আধময়লা একটা লুঙ্গি আর হাফশার্ট পরে গায়ে চাদর জড়িয়ে অমলের পাশে এসে বসলাম, 'রিক্রুট-টিক্রুট কিছু না। উদ্বাস্তদের ব্যাপার, আমি নিজেও উদ্বাস্ত। তাই কৌতূহল হয়েছিল, গিয়েছিলাম।'

অমল শুধালো, 'মিছিল কি রকম হল ?'

'ভালই।'

'বড় ?'

'মন্দ না একেবারে।'

'কত লোক হবে ?'

'তা শ' তিন-চার।'

'বাঃ বাঃ, সুরেশদা বেশ উন্নতি করে ফেলেছে, দেখছি।'

অমল কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম।

অমল আমার মনের কথাটা বুঝিবা পড়তে পারল। বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছো সুরেশদা এ অঞ্চলের ছোটখাটো একজন উদ্বাস্ত নেতা ! তবে কেউ ওকে নেতা বানায়নি, আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ম্ভু বলতে পার।'

আমি হাসলাম।

অমল বলতে লাগল, 'আজ তিন বছর ধরে সুরেশদা মিছিল বার করে চলেছে।'

'তিন বছর!'

'ইয়েস।'

'প্রথম প্রথম দু-চারজনের বেশি জুটত না। যা জুটত তাই নিয়েই বেরিয়ে পড়ত সুরেশদা। রাইটার্স বিল্ডিং আর রাজভবনের কাছে গিয়ে স্লোগান দিয়ে আসত।' অমল বলতে লাগল, 'ভদ্রলোকের যাই বলো, টেনাসিটি আছে। হাল ছেড়ে বসে থাকেনি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেগে থেকে এখন তো রীতিমত বড় মিছিলই বার করছে। দেখা যাক, রিফিউজিদের জন্য সুরেশদা কতদূর কি করতে পারে।'

আমি চুপ করে রইলাম।

অমল আবার বলল, 'তা আজ কোন্ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলে?'

'রাজভবন পর্যন্ত।' আমি বললাম, 'ওখানে যেতেই পুলিস পথ আটকাল।'

'তারপর?'

'সুরেশদা বক্তৃতা-টক্তৃতা করল। তারপর মেমোরেণ্ডাম দিতে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়েছিল।'

অমল বলল, 'তিন বছর ধরে ঐ এক জিনিস চলছে। মিছিল, বক্তৃতা, মেমোরেণ্ডাম। যাক ও-সব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল তার, 'ভাল কথা—'

আমি উন্মুখ হলাম, 'কী?'

'সন্ধ্যের পর এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজে এসেছিলেন।'

'কী নাম বল তো?'

'শিশিরকুমার মুখুটি।'

'শিশির মুখুটি!' আমি অবাক হয়ে গেলাম, সেই সঙ্গে চিন্তাগ্রস্তও। হঠাৎ কী এমন হতে পারে যাতে শিশির মুখুটি সুদূর বাগবাজার থেকে মহানগরীর দক্ষিণ মেরু এই যাদবপুরে ছুটে এসেছিলেন!

অমল ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ। ভদ্রলোক কে?'

'কেউ না। দেশ থেকে আসতে আসতে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তা কিছু বলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আসছে বুধবার ওঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ। তোমাকে বার বার করে যেতে বলে গেছেন। তুমি তো শ্মশানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে শ্মশানবন্ধুই হয়েছ।'

আমি চুপ করে রইলাম। শিশির মুখুটির কথা আমার মনেই ছিল না। মাঝখানের ক'টা দিন, নানারকম ভাবনা আর অজস্র ঘটনা এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত ঢেউয়ের মত আমাকে এমনভাবে দুলিয়ে গেছে যে শিশির মুখুটি বা তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর মতন নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যাপারও ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলিনি ঠিক, তারা কিছু আড়ালে সরে গিয়েছিল।

খুব আস্তে অন্যমনস্ক গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। শ্মশানবন্ধুই তো।'

অমল বলল, 'ভদ্রলোককে আমি কথা দিয়েছি ; তোমাকে পাঠিয়ে দেব। না গেলে কিন্তু আমি নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ব।'

আগের সুরেই বললাম, 'যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর অমল বলল, 'আরেকটা খবর আছে।'

'কী ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

কিছু না বলে অমল হঠাৎ জোরে জোরে হেসে উঠল।

আমি অবাক, 'হাসছ যে ?'

'হাসির ব্যাপার ঘটেছে, তাই।'

'কি ব্যাপার ?'

'এ বাড়ির ওল্ড ম্যান আমাকে নোটিশ দিয়েছে।'

বিদ্যুৎ-চমকের মত আমার মনে পড়ে গেল। পিসেমশাই ছেলেদের দেবার জন্য সেদিন একটা নোটিশের ড্রাফট মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন এবং আমি খাতায় তা টুকে নিয়েছিলাম ; তারপর সেটা দু'কপি টাইপ করে খামে পুরে তিনি মঙ্গলের হাতে দিয়েছিলেন। খামের ওপর অমল আর বিমলের নাম ছিল। মঙ্গল তা হলে খাম দুটো জায়গামত পৌঁছে দিয়েছে।

সব জেনেশুনেও রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের নোটিশ ?'

'উচ্ছেদের।'

'উচ্ছেদ !'

'হ্যাঁ ভাই।' অমল বলতে লাগল, 'চাকরি-বাকরি করি না ; এম-এ পড়তে পড়তে পড়াও ছেড়ে দিয়েছি। দামড়া বেকার ছেলেকে কতকাল আর পুষবেন ! বাবা ঠিকই করেছেন। নিজের পথ এবার নিজেকেই দেখতে হবে।'

আমি নিশ্চুপ।

অমল আবার বলল, 'বাবা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। অবশ্য—'

'কি ?'

'তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। ভাবছি—', বলতে বলতে অমল থেমে গেল।

উদ্বিগ্ন মুখে আমি জানতে চাইলাম, 'কি ভাবছ ?'

'তিন মাস এখানে থাকব না।'

'তবে ?'

'পনের দিন এখানে থাকছি। তার মধ্যেই অন্য একটা আস্তানা খুঁজে নেব। কি বল, পারব না ?'

উত্তর দিলাম না।

একটু ভেবে অমল আবার বলল, 'সারাদিন ঘুরে টায়ার্ড হয়ে এসেছ ; আর তোমাকে বিরক্ত করব না। আচ্ছা, এখন চলি। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল আমার, 'না-না, বিরক্ত মোটেও হচ্ছি না। খিদে নেই, আজ রাত্তিরে আর খাব না। তুমি বোসো।'

অমল বসল না, 'আজ আর না ভাই। তোমার ঘুম না পেলেও আমার পেয়েছে।' বলে একটুখানি হেসে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলে গেল।

আর আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। অমল চলে গেলে এ বাড়িতে থাকার আকর্ষণ আর আনন্দের প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার হাতে যদি এতটুকু ক্ষমতা বা উপায় থাকত, তাকে কিছুতেই এভাবে চলে যেতে দিতাম না।

একসময় আলোটালো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুলাম কিন্তু ঘুম এল না। অশ্রান্ত ক্ষুব্ধ গুঞ্জনের মত মাথার ভেতর অমল ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে হানা দিতে লাগল। আর তারই ফাঁকে একবার বিমলের কথা মনে পড়ে গেল। বিমল— বিমলও তো অমলের মতই নোটিশ পেয়ে বসে আছে। তার প্রতিক্রিয়াটা জানা গেল না।

কতক্ষণ বিছানায় ছটফট করেছি, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই।

পরের দুটো দিন আর বাড়ি থেকে বেরুলাম না। পিসেমশাইয়ের ডাইরি আর হিসেবের খাতাগুলো দেখে দেখেই কাটিয়ে দিলাম।

দুদিন পর পিসেমশাই বললেন, 'তুমি কিন্তু একটা কথা একেবারেই ভুলে গেছ চিরঞ্জীব।'

'আজ্ঞে—', আমি চকিত হলাম।

'হিরণ্ময় মানে আমার সেই বন্ধুটি তোমাকে ওর বাড়ি যাবার জন্যে বলে গিয়েছিল ; নিশ্চয় যাওনি—'

সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। সঙ্কুচিত বিব্রতমুখে বললাম, 'আজ্ঞে না। কতক-গুলো ঝঞ্ঝাটে এমন জড়িয়ে পড়েছিলাম—'

'কাল রাত্তিরে হিরণ্ময় আমাকে ফোন করেছিল।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

পিসেমশাই আবার বললেন 'তোমার কি ও-বেলা, এই ধরো সন্ধ্যেনাগাদ কোন কাজ আছে ?'

'আজ্ঞে না।' আমি মাথা নাড়লাম।

'তা হলে আজই একবার হিরণ্ময়ের বাড়ি যাও। বেচারা তোমার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে।'

'আজ্ঞে যাব।'

'আমি কিন্তু হিরণ্ময়কে ফোন করে দিচ্ছি।'

'দিন।'

'দেখো আবার ভুলেটুলে যেও না।'

'আজ্ঞে না।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা—', আমার চোখের ভেতরে তাকিয়ে পিসেমশাই শুধোলেন, 'হিরণ্ময়ের ঠিকানা তুমি জানো ?'

'জানি। সাদার্ন অ্যাভেনিউতে। নম্বরটা আমার খাতায় লেখা আছে।'

'গুড।'

সারাটা দিন খবরের কাগজ পড়ে, চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে, নানা অফিসে দরখাস্ত ছেড়ে কাটিয়ে দিলাম। (যদিও অলকাদি আশ্বাস দিয়েছেন তবু চাকরির জন্য দরখাস্ত ছাড়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।) তার ফাঁকে অবশ্য চান-খাওয়া এবং সামান্য একটু দিবানিদ্রাও সেরে নিয়েছি। তারপর সন্ধ্যের আগে স্যুটকেস থেকে পরিষ্কার জামাকাপড় বার করে পরে নিলাম। অবশেষে চুলটি ভাল করে আঁচড়ে ন্যাকড়ায় জুতোর উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাসে করে ঢাকুরিয়া লেক পর্যন্ত ; সেখান থেকে সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

চমৎকার রাস্তা। এখানে ট্রামের ঘর্ঘর নেই। দু'ধারে মসৃণ পীচের মাঝখান দিয়ে সবুজ ঘাসের আইল্যাণ্ড। মখমলের মত নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

শহরের এই প্রান্তটি মনোরম। এখানে ভিড় কম, উচ্চকণ্ঠ চিৎকার নেই বললেই চলে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, নানা রঙের মেলা বসে গেছে যেন। সুবেশ নরনারীর দল অলস মন্থর পায়ে লক্ষ্যহীনের মত বেড়াচ্ছে। আয়ার দল প্র্যাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভেতর ফুটফুটে ফুলের মত একেকটা বাচ্চা।

খানিকটা বেড়িয়ে একসময় হিরণ্ময় সোমের ঠিকানা খুঁজে বার করলাম। বিরাট কম্পাউণ্ডওলা সুদৃশ্য তিনতলা বাড়ি। সামনের দিকে নুড়ি বসানো পথ; তার দু'ধারে ঘাসের লন। ঝাউ গাছ, টেনিস কোর্ট, ফোয়ারা এবং আরো অনেক কিছু সুন্দরভাবে লনের গায়ে সাজানো।

হিরণ্ময় সোম কতখানি ভাগ্যবান, আর্থিক কৌলীন্যের কোন্ স্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠা—এই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তা যেন খানিক অনুমান করতে পারলাম।

যাই হোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলাম। ভেতরে ঢুকতে ভরসা হচ্ছে না। একেকবার দুঃসাহসে ভর করে যদিও বা দু-পা এগোই, সঙ্গে সঙ্গে দশ-পা পিছিয়ে আসি।

একটা উর্দিপরা নেপালী দারোয়ান গেটের কাছে বসে ছিল। আমার এই দ্বিধান্বিত ভাত ভাবটা হয়ত সে লক্ষ্য করে থাকবে। হঠাৎ লোকটা উঠে এল; আমার কাছাকাছি এসে বলল, 'আপনি কি ব্যানার্জিবাবু? চিরঞ্জীব ব্যানার্জী?'

'হ্যাঁ।' আমি অবাক। লোকটা কি খড়ি পাততে হাত গুণতে জানে?

আমার বিস্ময় বা বিমূঢ়তা খেয়াল করল না লোকটা। বলল, 'সাহাব বলে রেখেছেন, আপনি আসবেন। আসুন আমার সঙ্গে—'

'সাহাব কে?'

'সোম সাহাব—এ বাড়ির মালিক।'

'হিরণ্ময় সোম?'

'জী—আসুন।'

নেপালী দারোয়ান সামনের দিকে পা বাড়াল; আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

ষোল

দারোয়ানটা যেন অমোঘ নিয়তির মত আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্ধের মত আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

সমস্ত বাড়িটাই বুঝি কার্পেটে মোড়া। নিঃশব্দে সন্তর্পণে আমি হেঁটে যাচ্ছি। ডিসটেম্পার-করা দেয়ালে কোথাও সুদর্শন ওয়াল-ক্লক, কোথাও চমৎকার নিসর্গ চিত্র, কোথাও নামকরা শিল্পীর আঁকা রহস্যময় মিথুনমূর্তি। লবীতে অসংখ্য মর্মর-নগ্নিকা ; তাদের ফাঁকে ফাঁকে কারুকাজ-করা অগণিত টবে মরসুমী ফুল, বামনাবতার ক্যাকটাস, ছাতার আকারে পাইন গাছ। হিরণ্ময় সোম দেশ-বিদেশের অরণ্যকে টবের ভেতর বন্দী করে রেখেছেন। তাঁকে আর বন দেখবার জন্য বাইরে ছুটতে হয় না। ঘরে বসেই হিরণ্ময় তরাই কি সুন্দরবন, আমাজন কি কঙ্গো বেসিনের অরণ্যকে আস্বাদ করেন।

বেশি দূর যেতে হল না। দোতলায় আসতেই লাউঞ্জে হিরণ্ময়কে দেখতে পেলাম। গোলাকার বেতের চেয়ারে বসে সাদার্ন অ্যাভেনিউর দক্ষিণে লেকের দিকের অবারিত আকাশে তাকিয়ে আছেন।

এর ভেতর অন্ধকার নেমে গেছে—শীতের নিবিড় ঠাণ্ডা অন্ধকার। কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে তা দ্রুত গাঢ় হচ্ছে। এত গাঢ় এত জমাট যে, মনে হয়, ছুরি দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা যাবে। সাদার্ন অ্যাভেনিউর দু'ধারে কর্পোরেশনের লোকেরা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু কুয়াশা আর অন্ধকার ঠেলে তাদের নির্জীব অস্তিত্ব খুব বেশি জায়গা আলোকিত করতে পারেনি। আকাশটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। আজ চাঁদ উঠেছে কিনা, তারাদল ফুটেছে কিনা—বুঝবার উপায় নেই। আকাশে কেউ নেই, কিছু নেই। শেষ পাখিটিও ঘরে ফিরে গেছে।

আমরা কাছাকাছি এসে পড়লাম। দারোয়ানটা ডাকল, 'সাব—'

হিরণ্ময় খুব তন্ময় হয়ে ছিলেন সম্ভবত, চমকে উঠলেন। লাউঞ্জের এই অংশটায় আলো জ্বালা হয়নি। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'কে ?'

দারোয়ানটা জানাল, 'যে বাবুর আসবার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন।'

'আলোটা জ্বাল তো।'

দেয়ালে বোতাম টিপে আলো জ্বালল দারোয়ানটা ; তারপর চলে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল স্বরে হিরণ্ময় এবার বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তবে এলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মৃদুস্বরে বললাম।

'বোসো, বোসো—'

পাশাপাশি আরেকটা চেয়ারে বসলাম।

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

হিরণ্ময় বললেন, 'তোমার তো আরো আগে আসবার কথা ছিল।'

আবছা গলায় এবার বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে এত দেরি করলে যে ?'

চোখ-কান বুজে প্রায় মিথ্যেই বললাম, 'একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম।'

হিরণ্ময় এ কথার উত্তর দিলেন না।

দক্ষিণে লেকের দিক থেকে মাঘের শীতল বাতাস বইছিল। কনকনে হিম শরীরের অনাবৃত জায়গায় কেটে কেটে বসছে। হিরণ্ময় বললেন, 'আজ বড্ড ঠাণ্ডা, না ?'

পাতলা মলিদার চাদরের ভেতর কুঁকড়ে যেতে যেতে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দামী আরামদায়ক কাশ্মীরী শালের ওপর উষ্ণ বালাপোষ রয়েছে ; সেটাকে আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নিয়ে হিরণ্ময় শুধোলেন, 'ঠাণ্ডাটা কিন্তু বেশ লাগছে।'

আমি উত্তর দিলাম না।

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব, নেচারকে ভয় পেতে নেই। প্রকৃতির কাছ থেকে যত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে ততই সে তোমার পিছু নেবে। দেখবে, আজ জ্বর হচ্ছে, কাল মাথা টিপ টিপ করছে, পরশু গা টিস-টিস করছে। যতখানি পারবে নেচারের কাছে নিজেকে এক্সপোজ করে রাখবে।'

আমি পূর্ব বাংলার ছেলে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী দিয়ে ঘেরা যে দেশ ; তার অবারিত প্রান্তর, মুক্ত মাঠ, হু-হু বাতাস, অফুরন্ত রোদ আর অজস্র বর্ষণ থেকে কণা কণা প্রাণ শুষে নিজেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমাকেই কিনা কলকাতা নামে বিশাল নগরের এক কৃত্রিম হ্রদের ধারে মোজেক করা এক লাউঞ্জে বসে বালাপোষ-মোড়া এক শহুরে-পোকার কাছে প্রকৃতির পাঠ নিতে হচ্ছে। হাসব না কাঁদব, বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে অনুভব করতে

লাগলাম, পাতলা জ্যালজেলে মলিদা মাঘের বাতাসের বিরুদ্ধে আর দুর্গ খাড়া রাখতে পারছে না। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমি যে একেবারে জমে যাব, তাতে সন্দেহ নেই।

এলোমেলো অসংলগ্ন দু-চারটে কথার পর আমার ওপর বুঝি করুণাই হল হিরণ্ময়ের। কিংবা এই উন্মুক্ত লাউঞ্জে বসে থাকতে তাঁর নিজেরই হয়ত কষ্টই হয়ে থাকবে। হিরণ্ময় বললেন, 'চল, ঘরে গিয়ে বসি।'

আমাকে ডানদিকের প্রকাণ্ড একখানা ঘরে নিয়ে এলেন তিনি।

সোফা, কার্পেট, দামী দামী সুদৃশ্য আসবাব, জানলার সার্সি আর মনোহর পর্দা—বড়লোকের রুচিশোভন গৃহসজ্জার জন্য যা-যা দরকার সবই এখানে আছে। সবার ওপরে যা আছে তা হল আরামপ্রদ উত্তাপ। এক কোণে ফায়ার প্লেসেরও ব্যবস্থা। মাঘের হিমের সাধ্য নেই, এই কেল্লায় ঢুকতে পারে। বাইরের দেয়ালে ঘা খেয়ে পরাভূত হয়ে সে ফিরে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে হাতে পশমের দস্তানা পরে নিলেন হিরণ্ময়, কম্ফর্টার দিয়ে গাল-গলা-কান জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব—'

আমি উন্মুখ হলাম, 'আজ্ঞে—'

হিরণ্ময় বললেন, 'বাইরে এত ঠাণ্ডা অথচ—অথচ তুমি জানো কি—', বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ভীরু গলায় আবার বললাম, 'আজ্ঞে—'

'এই কলকাতা শহরে কত লক্ষ লোক রাস্তায় রাত কাটায়?'

আমি চুপ করে রইলাম।

হিরণ্ময়ের উত্তেজনা বাড়তে লাগল, 'অন্য লোকের কথা বাদ দাও; কত রেফিউজি যে হিমের ভেতর রাস্তায় পড়ে থাকে তার হিসেব নেই।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর অতল খাদে নেমে গেল, 'বড় কষ্ট ওদের চিরঞ্জীব। এত কষ্ট তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।'

উষ্ণ আরামদায়ক ঘরের ভেতর কম্ফর্টার কাশ্মীরী শাল আর বালাপোষ জড়িয়ে হিরণ্ময় সোম শীতার্ত উদ্বাস্তদের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আমি বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইলাম।

হিরণ্ময় একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কী খাবে, বল। চা না কফি?'

চা বা কফি, কোন কিছুতেই আমি অভ্যস্ত না। বললাম, 'যা হয়—'

হিরণ্ময় ডাকলেন, 'পুনিয়া—পুনিয়া—'

পুনিয়া হিন্দুস্থানী চাকর। দরজার বাইরে সে দাঁড়িয়ে অথবা বসে ছিল।

ডাকামাত্রা ছুটে এল।

হিরণ্ময় বললেন, 'কফি আর কাটলেট-টাটলেট যা আছে নিয়ে আয়।'

পুনিয়া চলে গেল। হিরণ্ময় এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'এই শীতের রাত্তিরে গরম গরম কাটলেট বেশ ভালই লাগবে, নাকি বল!'

আমি আর কি বলব, নীরবে বসে রইলাম।

যতক্ষণ না কফি আর কাটলেট এল, মাঘের হিমশীতল রাতে পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের কষ্টের কথা বলে বলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে আবহাওয়াটাকে ভারাক্রান্ত করে রাখলেন হিরণ্ময়।

খাবার এলে পুনিয়ার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। কাঁটা চামচগুলো একধারে ছুঁড়ে দিয়ে মাস্টার্ডে কাটলেট ডুবিয়ে কামড় বসালেন; তারপর একমুঠো কাঁচা পেঁয়াজ, শশার কুচি আর টোমাটোর টুকরো মুখে পুরলেন। কয়েক কামড় খেয়ে কফিতে গলা ভিজিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় বললেন, 'রিফিউজিদের কি যে ট্র্যাজেডি, কল্পনাও করা যায় না। সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কলকাতায় কি স্ট্রাগ্‌ল্ যে তাদের করতে হচ্ছে, দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। মাথা গোঁজার জায়গা নেই, দু'বেলা দু'মুঠো—বুঝলে চিরঞ্জীব—'

আমি ধীরে ধীরে খাচ্ছিলাম; মুখ তুলে তাকালাম।

কাটলেটের বিরাট একটা অংশ দাঁতে কেটে নিয়ে স্যালাড দিয়ে চিবুতে চিবুতে অবরুদ্ধ গলায় হিরণ্ময় বললেন, 'দু'মুঠো খাবারও ওদের জোটে না। লঙ্গরখানা থেকে যে খিচুড়ি-টিচুড়ি দ্যায় তাতে কোন ফুডভ্যালু নেই। স্বাদও তেমনি; ঐ সব খেয়ে হেলথের বারোটা বেজে যাবে। ঐ রকম যদি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেতে হয়, ওদের আর আশা নেই। জেনারেসনকে জেনারেসন দুর্বল অসুস্থ পঙ্গু হয়ে পড়বে।'

দেশের মাটি থেকে যদিও আমি উন্মূল, মনে মনে উদ্বাস্তু হবার যন্ত্রণা যদিও বহন করে বেড়াই, তবু সীমান্তের এপারে এসে নিতান্ত প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য প্রতি মুহূর্তের নিয়ত সংগ্রাম আমার নেই। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছি। শীতের হিম বা সুস্বাদু হিতকর খাদ্যের অভাব আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। শীতের রাতে লোভনীয় খাদ্য এবং পানীয়ে পাকস্থলী পূর্ণ করে ভারী লেপের সুখদায়ক উত্তাপ গায়ে মেখে গাঢ় পরিতৃপ্ত ঘুমের ভেতর ডুবে যাই। আমার যন্ত্রণা আমার দুঃখ পুরোপুরি মানসিক; দেহে তার আঁচড় পড়ে না।

হিরণ্ময় যা বলেছেন তার ষোল আনাই সত্যি। নিজের চোখে সেদিন

শিয়ালদা স্টেশনে লঙ্গরখানার সদাব্রত দেখে এসেছি। যে দেশ ফলে-ফসলে পরিপূর্ণ, যে দেশে দুধের স্রোত বয়ে যায়, যে দেশের বিলে আর নদীতে হাত দিলেই চকচকে রুপোর পাতের মত মাছ—সেখানকার মানুষ দু'হাতা করে বিস্বাদ বিবর্ণ খিচুড়ির জন্য পশু হয়ে গেছে।

কাটলেট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পুনিয়াকে ডেকে চপ আনালেন হিরণ্ময়, ফ্রাই আনালেন, পুডিং আনালেন। আমি অবশ্য কাটলেটেই থেমে গেছি।

খেতে খেতে উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গই চলতে লাগল। বিশেষ করে তাদের খাবার ব্যাপারটা। তারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, মাছ পাচ্ছে না, একটুকরো মাংস পাচ্ছে না। সবই ঠিক কিন্তু ফ্রাই-চপ মুখে পুরে সে কথা বললে আমার পক্ষে নির্বিকার বসে শুনে যাওয়া বুঝিবা অসম্ভব। নিজের সত্তার ভেতর নিদারুণ এক অস্বস্তি নিয়ে আমি ছটফট করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আপনি যে জন্যে আমাকে আসতে বলেছিলেন—"

হিরণ্ময় বললেন, 'তাড়ার কি আছে, ডেকেছি যখন বলব বৈকি।'

'আজ্ঞে—'

'কী হল আবার ?'

'অনেক রাত হয়ে গেল। আমাকে আবার যাদবপুর ফিরতে হবে। দশটার পর ওখানকার বাস পাব না।'

'এমন কিছু রাত হয়নি।' কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নিলেন হিরণ্ময়, 'মোটে ন'টা। রাত যদি বেশিই হয়, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

কতক্ষণ এখানে আটকে থাকতে হবে, কে জানে। ক'দিন থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে বিছানায় নিজেকে সঁপে দিতে পারলে আরাম বোধ করতাম। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না।

হিরণ্ময় কি একটু ভাবলেন। আমার মনের কথা ইতিমধ্যে তিনি পড়ে নিতে পেরেছেন কিনা জানি না। একসময় করুণার সুরে বললেন, 'ভয় নেই। বেশিক্ষণ তোমাকে আটকে রাখব না। তোমার তো এ বাড়িতে নেমন্তন্ন। আধ ঘণ্টাটাক বাদে আমরা খেতে বসব। সেদিন মোটামুটি আভাস তোমাকে দিয়ে এসেছি ; বাকিটা খেতে খেতে বলব।'

মনে পড়ে গেল। উদ্বাস্তুদের জীবন সম্বন্ধে ভদ্রলোকের প্রচণ্ড কৌতূহল। সেদিন এ ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্নও করেছিলেন। কিন্তু শিশির মুখুটির স্ত্রীকে পুড়িয়ে সেইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরেছি। শরীর ছিল অস্বাভাবিক ক্লান্ত ; মন

বিষণ্ণ। কথা বলতে তখন ভাল লাগছিল না। হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আরেক দিন হিরণ্ময়ের সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

উদ্বাস্তু-জীবন চকিত ছায়া ফেলেই মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে তুলল। আধ ঘণ্টা পর হিরণ্ময় আমাকে নিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিতে চাইছেন। অথচ এইমাত্র যে বিপুল পরিমাণ চপ-কাটলেট-ফ্রাই তিনি পাকস্থলীতে চালান করেছেন তাতে আধ ঘণ্টার ভেতর আবার তাঁর খিদে পেতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

আধ ঘণ্টা আর কতটুকু সময়! যুগ-যুগান্ত তো নয়। দেখতে দেখতে তা ফুরিয়ে গেল। ডানদিকে দেয়ালে যে চৌকো ঘড়িটা আটকানো তার কাঁটা দুটো অবিরাম দাঁড় বেয়ে সময় মাপছিল। হঠাৎ ঠুন্ করে একটা শব্দ হতেই ওয়াল-ক্লকটার দিকে তাকালেন হিরণ্ময়। বললেন, 'সাড়ে ন'টা বাজে। চল চিরঞ্জীব—', বলেই হাতের ভর দিয়ে সোফা থেকে উঠে পড়লেন।

দেখাদেখি আমিও উঠলাম।

ঘরের বাইরে আসতেই দেখা গেল একটা টুলের ওপর শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুনিয়া বসে আছে। আমাদের দেখেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হিরণ্ময় তাকে বললেন, 'যা, টেবিল সাজাতে বল্ গিয়ে—'

ঊর্ধ্বশ্বাসে পুনিয়া ছুটে গেল।

হিরণ্ময়ের পিছু পিছু কতকগুলো ঘর কতকগুলো করিডর পেরুলাম, হিসেব নেই। একসময় বিশাল এক হলঘরে এসে পড়লাম। ঘরখানা যথারীতি দামী নক্সাকরা কার্পেটে মোড়া; দরজায়-জানলায় মনোরম পর্দা ঝুলছে। এই শীতের রাতে তাকে উষ্ণ আরামপ্রদ রাখার জন্য চার কোণে চারটে বৈদ্যুতিক উনুন জ্বলছে।

ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর ধবধবে চাদর পাতা। তার ওপর কাঁটা-চামচ-ফর্ক-ন্যাপকিন-গেলাস-প্লেট চমৎকার করে সাজানো। একধারে ঝকঝকে বেসিন, ট্যাপ, তোয়ালে আর সাবান রয়েছে। বেসিনটার ঠিক ওপরে প্রকাণ্ড আয়না। আরেক ধারে রেডিওগ্রাম। ভেতর দিকের দরজার কাছে উর্দিপরা দু-তিনটে বয় দাঁড়িয়ে আছে।

হিরণ্ময় বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে নেবে তো নাও; ঐ যে বেসিন।'

মুখটুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুছে নিলাম। হিরণ্ময়ও হাত-টাত ধুয়ে বললেন, 'এসো, বসা যাক।'

আমরা গিয়ে টেবিলের কাছে গদিমোড়া চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম। প্রায়

সঙ্গে সঙ্গে এ ঘরে যে এসে ঢুকল, এই মুহূর্তে সে ছিল অভাবনীয়া। আমার সুদূর কল্পনাতেও তার চিহ্নমাত্র ছিল না।

কত বয়েস হবে তার? কুড়ি-একুশের মধ্যেই। গায়ের রঙ আগুনের উপমা। সরু কোমরের তলার দিকে বিশাল অববাহিকা, ওপর দিকে সে উদ্ধত। চুল লালচে, কাঁধ পর্যন্ত বব-করা। পেন্সিলে-আঁকা সরু ভুরু। তীক্ষ্ণ ধারাল নাক একেবারে কপাল থেকে নেমে এসেছে; তার দু-ধারে দীর্ঘ চোখ। মণি দুটো কিন্তু কালো না; নীলাভ। চোখের ভেতর দু-বিন্দু সমুদ্রকে ধরে রেখেছে সে।

আশ্চর্য, শীতের এই রাতে তার গায়ে না আছে স্কার্ফ, না কোট। শরীরের অনেকখানিই তার উন্মুক্ত। স্লীভলেশ জামা, ঝুলটা কোমর পর্যন্ত নামেনি। ফলে পেটের কাছটা এই রাত্রিবেলাতেও রৌদ্রঝলকের মত দেখাচ্ছে! অনাবৃত মসৃণ বাহু যেন স্বর্ণময়; লম্বা লম্বা নখগুলো গাঢ় রঙে রঞ্জিত। পরনের শাড়িটা ঝকঝকে, স্বচ্ছ। ঠোঁটে এবং গালেও তার রঙ।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার স্নায়ু ঝিম ঝিম করতে লাগল।

হিরণ্ময় বললেন, 'আমার মেয়ে রিনকি—ভাল নাম অবশ্য বিশাখা।'

আমার বিস্ময় বা আচ্ছন্নতার ঘোর তখনও কাটেনি। প্রথম পরিচয়ের পর নমস্কার জানানো যে ভদ্রতা সে কথা আমার খেয়াল রইল না। এই শীতের রাতে কেউ (তা সে যেই হোক, শিরায় শিরায় যৌবনের টগবগে ফুটন্ত রক্ত যতই প্রবাহিত হোক) যে এভাবে শরীরের এতখানি অংশ অক্লেশে উন্মুক্ত রাখতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না।

বিশাখা বলল, 'এঁর কথাই তো তুমি বলেছিলে বাবা?'

'হ্যাঁ।' হিরণ্ময় ঘাড় কাত করলেন, 'তোর মা কোথায়?'

'ঘরে। এক্ষুনি আসছে—'

বিশাখার কথা শেষ হতে না হতেই একটি মহিলা এ ঘরে এলেন। সাজসজ্জা আর প্রচুর প্রসাধনের তলা থেকে তাঁর আসল বয়েস অনুমান করা অসাধ্য ব্যাপার। তবে চল্লিশ যে পেরিয়ে গেছেন তাতে সংশয় নেই। চোখে-মুখে নাকে-চিবুকে-আঙুলে পুরোপুরি বিশাখার আদল বসানো। বয়স হলেও, বর্ষার দিক-ভাসানো ঢল পেরিয়ে এসে সর্বাঙ্গে হেমন্তের টান ধরলেও অস্তগামী রূপের শেষ ছটাটি এখনও ধিকধিকি জ্বলছে।

মহিলাটি কে? বিশাখার দিদি না মা?

যে প্রশ্নটা মনের ভেতর উঁকি দিয়েছে তার উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। বিশাখা মধ্যবয়সিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তুমি কিন্তু আজ

সাত মিনিট লেট। অলরেডি ন'টা সাঁইত্রিশ হয়ে গেছে। সাড়ে ন'টায় আমরা ডিনারে বসি।'

বুঝলাম, সাড়ে ন'টায় খেতে বসা এ বাড়ির নিয়ম এবং মহিলাটি বিশাখার দিদি নন, মা।

মহিলা বললেন, 'ক্লাব থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। তাই লেট হয়েছি। পরশুদিন তুমিও হাফ এন আওয়ার লেট ছিলে। সে যাক গে, সেই ছেলেটি এসেছে—সেই যে রেফিউজি?'

বিশাখার বদলে এবার হিরণ্ময়ই উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, এই তো।'

এবার আর ভুল হল না। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালাম।

প্রতি-নমস্কার করে মধ্যবয়সিনী বললেন, 'বোস! "তুমি" করেই কিন্তু বললাম।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, "তুমি" করেই তো বলবেন। "আপনি" করে বললে আমি অস্বস্তি বোধ করব।'

আমরা সবাই বসলাম। তারপর ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমার নামটি কিন্তু জানা হয়নি—'

নাম বললাম।

'চিরঞ্জীব—চিরঞ্জীব—', বার দুই উচ্চারণ করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'বেশ নাম, সুন্দর নাম—'

আরো দু-চারটে কথার পর মহিলা বেয়ারাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'খাবার দাও—'

খাবার এল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়া চলল। তারপর হিরণ্ময় ডাকলেন, 'বুঝলে চিরঞ্জীব—'

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

হিরণ্ময় বললেন, 'এই যে ইণ্ডিয়া পার্টিশান হল; এত বড় ট্র্যাজেডি আমাদের দেশে আর কখনও হয়নি। তুমি যদি মাইনিউটলি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ো, তা সে হিন্দু পিরিয়ডই হোক আর মুসলিম পিরিয়ডই হোক, এমন মারাত্মক দুঃখের দিন আর কখনও আসেনি। সমস্ত জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে এ একটা কার্স—অভিশাপ।'

হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, আবেগপূর্ণ। বলার ভঙ্গিটি চমৎকার। নিমেষে আমকে তা অভিভূত করে ফেলল। অস্ফুট গলায় বলতে চেষ্টা করলাম, 'আপনি

যা বলেছেন তা ঠিক ; এমন অভিশাপ এমন বেদনা এদেশের মাথায় আর কখনও নেমে আসেনি।'

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'জানো চিরঞ্জীব, পার্টিশানের কথা উদ্বাস্তুদের কথা ভাবতে ভাবতে এক-একদিন আমি কেঁদে ফেলি। কত রাত যে না ঘুমিয়ে ছটফট করে কাটিয়েছি তার হিসেব নেই।'

বিশাখা এই সময় বলে উঠল, 'বাবার মনটা বড্ড সফ্‌ট্‌ ; অন্যের দুঃখে একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে।'

সেই মহিলাটি অর্থাৎ হিরণ্ময়ের স্ত্রী বললেন, টোটালি আনপ্র্যাকটিক্যাল ; এমন মানুষ নিয়ে ঘর করা কঠিন কাজ। পার্টিশানের পর থেকে ঘরসংসার ভুলেছে ; ভাল করে খায় না পর্যন্ত ; এই ক' বছরে পনের-কুড়ি পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলেছে—দিন রাত শুধু উদ্বাস্তু আর উদ্বাস্তু।'

শরীরের ওজন কমেছে কিনা, রাতের ঘুম ছুটেছে কিনা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তবে খাওয়ার ব্যাপারে আমি একমত না। খানিক আগে অতগুলো চপ-কাটলেট পাকস্থলীতে চালান করার পর এই মুহূর্তে হিরণ্ময় যে-পরিমাণ খাচ্ছেন তাতে আমার চোখের তারা স্থির হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক হিরণ্ময় এবার বললেন, 'কিছু একটা করা দরকার ; বুঝলে চিরঞ্জীব—কিছু একটা না করলে চলবে না। ভাবছি—', বলে থেমে গেলেন।

আমি উন্মুখ হলাম।

হিরণ্ময় বললেন, 'ভাবছি পার্টিশান নিয়ে আমি একখানা বই লিখব। নাম দেব 'পার্টিশান অ্যাণ্ড ইটস পার্সপেকটিভ' কিংবা 'পার্টিশান অ্যাণ্ড টীয়ার্স অফ বেঙ্গল'। কোন নামটা তোমার বেশি পছন্দ ?'

'আজ্ঞে, দুটো নামই ভাল।'

'তবু ?'

আমি চুপ করে থাকলাম।

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'পর্টিশান অ্যাণ্ড টীয়ার্স অফ বেঙ্গল'টা অনেক বেশি মীনিংফুল, নাকি বল ? একেবারে বুকের ভেতর ধাক্কা দ্যায়—'

আমাকে সায় দিতেই হল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নাম দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ইংরেজিতেই লিখব। তারপর সেটা নিয়ে দিল্লীর কর্তাদের দেখিয়ে আসব। বলব লর্ড কার্জন বাংলা দেশের যে সর্বনাশ করতে পারেনি স্বাধীনতা আনতে গিয়ে আজ তাই ঘটে গেছে। বইটা হবে পার্টিশানের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। আর এ ব্যাপারে—'

'এ ব্যাপারে কী ?'

'আমাকে তোমায় সাহায্য করতে হবে।'

'কিভাবে ?'

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে হিরণ্ময় বললেন 'আমি কখনও পূর্ব-বাংলায় যাইনি। দেশ ভাগের আগে এবং পরে সেখানে যা-যা ঘটেছে, তুমি যা-যা দেখেছ, শুনেছ, অনুভব করেছ—সমস্ত খুঁটিনাটি সাজিয়ে গুছিয়ে একটা খাতায় লিখে ফেল। তুচ্ছ বলে আজেবাজে বলে কিছু বাদ দেবে না। কোনটা রাখব আর কোনটা ফেলে দেব তা আমি ঠিক করব।'

আমি উত্তর দিলাম না।

হিরণ্ময় বললেন, 'এমনি এমনি তোমাকে খাটাব না। এর জন্যে যা পারিশ্রমিক লাগে দেব। কত চাও, বল ?'

বিদ্যুৎ চমকের মত সুরেশের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সুরেশের সঙ্গে তুলনা চলে না তবু তার মত হিরণ্ময় সোমও উদ্বাস্তু-প্রেমিক।

হিরণ্ময় আবার বললেন, 'চুপচাপ কেন ? বল ?'

'আজ্ঞে, এক্ষুনি কি করে বলি। একটু ভেবে পরে বলব।'

'এর ভেতর ভাবাভাবির কি আছে ?'

আমি নিরুত্তর।

আমার মনোভাব বোধ হয় বুঝতে পারলেন হিরণ্ময়। বললেন, 'আচ্ছা ভেবেই বোলো ; দু-একদিনের ভেতরেই বলবে। কাজটা আমি তাড়াতাড়িই শুরু করতে চাই। আর—'

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

'দ্যাখো চিরঞ্জীব, ভাবাভাবিতে সময় নষ্ট করে কিছু লাভ নেই।' হিরণ্ময় বলতে লাগলেন, 'কাজটা করো, দেখবে খুব ভাল লাগছে।'

বিনীত স্বরে আগের উত্তরটাই দিলাম, 'আজ্ঞে একটু না ভেবে—'

'বেশ বেশ ; না ভেবে যখন বলবে না তখন ভেবেই বোলো।'

কথায় কথায় একসময় খাওয়া শেষ হল।

সাড়ে ন'টায় খেতে বসেছিলাম। খাওয়া যখন শেষ হল তখন প্রায় এগারটা।

হিরণ্ময় বললেন, 'যাদবপুরের বাস কি এখন পাবে ?'

জানালাম, সওয়া দশটার ভেতরেই ওদিকের বাস বন্ধ হয়ে যায়।

'তা হলে ড্রাইভারকে বলি ; সেই-ই তোমাকে দিয়ে আসুক।'

এই সময় বিশাখা বলে উঠল, 'ড্রাইভার তো নেই। ক'দিনের ছুটি দিয়ে সেদিন দেশে পাঠালে না?'

'তাই তো!' হিরণ্ময়কে চিন্তিত দেখাল, 'এই শীতের রাত্তিরে এখন কে ওকে দিয়ে আসে?'

হঠাৎ বিশাখা বলে বসল, 'ড্রাইভার যখন নেই তখন আমিই দিয়ে আসি।'

হাতের কাছে সমস্যার সমাধানটা পেয়ে গেছেন। খুশী গলায় হিরণ্ময় বললেন, 'তা হলে তো ভালই হয়। যা, চিরঞ্জীবকে পৌছে দিয়ে আয়।'

বিশাখা আমার সঙ্গিনী হয়ে যাদবপুর যাবে; ভাবতেই স্নায়ুর ভেতর দিয়ে এস্রাজে দ্রুত ছড় টানার ঝঙ্কার বয়ে যেতে লাগল।

সতেরো

নীচে নেমে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করল বিশাখা। সামনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'উঠুন চিরঞ্জীববাবু—'

আজ রাত্তিরে বিশাখার হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছেন হিরণ্ময় সোম; সে-ই আমাকে যাদবপুর পৌছে দেবে।

বিশাখা আমাকে যেখানে বসতে বলেছে তার পাশেই ড্রাইভারের সীট। আমি যদি ওখানে বসি আমার গা ঘেঁষে বসে বিশাখাকে গাড়ি চালাতে হবে। উঠব কি উঠব না—এই দুয়ের মাঝখানে দোল খেতে লাগলাম।

বিশাখা তাড়া দিল, 'কি হল? উঠুন—'

খানিক ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত স্বরে বলাম, 'আমি পেছনের সীটে বসছি।'

আঁকা ভুরুর তলা থেকে দুটি দীর্ঘ অবাক চোখ আমার মুখে স্থির করে বিশাখা বলল, 'পেছনে বসবেন কেন?'

বিশাখার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিলাম না, ভয়ানক অস্বস্তি লাগছিল। মুখ নামিয়ে আস্তে করে বললাম, 'এমনি—'

'আপনি ভারি গোঁয়ার তো। মেয়েদের সম্মান রাখেন না।'

আমি চুপ।

বিশাখা নাক কুঁচকে কেমন করে যেন হাসল। বলল, 'আমি বাঘও না ভালুকও না। টপ করে গিলে ফেলবার সাধ্যও আমার নেই। উঠুন—উঠুন।'

তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। যে মোহময়ী তরুণী শীতরাতের মধ্যযামে

একা একা আমাকে নিয়ে যাদবপুরের পথে পাড়ি জমাতে পারে তার পাশাপাশি বসতে কেন জানি ভরসা হয় না।

যাই হোক বিশাখা এবার জোর করেই আমাকে সামনের সীটে বসাল। তারপর ঘুরে গিয়ে ওধারের দরজা খুলে ড্রাইভারের সীটে বসতে বসতে বলল, 'সামনের সীটে বসলে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। পেছনে বসলে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে কতক্ষণ আর গল্প করা যায়!'

অস্পষ্ট জড়ানো গলায় কী বললাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না।

আর কিছু না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল বিশাখা ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হিরণ্ময় সোমের বাড়িতে বোঝা যায়নি ; কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল জানুযারী মাসের এই শীতল রাত্রে কলকাতা মৃতের মত আড়ষ্ট হয়ে আছে। ডাইনে এবং বাঁয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে যেদিকে যতদূর তাকানো যায় শুধু নির্জনতা। সন্ধ্যেবেলায় সেই বাদামওলারা, মশলামুড়িওলারা, বেলুনওলারা, প্র্যাম ঠেলা আয়ার দল কিংবা সৌখীন বায়ুসেবী—সবাই এখন উধাও। ঘন কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে আছে। কলকাতা শহর এই মুহূর্তে সারা গায়ে আরামদায়ক উষ্ণতা মেখে লেপের তলায় ডুব দিয়েছে।

যাদবপুরের দিকে খানিক এগিয়ে হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল বিশাখা।

আমি শুধোলাম, 'কী হল ?'

বিশাখা আমার দিকে ফিরে বলল, 'একটা কথা ভাবছি।'

'কী ?'

আপনার কি এক্ষুনি বাড়ি ফেরা দরকার ?'

বিশাখার প্রশ্নটার ভেতর একটা অনুচ্চারিত দিক ছিল ; আমাকে তা চকিত করে তুলল। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে—'

বিশাখা বলল, 'মানেটা কী ?'

'আমি যেখানে থাকি, দশটার ভেতর সেখানে ফিরতে হয়। নইলে—'

'নইলে—?'

'গেট বন্ধ হয়ে যায়।'

নিটোল কোমল কব্জি ঘুরিয়ে বিশাখা ঘড়ি দেখল, বলল, 'ইট ইজ অলরেডি ইলেভেন।'

আমি চঞ্চল হলাম। অজান্তে গলার ভেতর থেকে ভয়ের অব্যয় বেরিয়ে এল, 'ইস—'

বিশাখা বলল, 'এগারোটা যখন বাজে, আপনাদের গেট নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে।'

'ভাল হয়েছে! কী বলছেন আপনি!' আমি রীতিমত অস্থির হয়ে পড়লাম।

'ঠিকই বলছি। গেট যখন বন্ধ--' নিশ্চিন্ত সহজ ভঙ্গিতে বিশাখা বলল, 'আজ আর আপনার বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। ফিরে লাভই বা কী? তার চাইতে আমি যা বলছি তাই করুন।'

গলা শুকিয়ে আসছিল। বললাম, 'কী করতে বলছেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না বিশাখা। সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখাল, 'দেখুন—দেখুন—'

দেখলাম; কিন্তু বিশাখা কী বলতে চায় বুঝতে পারলাম না।

বিশাখা আবার বলল, 'দেখছেন তো রাস্তাটা কেমন নির্জন। শীতের মিড-নাইট ছাড়া কলকাতার রাস্তায় এমন দৃশ্য আপনি ভাবতেও পারবেন না। সব সময় এখানে ঠেলাঠেলি, ভিড়। নির্ভাবনায় গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

আমি চুপ। অন্যমনস্কের মত ভাবতে লাগলাম, এখনও যদি ফিরতে পারি নিশ্চয়ই ভেতরে ঢুকতে পারব। সেদিনকার মত হয়তো অমল আমার জন্য জেগে বসে আছে। দিনের পর দিন ওদের তিন ভাইকে দরজা খুলে দিয়েছি; একদিনের জায়গায় দু'দিন কি আর অমল আমার জন্য জেগে বসে থাকবে না?

অমলের কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, পিসেমশাই তাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছেন। সুস্থ শিক্ষিত সাবালক ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে তিনি আর রাজী নন। অমল কি তা হলে চলে গেছে? যেতেও পারে, আবার নাও যেতে পারে। দুয়েরই সম্ভাবনা সমান সমান তবু একবার মনে হল, যাবার আগে অমল কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না?

অমল ছাড়া আরো দুজন আছে—বিমল এবং রিণ্টু। তারাও নিশাচর। কতবার তাদের দরজা খুলে দিয়েছি, হিসেব নেই। কিন্তু বিমলদের ভরসা বিশেষ করি না। রাত জেগে বসে থাকার ব্যাপারে ওরা কতখানি পরার্থপর হবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।

বিশাখা ডাকল, 'চিরঞ্জীববাবু—'

দূরমনস্কতা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকালাম।

বিশাখা বলল, 'বাড়ি ফেরার যখন আপনার অসুবিধে তখন খানিকটা বেড়ানো যাক।' গাড়িতে আবার স্টার্ট দিল সে।

আমি আঁতকে উঠলাম, 'না—না—'

'না কী মশাই! আমার কোন কথাতেই তো 'হ্যাঁ' বলছেন না!'

কী উত্তর দেব, ভেবে পেলাম না।

বিশাখা বলতে লাগল, 'আপনি কেমন ইয়ংম্যান! এতটুকু শিভালরি নেই!' বলেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল।

এবার আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, আজ থাক বিশাখা দেবী; আরেক-দিন না হয় আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

'আরেক দিনের কথা অরেক দিন ভাবা যাবে। আজকের রাতটা মাটি করে দেবেন না। প্লীজ—'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'আপনাকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আমার জন্যে আপনার দেখছি খুব চিন্তা—' ঠোঁটের প্রান্তে সূক্ষ্ম রেখায় অদ্ভুত হাসল বিশাখা।

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'হ্যাঁ। মানে—'

'কী?'

'ফিরতে দেরি হয়ে গেলে আপনাদের বাড়ির লোক নিশ্চয়ই খুব ভাববেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন চিরঞ্জীববাবু। আই অ্যাম সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন-আপ; আমার জন্যে কেউ ভাববে না। মাঝে মাঝে দু'চারদিন আমি ফিরিও না। কখন ফিরলাম, কখন বেরুলাম, এসব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। আসল ব্যাপারটা কী জানেন?'

'কী?'

'মাথা ঘামানোর মত যথেষ্ট সময় কারো নেই।'

ভূমণ্ডলের সুদূর প্রান্তে পূর্ব বাংলার এক শান্ত স্নিগ্ধ নগণ্য গ্রাম থেকে ছিটকে আসা ভীরু যুবক আমি। দেশভাগ না হলে কোনদিনই হয়তো কলকাতায় আসা হত না। এলেও এভাবে এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই না। কাজেই বিশাখার মত মেয়ে অজানা অচেনা থেকে যেত।

আমার নরম নিরীহ স্নায়ুর পক্ষে বিশাখা অসহ্য। দু'চারদিন বাড়ি ফেরে না, অচেনা যুবকের সহচরী হয়ে শীতের সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে চায়—আমার সুদূর কল্পনাতেও এমন মেয়ের অস্তিত্ব ছিল না। মেয়ে বলতে দুজনকেই আমি চিনি, বুঝি। তারা আমার বোন এবং মা। আমার সমস্ত ভুবন জুড়ে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। এর বাইরে এতকাল যাদের দেখেছি তারা আমার মা

আর বোনেরই প্রতিচ্ছবি। সেদিক থেকে বিশাখা ভয়াবহ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বৈকি।

বিশাখার কথা ভাবতে গিয়ে বিদ্যুৎচমকের মত আরেক জনকে মনে পড়ে গেল—সে অলকাদি। এই দু'জনের ভেতর আশ্চর্য মিল।

গাড়িটা রাস্তা ঘুরে রসা রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। চমকে উঠে বললাম, 'দয়া করে আমাকে যাদবপুর দিয়ে আসুন।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল বিশাখা।

আমি সমানে বলতে লাগলাম, 'যাদবপুর দিয়ে আসুন, যাদবপুর দিয়ে আসুন—'

'আপনি ভীষণ বেরসিক।'

'প্লীজ—'

'আপনি ক্রুয়েল—'

'আমাকে দয়া করুন।'

'আপনি হার্টলেস, সেল্‌ফ্-সেণ্টার্ড।' বিশাখা বলতে লাগল, 'নিজে ছাড়া খুব সম্ভব আর কোনদিকে আপনার নজর নেই। অথচ—'

বিশাখার কথা আমি বুঝিবা শুনতে পাচ্ছিলাম না। করুণ মিনতিপূর্ণ সুরে যাদবপুর পৌঁছে দেবার কথাটাই একটানা বলে যাচ্ছি।

বিশাখা আমার কথায় কান দিচ্ছে না। আপন মনে বলে যাচ্ছে, 'অথচ জানেন, আমি যদি কারোকে আমার সঙ্গে রাত কাটাতে বলি সে স্বর্গ হাতে পেয়ে যাবে। রাত কাটানো তো দূরের কথা, আগুনে ঝাঁপ দিতেও বললে তাই দেবে। আর আপনি কিনা—'

'আমি কী?'

'যাদবপুর যাবার জন্যে নাকে কেঁদে চলেছেন!'

বললাম, 'আপনি তো জানেন না, আমি পরের বাড়ি থাকি। সেখানে খুব কড়াকড়ি। রাত্তিরে দশটার ভেতর না গেলে খুব মুশকিল।'

'আপনি কোথায় থাকেন, আমি জানি।' বিশাখা বলল।

'কোথায় বলুন তো?'

'চিত্তজেঠুর বাড়ি।'

'তবে তো ওঁকে আপনি চেনেন।'

'চিনব না! উনি আমার বাবার কতদিনের বন্ধু। আমার ছেলেবেলা থেকে

চিত্তজেঠুকে দেখে আসছি।'

বললাম, 'তা হলে নিশ্চয়ই জানেন উনি কেমন মানুষ।'

বিশাখা বলল, 'ভীষণ পিউরিটান। নিজের বাড়িটাকে মঠটঠ গোছের কিছু একটা করে তুলবার ইচ্ছা ওঁর।'

'আমার তো ওঁকে বেশ ভালই লাগে।'

স্টিয়ারিংএ হাত রেখেই আমার দিকে ঘুরে বসল বিশাখা, 'তাই তো, তাই তো—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, 'কী ?'

'আগেই বোঝা উচিত ছিল, আপনি ঐ দলেরই। নিজের ছেলেদের পারেন নি চিত্তজেঠু, কিন্তু আপনার মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়েছেন।'

'আপনি ওঁর ছেলেদের চেনেন ?'

'বা রে, চিনব না !'

চেনাই স্বাভাবিক। পিতৃবন্ধুর ছেলেদের চেনে কিনা, এজাতীয় প্রশ্ন কেমন করে করলাম সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার ; বোকামিরও। আর কিছু না বলে এবার চুপ করে থাকলাম।

বিশাখা বলতে লাগল, 'বিমলদা, অমল, রিণ্টু—ওরা কতবার আমাদের বাড়ি এসেছে, আমি কতবার ওদের বাড়ি গেছি।'

এবারও আমি নিরুত্তর।

বিশাখা আবার বলল, 'চিত্তজেঠু আপনার কে হন ?'

সম্পর্কটা কী, জানালাম।

কথায় কথায় কখন আমরা এলগিন রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। এর ভেতর কুয়াশা আরো গাঢ় হয়েছে, রাস্তার আলোগুলো আরো নিভু-নিভু। কদাচিৎ এক-আধটা গাড়ি উল্কার মত ছুটে যাচ্ছে। নির্জন ফুটপাথে দু-একটা লোক। তা ছাড়া সব অসাড়, মূর্ছিত। শীতের রাত শব্দ-গন্ধ-দৃশ্য—সব কিছুর ওপর ভারী প্রচ্ছদ টেনে দিয়েছে।

আমি শিউরে উঠলাম, 'কতদূর চলে এসেছি। এই হাতজোড় করছি, আমাকে যাদবপুর দিয়ে আসুন।'

'কিন্তু চিরঞ্জীববাবু—'

'কী ?'

'আপনার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে।'

যাকে আজই খানিক আগে প্রথম দেখেছি, তার সঙ্গে আমার কী কথা

থাকতে পারে, জানি না। তবু বললাম, 'আরেক দিন এসে আপনার কথা শুনে যাব।'

'আরেক দিন হয়তো আপনাকে আমার দরকার হবে না।'

করুণ শিথিল স্বরে বলতে লাগলাম, 'আমি ও বাড়িতে আশ্রিত, আমার কথা বিবেচনা করে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা করব, না?' চোখের তারা এবার জ্বলে উঠল বিশাখার; দপ্ দপ্ করতে লাগল। নিমেষে তার সমস্ত চেহারাটাই গেল বদলে। জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল, ফলে বুক দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। হিংস্র আক্রোশভরা গলায় সে বলল, 'আপনার মত এমন অপমান আগে আর আমাকে কেউ করে নি।'

তার দপ্‌দপে চোখ, ঘনশ্বসিত বুক এবং উত্তেজিত চেহারা দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কিভাবে কখন তাকে অপমান করেছি, বুঝতে পারছি না। পারছি না বলে ভয়ের সঙ্গে বিমূঢ়তাও মিশেছে।

বিশাখার কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল, 'নিজেকে আপনি ভেবেছেন কী? খুব দামী? মূল্যবান? দুর্লভ?'

হকচকিয়ে গেলাম, 'নিজের সম্বন্ধে সেরকম ধারণা আমার কোনদিনই নেই। আমি জানি, আমার দাম কানাকড়িও না।'

'ঠিকই জানেন, আপনার দাম কানাকড়ি না। তবে এত গর্ব কিসের আপনার? কিসের এত দম্ভ?'

'গর্ব বা দম্ভ কিছুই আমার নেই।'

'না-ই যদি থাকে আমার সঙ্গে বেড়াতে আপনার আপত্তি কেন?' বিশাখা সমানে চেঁচাতে লাগল, 'আপনি জানেন কি, এই কলকাতা শহরে হাতের আঙুল নাড়িয়ে যদি ইশারা করি, যে কোন ইয়ংম্যান একটা রাত কেন সারা জীবন আমার পিছু পিছু ঘুরবে!'

আমি কী বলব? বিশাখা কি কামপিপাসু? সে যা-ই হোক, তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কিছু সংশয় জেগেছে। কোন কথা না বলে আমি চুপ করে থাকলাম।

বিশাখা ক্ষেপে উঠল, 'চুপ করে রইলেন কেন? আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'আজ্ঞে—'

'আমি মিথ্যে বলেছি?'

ভয়ার্ত স্বরে বললাম, 'আমি সে কথা বলি নি তো।'

বিশাখা আগের স্বরেই বলল, 'মুখে বলেন নি, তবে ভাবভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'এ আপনি কী বলছেন ?'

'ঠিকই বলছি।'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। শ্বাসরুদ্ধের মত বলতে চাইলাম, 'ঠিক নয়, ঠিক নয়—', কিন্তু গলায় এবার স্বর ফুটল না।

খানিক আগের মত আক্রোশপূর্ণ স্বরে বিশাখা বলল, 'বিশ্বাস না করে ভেবেছেন পার পেয়ে যাবেন ? কক্ষনো না ?'

'আজ্ঞে—'

বিশাখা ধমকে উঠল, 'আজ্ঞে আজ্ঞে করবেন না। আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করিয়ে তবে ছাড়ব। চলুন—'

গাড়িটা ঘুরিয়ে ডানদিকের একটা রাস্তায় ঢোকাল বিশাখা। তারপর দুরন্ত স্পীড তুলল।

এ রাস্তাটার কী নাম, জানি না। কলকাতায় নেহাতই অচেনা আগন্তুক আমি ; এই তো সেদিন এখানে এলাম। এখানকার ক'টা পথের নামই বা জানি। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ?'

বিশাখা উত্তর দিল না।

আমি আবার আগের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের গন্তব্য জানতে চাইলাম।

বিশাখা এবার মুখ খুলল। বলল, 'চুপচাপ বসে থাকুন। গেলেই বুঝতে পারবেন কোথায় এসেছেন।'

আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস হল না। দম বন্ধ করে বসে থাকলাম।

খুব বেশীদূর অবশ্য যেতে হল না। বিরাট কম্পাউণ্ডওলা একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল বিশাখা। ওধারের দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, 'আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।' বলে আর অপেক্ষা করল না ; একরকম উড়তে উড়তে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

এ বাড়ি কাদের ? শীতের দুপুররাতে মধ্যযামে হঠাৎ এখানে বিশাখার কী প্রয়োজন থাকতে পারে, বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার উপায় নেই। অবশ্য সেজন্য আমার দুর্ভাবনাও নেই। আমি শুধু ভাবছি, কখন মুক্তি পাব।

একটু পরেই বিশাখা ফিরে এল। সঙ্গে সুদর্শন একটি যুবক।

জানলা দিয়ে গাড়ির ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বিশাখা আমার কানে ফিসফিস করল, 'দেখলেন তো, আমি ডাকলে আসে কিনা ? এর নাম সন্দীপ ; ঘুমুচ্ছিল, ডাকামাত্র উঠে এল। আপনাকে অত করে বললাম, শুনলেন না। ও কিন্তু গুড বয় ; সারারাত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'

চকিত হয়ে বিশাখার সঙ্গীকে আরেক বার ভাল করে দেখে নিলাম।

ইতিমধ্যে বিশাখা গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বার করে নিয়েছে। একটু আগে ফিসফিস করছিল। এবার গলা তুলে বলল, 'প্লীজ, আপনি একটু নামুন তো—'

বলামাত্র নেমে পড়লাম।

বিশাখা এবার সন্দীপের দিকে তাকাল। বলল, 'ঐখানটায় বোসো—' ; আমি যেখানে বসে ছিলাম, আঙুল দিয়ে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল বিশাখা।

একটি কথাও না বলে আমার জায়গায় উঠে বসল সন্দীপ। বিশাখা তাকে শুধালো, 'তুমি ড্রাইভ করবে ?'

'না।' সন্দীপ মাথা নাড়ল।

'কেন ?'

'অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।'

'অ্যাকসিডেন্ট !'

'ইয়েস ম্যাডাম।' সন্দীপ হাসল, 'কেননা গাড়ি চালাতে চালাতে আমার চোখ তো সামনের দিকে থাকবে না।'

বিশাখা অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে কোন্ দিকে থাকবে ?'

'জাস্ট ইমাজিন—'

'পারছি না।'

ডান চোখ ঈষৎ ছোট করে সন্দীপ বলল, 'আমি তো তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকব।'

'নটি বয়—' ; হাসতে হাসতে ঘুরে ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল বিশাখা।

ভেবেছিলাম, বিশাখা এবার আমাকে উঠতে বলবে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাকে নিদারুণ উদাসীন দেখে মনে মনে শঙ্কিত হলাম। আড়ষ্ট অস্ফুট গলায় বললাম, 'আমি—'

বিশাখা খানিক সচেতন হয়ে বলল, 'ও, আপনি !' বলে একটু থামল। তারপর চট করে কি ভেবে নিয়ে আবার শুরু করল, 'আপনি আমার কথা

শোনেন নি। তার জন্যে আপনার কিছু শাস্তি পাওয়া দরকার।' বলেই স্টার্ট দিল। নিমেষে গাড়ির চাকায় উল্কার গতি খেলে গেল। আমি কিছু বলবার বা বুঝবার আগেই বিশাখারা রাস্তার দূর বাঁকে অদৃশ্য হল।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শাস্তিটা যে কী, তারপর একটু একটু করে টের পেতে লাগলাম।

কেননা নির্জন হিমের পথ পাড়ি দিয়ে অসাড় ক্লান্ত শরীরে যখন যাদবপুর পৌঁছুলাম শীতের দীর্ঘ আড়ষ্ট রাত শেষ হতে খুব বেশি বাকি নেই।

গেট খুলে বাগানের ভেতর ঢুকতেই, সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার ঘরে আলো জ্বলছে। তবে কি অমল আজও জেগে বসে আছে?

সে যাই হোক, সদরে টোকা দিতে যে এসে দরজা খুলে দিল, এই মুহূর্তে তাকে প্রত্যাশা করি নি। সে অমল নয়, বিমল।

আঠারো

রাত জেগে বিমল যে আমার জন্য বসে থাকবে, এ ছিল অকল্পনীয়। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকলাম।

বিমল হাসল, 'খুব অবাক হয়ে গেছ, না?'

উত্তর দিলাম না। ঘাড় কাত করে জানালাম, হয়েছি।

দরজা বন্ধ করতে করতে বিমল আবার বলল, 'রোজ রোজ তুমি আমার জন্যে জেগে বসে থাকো, একদিন না হয় আমি জেগেছি। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা কথা আছে।'

অমলও সেদিন এই কথাই বলেছিল। দু'ভাইয়ের কৃতজ্ঞতাবোধ দেখছি বেশ টনটনে। আমি এবারও চুপ করে থাকলাম।

দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে ফিরে বিমল বলল, 'চলো, তোমার ঘরে যাই। শুধু কৃতজ্ঞতা দেখাতে নয়, অন্য একটা দরকারেও তোমার জন্যে জেগে আছি।'

'চলুন—'

আমার ঘরে এসে বিছানায় গিয়ে বসল বিমল। লক্ষ্য করলাম, আজ আর নেশাটেশা করে নি সে। মুখ থেকে ভকভক গন্ধও বেরুচ্ছে না। হাত-পা-মাথাও টলছে না। আমিও তার পাশে বসলাম।

বিমল বলল, 'দরকারের কথাটা পরে হচ্ছে। তার আগে আরেকটা কথা বলি।'

'কী ?'

'আমাদের মত তুমিও নিশাচর হয়ে উঠলে দেখছি !'

আরো একদিন আমি রাত করে ফিরেছিলাম। সেদিন বাইরে নিশিযাপন নিয়ে অমল আমাকে ঠাট্টা করেছিল। এ বাড়িতে পা দিয়েই নাকি এখানকার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ফেলেছি। সেদিনও হেসেছিলাম ; বিমলের ঠাট্টায় আজও হাসলাম।

বিমল আবার বলল, 'যতদূর' জানি তুমি গুড বয়—একেবারে আদর্শ যুবক। বাবা তো উঠতে বসতে তোমার তুলনা ঝাড়েন। কিন্তু ব্রাদার তুমি যে এদিকে গায়ে কলকাতা শহরের রং ধরাতে শুরু করলে—'

বিব্রতমুখে বললাম, 'না, মানে বিশেষ একটা দরকারে আমাকে বেরুতে হয়েছিল। ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে ?'

কোথায় ছিলাম, বললাম।

বিমলের চোখের তারায় ঝকমকানি খেলে গেল, 'হিরণ্ময়কাকুর ওখানে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ'— ; আমি মাথা নাড়লাম।

'কেমন লাগল ভদ্রলোককে ?'

'ভালই।'

বিমল হাসল, 'ল্যাকনিক আর ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিতে শিখেছ, দেখছি। "ভালই" বললে চলবে না। বেশ বিশদ করে বল। হী ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফেলো।'

আমিও হাসলাম, 'সত্যি, ভালই মনে হয়েছে। এই সেকেণ্ড টাইম ভদ্রলোককে দেখলাম। আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছেন। ভাল ছাড়া আর কী বলতে পারি বলুন—'

'হিরণ্ময়কাকুর ওখানে গিয়েছিলে কেন ?'

'আমার নেমন্তন্ন ছিল।'

'রিয়ালি !'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ নেমন্তন্ন ?'

নিমন্ত্রণের পিছনে কী কারণ, বলতে হল। সব শুনে বিমল বলল, 'আই সী আই সী। হিরণ্ময়কাকার কথা আপাতত বাদ দাও। আসল কথাটা বল দিবি ব্রাদার—'

আমি অবাক। বললাম, 'আসল কথাটা আবার কী?'

চোখের তারায় বিচিত্র ভঙ্গি করে বিমল চাপা গলায় বলল, 'বিশাখার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

চকিত হলাম, 'বিশাখা দেবীকে আপনি চেনেন?'

'কথাটা কিন্তু একেবারে বোকার মত হল।'

'কেন?'

'হিরণ্ময়কাকা আমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁর মেয়েকে চিনব না, এ হতে পারে? তা ছাড়া—'

'কী?'

চোখ দুটো কুঁচকে একান্ত গোপন কথা বলার মত করে বিমল বলল, 'বুঝলে ব্রাদার, এই কলকাতা শহরে যত প্রেটি মহিলা রয়েছে তাদের সবার সঙ্গে বিমল চ্যাটার্জির বন্ধুত্ব।' একটু থেমে আবার বলল, 'বিশাখার সঙ্গে তোমার আলাপ-টালাপ হয়েছে নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ।'

'ইজ সী নট চার্মিং?'

'হ্যাঁ। তবে—'

'কী?'

খানিক ইতস্তত করে বললাম, 'একটু খেয়ালী ধরনের।'

বিমল আমার কম্বলটা টেনে নিয়ে সারা গায়ে বেশ ঘনিষ্ঠ করে জড়ালো। উৎসাহের সুরে বলল, 'কি রকম, কি রকম—'

বিমল যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে তাতে খুব তাড়াতাড়ি উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। যাই হোক খানিক আগের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতাটা আগাগোড়া বলে গেলাম। এবং শীতের এই কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জন রাত্তিরে বাতাস যখন বরফের সহোদর সেই সময় একা একা কিভাবে এলগিন রোড থেকে এতদূরে এই যাদবপুর পর্যন্ত শুধু পা দু'খানার ওপর ভরসা করে পাড়ি দিয়েছি তাও বলে গেলাম।

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল বিমল। তারপর অনেকখানি আক্ষেপের গলায় বলল, 'ইউ আর এ ফুল—'

'ফুল!'

'ইয়েস ; একেবারে মূর্খ অবোধ বালক।'

ধিক্কারটা সারা গায়ে মেখে আমি চুপচাপ বসে থাকলাম।

বিমল আবার বলল, 'হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে এমন করে কেউ রাস্তায় ছুঁড়ে ছ্যায়! এমন সুযোগ জীবনে আর কখনো পাবে ?'

আমি নিরুত্তর।

বিমল বলতে লাগল, 'তোমার মত এরকম অপদার্থ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমার সন্দেহ হয়, তুমি ইয়ংম্যান কিনা—'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'বিশাখা দেবীর ইচ্ছেমত চললে রাত্রিবেলা যে ফিরতে পারতাম না।'

'না ফিরলে পৃথিবী একেবারে রসাতলে চলে যেত!'

কী উত্তর দেব, ভেবে পেলাম না।

বিমল আবার বলল, 'এই তো ট্যাং-ট্যাং করে পাঁচ সাত মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরলে। এখন কী করবে শুনি ?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'ঘুমোব।'

'কি দারুণ কাজ! তুমি না ঘুমোলে ওয়ার্ল্ড একেবারে অচল হয়ে যাবে।' বিমল বলতে লাগল, 'রোজই তো ঘুমোও। একটা দিন না ঘুমোলে চলছিল না! জানো, এই কলকাতা শহরের যে কোন ইয়ংম্যান বিশাখার জন্যে মরতে প্রস্তুত ?'

বিমল যেভাবে আক্ষেপ করছে তাতে মনে হয়, আমার নিদারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু লোকসানটা কোথায় কতখানি হল, আমি কিন্তু অনুভব করতে পারছি না। বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে থাকলাম।

হাতের বাইরে ব্যাপারটা যখন চলেই গেছে তখন কী আর করা! বিমল বুঝল বৃথাই আফসোস, বৃথাই আমাকে ধিক্কার দেওয়া। উদাসীন স্বরে সে বলল, 'যাক গে ওসব, যা ভাল বুঝেছ করেছ। এখন যেজন্যে রাত জেগে বসে আছি, বলি—'

আমি উন্মুখ হলাম।

বিমল বলল, 'অলকাদির সঙ্গে আজ বিকেলবেলা আমার দেখা হয়েছিল।'

আমি চমকে গেলাম। জড়িত আধফোটা গলায় কী উত্তর দিলাম, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট না।

বিমল আবার বলল, 'অলকাদি তোমার ওপর খুব রাগ করেছে।'

ভীরু গলায় বললাম, 'কেন ?'

'কেন বলে নি। শুধু বলেছে—'

'কী ?'

'তুমি নাকি মহিলাদের মর্যাদা দিতে জানো না !'

আমি নীরব।

বিমল বলতে লাগল, 'সে যাই হোক, কী হয়েছিল, কিভাবে অমর্যাদা করেছ, আমি জানতে চাই না। তবে—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

বিমল বলতে লাগল, 'অলকাদি বলে দিয়েছে, তুমি তার কথা রাখোনি। কিন্তু সে যে কথা দিয়েছিল, রেখেছে।'

'কী কথা ?'

'তোমার জন্যে একটা চাকরি ঠিক করেছে অলকাদি।'

আমার সারা গায়ে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল যেন। চকিতে বিমলের দিকে ফিরে উৎসুক স্বরে বললাম, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের চাকরি ?'

'ঠিক জানি না। তবে অলকাদি যখন চাকরি যোগাড় করেছে, সেটা ভালই হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আজ কী বার ?'

'বেস্পতি—'

'আসছে সপ্তাহের শেষে নিশ্চয়ই অলকাদির সঙ্গে দেখা করবে।'

'কখন যাব ?'

'সকালের দিকেই যেও। দুপুরের পর তাকে বাড়িতে পাওয়া মুশকিল। যাবে কিন্তু, বার বার অলকাদি বলে দিয়েছে।'

'আচ্ছা।'

বিমল এবার আমার সম্বন্ধে সচেতন হল বুঝিবা। সদয় স্বরে বলল, 'রাত প্রায় কাবার হতে চলল। অতখানি পথ হেঁটে এসেছ ; নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি এখন উঠি ; শুয়ে পড়।'

বিমল চলে গেল।

উনিশ

মাঝরাত্তিরে শুয়ে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, পরের দিন দুপুরের আগে আর উঠছি না। কিন্তু ভোরবেলাতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

শীতের সকালে কম্বলের উষ্ণ আরামের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিলাম। দরজার ওপর হঠাৎ জোরে জোরে ধাক্কা এবং সেই সঙ্গে ডাকটা শুনতে পেলাম, 'বিলু—বিলু—'

ঘুম তখনও খুব গাঢ়। ডাকটা কানে এলেও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এদিকে বাইরের ধাক্কা আর কণ্ঠস্বর ক্রমশ আরো অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল।

অগত্যা আর শুয়ে থাকা গেল না। উঠেই পড়তে হল। করুণভাবে বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়ে কম্বলখানা নিবিড় করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

চোখ এখনও জ্বালা-জ্বালা করছে। কপালের দু'ধারে দুটো রক্তবাহী শিরা সমানে লাফিয়ে চলেছে। মাথার ভেতরটা দপ্‌দপ্‌ করছে।

দরজা খুলতেই দেখি, অমল দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির অসুস্থ স্নায়ুগুলোর ওপর স্নিগ্ধ একটি স্পর্শ এসে লাগল যেন। নিমেষে সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। খুশী গলায় বললাম, 'আ রে তুমি! ভেবেছিলাম কে না কে—'

অমল বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি তো বেশ আর্লি রাইজার! অন্য দিন সূর্য উঠবার আগেই উঠে পড়! আজ এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলে—'

'কাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল ভাই। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি তো লেট-লতিফ। সূর্যকে মাঝ-আকাশে না পাঠিয়ে বিছানা ছাড়ো না। আজ এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল!'

অমল হাসল, 'বড় জব্বর বলেছ ব্রাদার। যে তাড়াতাড়ি ওঠে সে আজ লেট-লতিফ। আর যে লেট-লতিফ সে আজ সূর্যোদয়কে হার মানিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং, না?'

হেসে ফেললাম, 'যা বলেছ।'

একটু ভেবে অমল এবার বলল, 'বিশেষ দরকারে আজ আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হয়েছে।'

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছে অমল, ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'ঐ ভাখো, বাইরে তোমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এসো—এসো—'

অমল ভেতরে এল। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এবার চোখে পড়ল, তার হাতে চামড়ার বড় একটা স্যুটকেস।

স্যুটকেসটা নামিয়ে চেয়ারে বসল অমল। তার মুখোমুখি বিছানায় বসে হাল্কা স্বরে বললাম, 'সকালবেলা স্যুটকেস-টুটকেস নিয়ে চললে কোথায়? লম্বা পাড়ি মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করল অমল। আমার মতই হাল্কা গলায় বলল, 'অনেক দূরে পাড়ি।'

'হেঁয়ালি থাক্। সত্যি কোথায় চললে?'

'যাবার কোন ঠিকানা নেই।'

বিমূঢ়ের মত বললাম, 'তবে?'

অমল বলল, 'আপাতত রাস্তায়। তারপর—' বলে চুপ করল।

'তারপর কোথায়?'

'পথ যেখানে নিয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আমিই নীরবতা ভাঙলাম, 'ব্যাপারটা কী বল তো?'

অমল বলল, 'তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি খুবই দুর্বল।'

'কি রকম?'

'বাবা আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দিয়েছেন না?'

মনে পড়ে গেল। সে নোটিশ নিজের হাতে আমিই লিখেছিলাম। বললাম, 'তাই বুঝি—'

'হ্যাঁ—'; আস্তে করে মাথা নাড়ল অমল, 'আমি যথেষ্ট সাবালক হয়েছি। বেকার বসে বসে পিতার অন্ন ধ্বংস করার অধিকার আমার নেই। আই অ্যাম রাইটলি সার্ভড্!'

এই সকালবেলা মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ কেন? তোমাকে তো তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।'

'তা হয়েছে।'

'তবে ?'

'দেরি করে কী লাভ ? যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চলে যাওয়াই ভাল।'

এই ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনজন বলে মনে হয়েছিল। প্রথম আলাপেই সে আমাকে জয় করে নিয়েছে। বললাম, 'সময় যখন হাতে ছিল, একটা ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে গেলেই তো পারতে।'

অমল জোরে হেসে উঠল, 'তুমি দেখছি আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছ। কিছু ভেবো না, এত বড় পৃথিবী, একটানা-একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।' একটু হেসে আবার বলল, 'যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম বলে মনে কিছু কোরো না ভাই। আচ্ছা চলি—'

স্যুটকেস হাতে নিয়ে অমল উঠে দাঁড়াল।

আমিও উঠলাম। গাঢ় বিষাদে মনটা ছেয়ে গিয়েছিল। বললাম, 'আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ?' মনের ঘোলাটে বিষণ্ণতা আমার কণ্ঠস্বরেও বুঝি ভর করেছে।

আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে অমল বলল, 'কি বোকা ছেলে, দেখা হবে না কেন ? নিশ্চয়ই হবে।'

'কি করে ?'

'একটা আস্তানা যোগাড় করতে পারলেই তোমাকে খবর দেব।'

'ঠিক দেবে ?'

'সিওর। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। চললাম—'

অমল বাইরে পা বাড়িয়ে দিল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

বাইরের বাগানে আসতেই পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা। যথারীতি এই সকালবেলায় সারা গায়ে মাটি-টাটি মেখে খুরপি দিয়ে গাছেদের পরিচর্যা করছিলেন তিনি। অমল তাঁর কাছে চলে গেল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'আমি চললাম বাবা।'

একটু চুপ করে থেকে পিসেমশাই বললেন, 'যাচ্ছ ? বেশ।' একটু থেমে আবার, 'আমায় ভুল বুঝো না।'

'আজ্ঞে না।'

'আমি চাই অন্যের ওপর নির্ভর না করে তোমরা স্বাবলম্বী হও।'

'আমি স্বাবলম্বী হতেই চেষ্টা করব।'

'যদি কিছু দরকার হয় আমাকে জানিও।'

'আচ্ছা।'

অমল গেটের দিকে চলল। আমিও তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছন ফিরলাম ; পিসেমশাই আবার গাছপালার যত্ন শুরু করেছেন। এমন আবেগশূন্য উদাসীন বিদায় আগে আর কখনও দেখি নি।

গেট পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অমল রাস্তায় নামল। যাচ্ছে আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে অমল। রাস্তার দূর বাঁকে গিয়ে একবার হাত নাড়ল সে ; আমিও নাড়লাম। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অমল।

এখানে ক'দিনই বা এসেছি, কতটুকুই বা দেখেছি অমলকে। তবু মনে হয়, এ বাড়ির অনেকখানি জায়গা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। বিষাদময় এক শূন্যতার ভেতর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কুড়ি

বাগবাজারে গোপাল আড্ডি লেনে যখন পৌঁছুলাম তখনও দুপুর হয় নি। পৌষের অনুজ্জ্বল নিস্তেজ রোদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। শীতের হাওয়া বইছে এলোমেলো—কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও পূবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি।

সেই পুরনো ভাঙাচোরা একতলা বাড়িটার সামনে শিশির মুখুটির ভায়রাভাই রাধামোহন দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে দু পা এগিয়ে এলেন, 'আসুন—আসুন—'

আমার খুব খারাপ লাগছিল। দশ বছরের বাচ্চা ছেলেটাও জানে, মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। এই অমোঘ নিদারুণ পরিণামকে এড়াবার কোন উপায় নেই। মৃত্যু যেদিনই আসুক, যখনই আসুক—সে এক পরম শোকাবহ ঘটনা। যে শূন্যতা সে রেখে যায় তা কখনও পূরণ হবার নয়।

তবু পরিণত বয়সের মৃত্যুতে কিছু সান্ত্বনা আছে। কেননা দীর্ঘকাল পৃথিবীর সুখ-দুঃখ আলো-বাতাস ভোগ করে সর্ব কর্তব্য পালনের পর যে মানুষটি যায় সে জীবনের একটি বৃত্তকেই সম্পূর্ণ করে যায়। কোন দায়িত্বই সে কারো জন্য ফেলে রেখে যায় না, কোন সাধ অপূর্ণ রেখে যায় না। নিজের সব ভার নিজেই বহন করে, বহুদিন এই বসুন্ধরার অসংখ্য ভালমন্দ আনন্দ-যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটি মানুষ যখন জীর্ণ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন মৃত্যুই তার কাছে একমাত্র কাম্য বস্তু। জীবনের ওপর পূর্ণচ্ছেদ পড়াই তখন প্রয়োজন।

কিন্তু শিশির মুখুটির স্ত্রীর মৃত্যু পরিণত বয়েসের মৃত্যু না। এ মৃত্যু

কোনদিক থেকে বাঞ্ছিতও নয়। নিতান্ত অসময়ে—যখন তাঁর অসংখ্য দায়িত্ব, অনেক কর্তব্য—ভদ্রমহিলা নিজের হাতে নিজের সমাপ্তি টেনে দিয়েছেন।

আমার খুব খারাপ লাগছিল। গাঢ় বিষাদ বুকের ভেতর যেন অনড় হয়ে আছে। শ্বাস টানতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল।

রাধামোহন আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সমস্ত বাড়িটা শোকাচ্ছন্ন, বিমর্ষ। চাতালের একধারে কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার তলায় শ্রাদ্ধের আসর বসেছে। শিশির মুখুটির বড় ছেলে ন্যাড়া মাথায় নতুন কাপড় পরে চাদর গায়ে পুরুতের মুখোমুখি বসে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। কত আর বয়েস হবে ছেলেটার? বারো-তেরর বেশি নয়। তার পাশে তার ছোট ভাই। এর বয়েস আরো কম; আট-নয়ের মত। ছোট ছেলেটারও মাথা ন্যাড়া, পরনে নতুন চাদর-কাপড়।

দৃশ্যটি এত করুণ এত মর্মান্তিক যে দেখতে দেখতে কখন আমার চোখ জলে ভরে গেছে নিজেই জানি না।

চাতালের চারদিক ঘিরে বারান্দা। রাধামোহন আমাকে নিয়ে বারান্দার একটা চেয়ারে বসালেন। আরো কিছু লোক ইতস্তত বারান্দায় বসে আছে। তাদের কারোকে কারোকে চিনি, তবে বেশির ভাগই অচেনা। খুব সম্ভব শিশির মুখুটির আত্মীয়-স্বজন হবে; শ্রাদ্ধের ব্যাপারে এসেছে।

আজ এ বাড়ি আসার পর শিশির মুখুটির সঙ্গে দেখা হয় নি। রাধামোহন আমাকে বসিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। শুধোলাম, 'শিশিরবাবু কোথায়?'

রাধামোহন বললেন, 'শিশির বাজারে গেছে।'

'অনেকক্ষণ?'

'না। আপনি আসার একটু আগে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে না; এক্ষুনি এসে পড়বে।'

আমি আর কিছু বললাম না।

রাধামোহন বললেন, 'ছাদে রান্না চেপেছে। যাই, ওদিকটা একবার দেখে আসি। আপনি বসুন ভাই।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'আচ্ছা।'

রাধামোহন চলে যাবার পর খানিকটা সময় কেটেছে। আশেপাশে যারা বসে আছে তাদের সবাই প্রায় চুপচাপ। দু-একজন চাপা নীচু গলায় এক-আধটা কথা বলছে। কী বলছে বুঝতে পারছি না। ছাদ থেকে রান্নার আওয়াজ এবং গন্ধ ভেসে আসছিল। সব শব্দ আর গন্ধ ছাপিয়ে পুরুতের বিচিত্র সুরের একটানা মন্ত্রপাঠ শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত পরিবেশটাই এমন শোকাবহ এবং বিষণ্ণ যে ধীরে ধীরে আমার স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে আনতে লাগল। অভিভূতের মত আমি বসে থাকলাম।

কতক্ষণ বসে ছিলাম, মনে নেই। হঠাৎ ফোঁপানির আওয়াজ কানে এল। ঈষৎ চকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলাম আমি যেখানে বসে আছি তার পাশেই একখানা ঘর ; ঘরটার একধারে দরজার কাছ ঘেঁষে সেই মেয়েটা বসে আছে যার নাম মালতী। দুই হাঁটুর মাঝখানে ঘাড় ভেঙে মাথাটা কাত হয়ে আছে। চোখমুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না , সেগুলো এলোমেলো চুলে ঢাকা। শরীরটা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে।

মালতীর দিকে কারো লক্ষ্য নেই। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত কিংবা এমনই শোকার্ত হয়ে আছে যে অন্য কারো কথা তাদের মনে পড়ছে না।

হঠাৎ অপার মমতায় আর সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। নিজের অজান্তে কখন উঠে পড়েছি আর কখন যে মালতীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, জানি না।

আমি যে এসেছি, মালতী টেরও পায় নি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কান্নার শব্দ শুনলাম। তারপর একসময় খুব আস্তে করে কোমল গলায় ডাকলাম, 'মালতী—'

মালতী বোধ হয় শুনতে পেল না। অনুচ্চ স্বরে ফুলে ফুলে সমানে কেঁদে যেতে লাগল।

আবার ডাকলাম।

এবার মুখ তুলল মালতী। এলোমেলো আলুথালু চুলের ওপারে তার চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, রক্তাভ। গালের ওপর দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। বিহ্বলের মত আমার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল মালতী।

পূববাংলা থেকে আসার সময় ইস্টবেঙ্গল মেলে দু-একটার বেশি কথা হয় নি মালতীর সঙ্গে। কলকাতায় এসে বার দুই দেখা হয়েছে। তখনও কেউ কথা বলি নি।

হঠাৎ আজ আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরম শোকের ভেতরেও মালতী যেন অবাকই হয়ে গেছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে ; গলায় স্বর ফুটল না। ঠোঁট দুটো থরথর করল শুধু।

বললাম, 'কেঁদো না মালতী, কেঁদো না—'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল মালতী।

আবার বললাম, 'অত ভেঙে পড়লে কী করে চলবে ? বাপ-মা চিরকাল তো সবার থাকে না—' বলেই টের পেলাম কথাগুলো বড় সাজানো এবং যুগ-যুগান্ত ধরে শোকের মুহূর্তে এগুলো সবাই সবাইকে বলে আসছে। ব্যবহারে ব্যবহারে কথাগুলো জীর্ণ মলিন অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমার যা বয়েস সেই তুলনায় সান্ত্বনার এই বাক্যগুলো খুবই বেমানান।

ভাঙা ভাঙা কান্না-জড়ানো গলায় মালতী বলল, 'মা যদি অসুখ করে মরত, বুঝতাম। তা না, গলায় দড়ি দিল—'

কী বলব, ভেবে পেলাম না।

মালতী আবার বলল, 'মা নেই। আমাদের যে কী হবে, কে আমাদের দেখবে—'

আমি বলতে চাই নি, আমার মুখে মানায়ও না। তবু আমাকে দিয়ে কেউ যেন বলিয়ে দিল, 'তোমার এখন অনেক দায়িত্ব মালতী। ছোট ভাই দুটো, বাবা—সবাইকে তোমায় দেখতে হবে। মায়ের জায়গাটা তোমাকেই নিতে হবে। এ সময় নিজেই যদি ভেঙে পড়, তোমাদের সংসার নষ্ট হয়ে যাবে।'

এতক্ষণ চাপা নিচু গলায় কাঁদছিল মালতী। এবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে, চুল আরো আলুথালু করে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে শুরু করল। সহানুভূতির সামান্য একটু ছোঁয়ায় তার অবরুদ্ধ কান্না উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জড়ানো জড়ানো গলায় মালতী বলল, 'পারছি না, কিছুতেই পারছি না। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

একবার ইচ্ছা হল, হাঁটু মুড়ে বসে মাথায়-পিঠে হাত বুলিযে মালতীর কান্না থামাই। পরক্ষণেই আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন ফিসফিসিয়ে বলল, বাইশ-তেইশ বছরের একটি যুবকের পক্ষে প্রায়-অচেনা একটি তরুণীকে সান্ত্বনা দেবার রীতি এ নয়।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করব যখন ভাবছি সেই সময় শিশির মুখুটির গলা শুনতে পেলাম, 'চিরঞ্জীব—'

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাতেই দরজার ঠিক বাইরে ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। তাঁর হাতে জিনিসপত্তরে-বোঝাই একটা থলে। চোখাচোখি হতেই শিশির মুখুটি আবার বললেন, 'কখন এসেছ ?'

'এই খানিকক্ষণ। এসে শুনলাম, আপনি বাজারে গেছেন।'

'হ্যাঁ। ক'টা জিনিসের দরকার হয়ে পড়ল। তাই—'

কথা বলছিলাম ঠিকই। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্যও করছিলাম। শিশির মুখুটির চোখমুখ ফুলে আছে অর্থাৎ শোকের চিহ্নটি তাঁর গোপন নেই। স্ত্রীর এই পারলৌকিক কাজের দিনে সবার সামনে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে কেঁদেছেন।

একটু নীরবতা।

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে মালতী কেঁদেই যাচ্ছিল ; আষাঢ়ের বর্ষার মত একটানা বিরামহীন কান্না।

একসময় বললাম, 'আমি আসা থেকেই দেখছি, মালতী কাঁদছে।'

আবছা গলায় শিশির মুখুটি বললেন, 'কাঁদবেই তো।' বলতে বলতে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন তিনি।

আমি আবার বললাম, 'মালতীকে কাঁদতে দেখে ওর কাছে এসেছিলাম।'

আমার বলার ভেতর কৈফিয়তের ভঙ্গি ছিল। শিশির মুখুটি বললেন, 'বেশ করেছ। ওকে একটু বোঝাও, এত ভেঙে পড়লে চলবে না। ওর মাথায় এখন অনেক দায়, অনেক কর্তব্য। আমরা বোঝাতে গিয়ে নিজেরাই কেঁদে ফেলছি।'

'বোঝাচ্ছি তো। কিন্তু—'

'কী ?'

'কিছুতেই শুনছে না।'

খানিক চুপ করে থেকে শিশির মুখুটি বললেন, 'ভাল করে বোঝাও। দেখি ওদিকে কদ্দূর কী হচ্ছে—'

বেশ কিছুক্ষণ হল শিশির মুখুটি চলে গেছেন। তার পরেও আমি দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে একটানা মন্ত্রপাঠ আর মালতীর কান্না আমার কানে অবিরাম আঘাত দিয়ে যেতে লাগল।

কখন একসময় মালতীর পাশে এসে বসেছি, নিজেই জানি না। কখন তার মাথায় হাত রেখেছি তাই বা কে বলবে।

কান্নার ভেতরেই চমকে আবার মুখ তুলল মালতী। গভীর স্নেহের স্বরে বললাম, 'অনেক কেঁদেছ। কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলে গেছে। আর কেঁদো না—'

ধীরে ধীরে নিজের মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে পেছনে নিয়ে

গেল মালতী। আমার দিকে কেমন করে যেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর দু হাতে আলগা করে একটা খোঁপা বেঁধে চোখ নত করল।

আমার স্পর্শে কী ছিল, জানি না। কান্নাটা ক্রমশ থেমে আসতে লাগল মালতীর।

একুশ

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে চুকতে দুপুর পেরিয়ে গেল। বিকেলের মুখে রাধামোহন আমাকে ছাদে নিয়ে গেলেন।

ছাদটা বেশ বড়সড়ই। ওপরে নীল কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙিয়ে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। চারদিকে সারি-সারি আসন পাতা। প্রতিটি আসনের সামনে কলাপাতা, মাটির গেলাস—ইত্যাদি সাজানো।

আমি একাই না, অন্য নিমন্ত্রিতেরাও একে একে ছাদে আসতে আরম্ভ করেছে।

একখানা আসন দখল করে রাধামোহনকে বললাম, 'আবার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে গেলেন কেন?'

রাধামোহন বললেন, 'আর বলবেন না; অনেকবার বারণ করেছিলাম। শিশির কিছুতেই শুনলে না।'

'এর কোন মানে হয়?'

রাধামোহনের কথা শেষ হতে না হতে শিশির মুখুটি এসে পড়লেন। মৃদু হেসে বললেন, 'কী কথা হচ্ছে?'

আমরা যা আলোচনা করছিলাম বললাম এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুযোগও করলাম।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন শিশির মুখুটি। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যারা শ্মশানে গিয়েছিল, শ্রাদ্ধের দিনে তাদের পাতে একটু কিছু দিতে না পারলে নিজেরই কি ভালো লাগে?'

রাধামোহন এই সময় বলে উঠলেন, 'দেশ থেকে কী-ই বা আনতে পেরেছ। তা যদি এভাবে নষ্ট হয়—মানে ভবিষ্যৎ বলেও একটা কথা আছে। এ কলকাতা শহর, দুটো পয়সা হাতে থাকা দরকার।'

নিমন্ত্রিতেরা সবাই প্রায় এসে গিয়েছিল। আসনে আসনে তারা বসেও

পড়েছে। দ্রুত তাদের একবার দেখে নিয়ে চাপা গলায় শিশির মুখুটি বললেন, 'এখন ও কথা থাক দাদা। সবাই এসে গেছে ; এসব শুনলে কী ভাববে—'

রাধামোহন তবু নীচু গলায় বলেই যেতে লাগলেন।

শিশির মুখুটি এবার বললেন, 'দাদা মনে রাখবেন, এটা আমার স্ত্রীর শেষ কাজ। এরপর তার জন্যে কোনদিন কিছু করার সুযোগই হয়তো পাব না।'

রাধামোহন এবার চুপ করে গেলেন।

শিশির মুখুটি থামেন নি। আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'দেশ থেকে কিছু আনতে পেরেছিলাম বলেই তো খরচ করলাম। ধরুন, খালি হাতেও আসতে পারতাম।'

এর উত্তরও ছিল। কিন্তু এসময় তা দেওয়া গেল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিমন্ত্রিতেরা একে একে চলে গেল।

শীত-বিকেলের আয়ু আর কতটুকু? দেখতে দেখতে রোদের রঙ মলিন হয়ে এল। চারদিক দ্রুত শীতল হয়ে যাচ্ছে ; দিনের শেষ নিভু-নিভু আলো কোন কিছুকে উত্তপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমি বললাম, 'এবার তা হলে যাই?'

শিশির মুখুটি বললেন, 'এখনই যাবে? কাজ আছে?'

'না। কাজ আর কী—'

'তা হলে আমরা খেয়ে আসি। একটু বোসো—'

আমাকে নীচের ঘরে বসিয়ে শিশির মুখুটি, তাঁর দুই ছেলে, মালতী এবং রাধামোহনের বাড়ির সবাই ছাদে চলে গেল। ওরা যখন ফিরল তখন আর বিকেল নেই ; লম্বা পায়ে শীতের সন্ধ্যে নেমে এসেছে।

মালতী, রাধামোহন, শিশির মুখুটির দুই ছেলে আর শিশির মুখুটি এ ঘরে এসে ঢুকলেন। একধারে একটা তক্তপোষ। শিশির মুখুটি এবং রাধামোহন বসলেন তক্তপোষে। অন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেঝের ওপর।

শিশির মুখুটি বললেন, 'মালতীর মা মরার পর দেখতে দেখতে বারোটা দিন কেটে গেল।' তাঁর বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

রাধামোহন বললেন, 'সময় যে কিভাবে যায়!'

একটা গাঢ় বেদনা শীতের বাতাসে অনেকক্ষণ অনড় হয়ে থাকল। তারপর শিশির মুখুটি শুধোলেন, 'অকল্যাণে আর গিয়েছিলে!'

মাথা নাড়লাম, 'না। আপনি?'

'আমি আর কোথায় গেলাম। সেদিন ফিরে এসে দেখি বিপদ ঘটে গেছে। তুমিও তো সঙ্গে ছিলে—'

'হ্যাঁ।'

'তারপর এই নিয়েই তো কাটছে। আজ শ্রাদ্ধশান্তি চুকল; দু'একদিনের ভেতর অকল্যাণ্ডে যাব। ফর্ম-টর্ম ফিল-আপ করে দিয়ে আসব। আর—'

কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

শিশির মুখুটি বললেন, 'এবার চাকরিবাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়তে আবার বললেন, 'ভালো কথা, তুমি কিছু চাকরি-টাকরি পেলে?'

'না, এখনও পাই নি। তবে—'

'কী?'

'বিমল সেদিন বলছিল আমার জন্য নাকি অলকাদি চাকরি ঠিক করেছে। বললাম, একজন ভরসা দিয়েছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কিসের?'

আমার চোখের সামনে অদৃশ্য কোন পর্দায় অলকাদির মুখ ভেসে উঠল। অন্যমনস্কের মত বললাম, 'চাকরিটা আমার ঠিক পছন্দ না।'

শিশির মুখুটি কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

রাধামোহন বললেন, চাকরির আবার পছন্দ-অপছন্দ কী। যা পাচ্ছেন নিয়ে নিন। চাকরি-বাকরির বাজার খুব খারাপ।'

অলকাদির মুখ এখনও চোখের সামনে ভাসছে। তার চাকরিটার ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ নেই। আমি চুপ করেই থাকলাম।

শিশির মুখুটি প্রসঙ্গটার ওপর যবনিকা টেনে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, 'দেশের খবর-টবর কিছু পেলে?'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ প্রায় ষোল-সতের দিন কলকাতায় এসেছি। এসেই বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু এখনও উত্তর আসে নি। নানা মানুষ, অংসখ্য ঘটনা, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা এ ক'দিন আমাকে যেন আচ্ছন্ন দূরমনস্ক করে রেখেছিল। বাড়ির কথা, যাদের জন্য পূর্ববাংলার সজল শ্যামল ভূখণ্ড ছেড়ে আমার এতদূরে এত দুঃসহ পাড়ি জমানো তাদের কথাই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

এই মুহূর্তে নিদারুণ এক দুর্ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। কেমন আছেন বাবা-মা? কেমন আছে সবিতা? ওদের কোন ক্ষতি হয়ে যায় নি তো? পনের

ষোল দিন আগে চিঠি লিখেছি। ঢাকা জেলার আমতলি গ্রামটা পৃথিবীর ওপারের কোন দেশ নয় ; এর ভেতর উত্তর এসে যাওয়া উচিত ছিল।

আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলাম। অস্থির গলায় বললাম, 'না, এখনও পাই নি। কিন্তু—'

'বল—'

'অনেকদিন হল চিঠি লিখেছি। এর মধ্যে কোন বিপদ-আপদ হল কিনা বুঝতে পারছি না। ভাবছি—'

'কী ?'

'কাল-পরশুর ভেতর চিঠি না পেলে দেশেই চলে যাব।'

একটু নীরবতা। তারপর আমিই আবার বললাম, পাকিস্তানে গোলমালের কোন খবর পেয়েছেন ?'

শিশির মুখুটি বললেন, 'না। এ ক'দিনের খবরকাগজ ভাল করে দেখতে পারি নি।'

রাধামোহন বললেন, 'গ্রামের দিকে কোন কিছু হলে তা কি আর কাগজে বেরোয় ? কত খবর জানতেই পারা যায় না !'

আমার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। কী করব, কী বলব—কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না।

শিশির মুখুটি আমার মনের অবস্থা খানিকটা বুঝতে পারলেন যেন। বললেন, 'তাই তো, ভারি চিন্তার কথা। কি এক সর্বনাশা পার্টিশান হল, আমাদের পূর্ববাংলার হিন্দুদের আর বাঁচার পথ নেই।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তা এক কাজ কর—'

'কী ?'

'কাল একবার শিয়ালদা স্টেশনে যাও। দেশের লোক রোজই আসছে। তোমাদের গ্রামের, কি আশেপাশের গ্রামের কেউ এসে পড়তে পারে। তাদের কাছে খবর-টবর পেয়ে যাবে। আর যদি তেমন কারোকে না পাও একটা টেলিগ্রাম করে দাও। এখনই—' বলতে বলতে থেমে গেলেন শিশির মুখুটি।

'এখনই কী ?'

'কিছু না জেনেশুনে হুট করে তোমার দেশে যাওয়া ঠিক হবে না।'

উদ্বেগের সুরে বললাম, 'কেন বলুন তো ?'

একটু ভেবে নিয়ে শিশির মুখুটি বললেন, 'যদি গোলমাল-টোলমাল হয়ে থাকে, তুমি গিয়ে বিপদে পড়বে।'

রুদ্ধ গলায় বললাম, 'কিন্তু আমার মা-বাবা-বোন, ওরা ? বুকের ভেতরটা ঝড়ের দোলায় যে কাঁপতে শুরু করেছে। মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ ধারাল কোন অস্ত্রে আমার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

শিশির মুখুটি এবার কী বলবেন, ভেবে পেলেন না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আর ক'দিনের ? একই দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে একই ট্রেনে এসেছি—এই পর্যন্ত। তারপর দুদিন মোটে দেখা হয়েছে।

আত্মীয়তা শুধু রক্তের সম্পর্কেই হয় না। মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যও কখনো কখনো একজনকে আরেকজনের খুব কাছে এনে দেয়। পূর্ববাংলার সকল বিড়ম্বিত ছিন্নমূল মানুষ একই দুর্বিপাকের শিকার হয়ে পরস্পরের আপনজন হয়ে উঠেছে।

দিশেহারার মত শিশির মুখুটি বললেন, 'তোমাকে কী করতে বলব, বুঝতে পারছি না।'

এ বাড়িতে বসে থাকতে আমার আর ইচ্ছে করছিল না, কথা বলতেও না। দেশের খবরের জন্য আমার সমস্ত অস্তিত্ব উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

এরই ভেতর হঠাৎ চোখে পড়ল, মালতী একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষণকালের জন্য হলেও নিজেদের অপার দুঃখ এবং শোকের কথা সে বুঝিবা বিস্মৃত হয়েছে। চোখমুখ দেখে মনে হল, আমার জন্যই এই মুহূর্তে সে উদ্বিগ্ন, বিচলিত।

আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে এখন কোন কিছুই রেখাপাত করার কথা নয়। মালতীর উৎকণ্ঠা আলতোভাবে আমার ভাবনার বাইরের দিকটায় ছুঁয়ে গেল মাত্র।

আর কিছুক্ষণ পর উঠে পড়লাম। বললাম, 'আজ আমি যাই।'

শিশির মুখুটি আর বাধা দিলেন না। আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত সবাই এলেন।

শিশির মুখুটি বললেন, 'দেশের খবর-টবর পেলে জানিও।'

'জানাব।'

খানিক ইতস্তত করে শিশির মুখুটি এবার বললেন, 'আমি তোমাকে 'না' বলতে পারি না ; তোমার বাবা-মা-বোন দেশে আছে। যদি একান্তই যেতে হয়, খুব ভেবেচিন্তে সাবধানে যাবে।'

সংক্ষেপে বললাম, 'আচ্ছা—'

'দেশে যদি যাও আমরা যেন জানতে পাই।'

'জানাব।'

মালতী সেইরকম উদ্বেগপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিশির মুখুটিরা বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি বিদায় নিয়ে ট্রামরাস্তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

যখন যাদবপুর পৌঁছুলাম তখনও খুব একটা রাত হয় নি। খুব বেশি হলে সাড়ে আটটা ন'টা। কিন্তু এরই ভেতর শহরতলীর এদিকটা একেবারে নিঝুম নিষুতিপুর হয়ে গেছে।

পৌষ মাস শেষ হয়ে আসতে চলল; শীতের আসর জমজমাট। সেই সন্ধ্যে থেকে যে হিম পড়েছে সেগুলো ঘন হয়ে এখন চারদিক ঝাপসা করে দিচ্ছে। রাস্তার আলোগুলো নিষ্প্রভ, মিটমিটে। শীতের কুয়াশা তাদের ঘিরে ঘিরে একেবারে মলিন করে দিয়েছে।

গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মঙ্গলের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'এই যে দাদাবাবু, সারাদিন ছিলেন কোথায়?'

কোথায় ছিলাম, বললাম। তারপর ভয়ে ভয়ে শুধোলাম, 'কেন বল তো? পিসেমশাই খুঁজছিলেন নাকি?'

'তেমন কিছু না। একবার শুধু আপনার কথা শুধিয়েছিলেন। আপনি বাড়ি আছেন না বেরিয়ে গেছেন—এই কথা। যান, ঘরে যান। শীতে একেবারে কালিয়ে গেছেন।'

আমি সামনের দিকে পা বাড়ালাম। মঙ্গলও উল্টোদিকে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভালো কথা দাদাবাবু—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'কিছু বলবে?'

'আজ্ঞা, আপনার নামে একখানা চিঠি এসেছে।'

এস্রাজে দ্রুত ছড় টানার মত ঝড়ের বেগে আমার বুকের ভেতর দিয়ে অতি দ্রুত কি যেন বয়ে গেল। তবে কি বাড়ির খবর এসেছে? অস্থির কাঁপা গলায় বললাম, 'চিঠিটা কোথায়?'

'আপনার ঘরে; বিছানার ওপর রেখেছি।'

নিশ্বাস বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে চলে এলাম। দেয়ালে বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে বিছানার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, সত্যিসত্যিই একটা খামের চিঠি।

ছোঁ মেরে খামটা তুলে নিয়ে দেখলাম, গোটা গোটা অক্ষরে আমার নাম ঠিকানা লেখা। কিন্তু হাতের লেখাটা একান্ত অপরিচিত। বাবা-মা কিংবা

সবিতার লেখার ধাঁচ এরকম নয়। ভাল করে লক্ষ্য করতেই এবার চোখে পড়ল, খামটা পাকিস্তানের না, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নেরই।

কে আমাকে এ চিঠি লিখতে পারে? বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শিথিল হাতে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। ভেতর থেকে যে চিঠিটা বেরুল সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত।

তাড়াতাড়ি 'ইতি'র তলায় নামটা দেখে নিলাম। সেখানে 'বিশাখা সোম' লেখা রয়েছে।

বিশাখা আমাকে এ চিঠি লিখেছে! প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চাইল না। তারপর অন্যমনস্কের মত পড়েই ফেললাম।

'চিরঞ্জীববাবু,

আপনার মত অভদ্র ব্রুট ইয়ংম্যান আমার জীবনে আর কখনো দেখি নি। সভ্য সমাজে এ জাতীয় মানুষ একেবারে অচল। মেয়েদের মর্যাদা দিতে আপনি জানেন না।

অভদ্রতার জন্য সেদিন রাত্রে আপনাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম। আশা করি শীতের ভেতর একা-একা পায়ে হেঁটে যাদবপুর ফিরতে ফিরতে আপনার কিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়েছে। ভেবেছিলাম, আপনার কথা মনে রাখব না। কিন্তু কেন জানি না, আপনার সম্বন্ধে খানিকটা দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে। আপনাকে মেজেঘষে পালিশ-টালিশ করে সভ্য সমাজে চালু না করা পর্যন্ত আমার ঘুম নেই।

আসছে রবিবার আমাদের বাড়ি যদি একবার আসেন, খুশী হব। নইলে আমাকেই গিয়ে যদেবপুরে চড়াও হতে হবে। ইতি 'বিশাখা সোম।'

পড়া শেষ হলে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কে চেয়েছিল এ চিঠি? বিশাখার জন্য আমার যেন ঘুম হচ্ছিল না।

আজও বাবার চিঠি আসে নি। গভীর নিদারুণ হতাশা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরতে লাগল।

বাইশ

পরের দিন সকালবেলা উঠেই শিয়ালদা ছুটলাম। শিশির মুখুটি বলেছিলেন দেশ যাবার আগে ইস্টবেঙ্গল মেলে যেন খোঁজ নিই।

শিয়ালদা স্টেশনে সেই একই দৃশ্য। দেশের মাটি থেকে উন্মূল হাজার

হাজার বিড়ম্বিত মানুষ চারদিকে পিণ্ডাকারে ভয়ার্ত পশুর মত বসে আছে। ওদিকে সারি সারি লঙ্গরখানা। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম-লেখা লাল সালুর পতাকাগুলো চারধারে উড়ছে।

আমি পৌঁছুবার পরই ইস্টবেঙ্গল মেল এসে পড়ল। কামরায় কামরায় উঁকি দিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, 'বজ্রযোগিনী, সোনারঙ, পাইকপাড়া, মীরকাদিম, টঙ্গিবাড়ি, আমতলি থেকে কেউ এসেছেন ?'

সাড়া পাওয়া গেল না।

পরের দিনও শিয়ালদায় হানা দিলাম। আজও ওদিককার কেউ আসে নি। তার পরের দিনও সেই একই ব্যাপার।

পর পর তিনটি দিন আমাকে ব্যর্থ হতাশ হয়ে ফিরতে হল।

আমার দুর্বল উৎকণ্ঠিত মন বলতে লাগল, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে— ভয়াবহ বিপজ্জনক কিছু।

তৃতীয় দিন শিয়ালদা থেকে যাদবপুর ফিরতে ফিরতে আমার ভয় এবং উদ্বেগ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। নিদারুণ মানসিক অস্থিরতা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে মনে স্থির করলাম, দেশে ফিরে যাব। যা-ই ঘটুক, দেশে আমাকে ফিরে যেতে হবেই।

যাদবপুর এসে বিছানাপত্র গোছগাছ করতে বসলাম। সন্ধ্যেবেলা ইস্টবেঙ্গল মেল ধরব। গুছিয়ে নেবার পর পিসেমশাইকে যাবার কথা বলব।

বাঁধা-ছাঁদা সাজানো-গোছানো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় মঙ্গল একটা খাম নিয়ে এল, 'দাদাবাবু আপনার চিঠি—'

চকিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই ভয় হল, 'বিশাখা' আবার চিঠি লেখে নি তো ?

মঙ্গল তাড়া দিল, 'কি হল, নিন—'

এবার হাত বাড়াতে হল। চিঠিটা নিয়ে তাকাতেই আমার সত্তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মত কী যেন খেলে গেল ; খামের ওপর বাবার হস্তাক্ষর।

এতদিনে—এতদিন পর দেশের খবর এসেছে।

বাবা লিখেছেন—

'স্নেহের বিলু, দিনকয়েক আগে তোর চিঠি পেয়েছি। জানি তুই দুর্ভাবনায় আছিস তবু উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

'তুই যাবার পরই পূর্ববাংলা জুড়ে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেই হাওয়া আমাদের তুচ্ছ নগণ্য আমতলি গ্রামেও এসে লেগেছে। আমরা পূর্ব-

বঙ্গবাসীরা এখন আহার-নিদ্রা ভুলেছি ; আমাদের দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত বিচিত্র উন্মাদনায় কাটছে।

'শুনেছি একমাত্র যৌবনই নাকি উন্মাদনার কাল। সে সময় কোন হিসেব থাকে না, পিছুটান থাকে না। আবেগের রসে প্রাণ তখন টলোমলো। মোহবন্ধন ছিন্ন করে মানুষ হাতের কাছে যে স্রোতটি পায় তাতেই ঝাঁপ দিতে পারে। তুই তো জানিস, আমার যখন বয়ঃসন্ধি সেই সময়ে বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে এক রোমাঞ্চকর অভিযানে যেতে উঠেছিলাম। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় মাতামাতির দিন যেন আমার কাছে এসে আজ দাঁড়িয়েছে।

'আমার বয়েস এখন পঞ্চাশ। ঠিক পঞ্চাশ না, গেল আষাঢ়ে একান্নয় পড়েছি। অর্থাৎ পুরাতন এই বসুন্ধরায় এক শতাব্দীর অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেল। এই পরিণত বয়েসে জগতের সমস্ত কিছুই তো আসক্তিহীন উদাসীন চোখে দেখবার কথা। কিন্তু পূর্ববাংলায় এই মুহূর্তে যা ঘটে চলেছে, আমার মত ফুরিয়ে-আসা নিভু-নিভু মানুষের ভেতরেও তা নতুন আলো জ্বেলে দিয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের মাটি থেকে সমূলে আমাকে উপড়ে নিয়ে গতিশীল উদ্দীপনার ভেতর ছুঁড়ে দিয়েছে।

'ইণ্ডিয়ার কাগজে খবর-টবর বেরিয়েছে কিনা জানি না। যদি বেরিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই দেখেছিস, পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন চলছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে অনেক তরুণ প্রাণ দিয়েছে।

'রাজনীতিবিদরা যা পারেন নি, সমাজতাত্ত্বিকরা যা পারেন নি, প্রাণের চাইতেও যা পবিত্র যা প্রিয়, সেই মাতৃভাষা তা সম্ভব করেছে। ভাষা-আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙালীকে এক করে দিয়েছে। পঞ্চাশ-একান্ন বছরের জীবনে বাঙালী জাতিকে এই পূর্ববাংলায় আর কখনও কোন ঘটনায় এমন একাকার অভিন্নহৃদয় হয়ে যেতে দেখি নি। পারস্পরিক ঘৃণা, সন্দেহ, জাতিবিদ্বেষ নিঃশেষে মুছে গেছে। বহু শহীদের আত্মদানে, বহু মানুষের রক্তে পূর্ববাংলা এখন পুণ্যভূমি। যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ তো এই স্বর্গেরই ধ্যান করে এসেছে। এখানে বাস করে, এদেশের বাতাস বুকে টেনে মনে হয়, হতাশ হবার কিছু নেই। সুধার পাত্র আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে।

'তুই লিখেছিস, আমাদের বাড়ি, জমিজমা ইণ্ডিয়ার এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ি এবং জমিজমার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করতে চাই কিনা। কোন্ দুঃখে করব? মাঝখানে বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। ভাষা-আন্দোলন দেখে আশা জেগেছে ; নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না।

'তুই আরো জানিয়েছিস, একটা চাকরি নাকি মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছিস। তার আর দরকার নেই। তোর রাজেককাকা থেকে শুরু করে গ্রামের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে 'লীগে'র বক্তৃতা শুনে যারা ক্ষেপে উঠেছিল তারা পর্যন্ত চায় তুই ফিরে আয়। তোকে ফিরিয়ে আনবার জন্য রোজই একবার করে তারা আমার কাছে আসছে। গ্রামের ছেলে বিদেশে গিয়ে থাকবে, এ তাদের মনঃপূত নয়।

'চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবি। তোর পিসেমশাইকেও একখানা চিঠি দিলাম। বিপদের দিনে সে যে তোকে আশ্রয় দিয়েছে তার জন্য অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমরা ভালই আছি। আশীর্বাদ জানবি। ইতি—বাবা।'

চিঠিখানা পড়ে কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত বসে থাকলাম। কলকাতায় আসবার পর খবরকাগজ কি দেখি নি? নিশ্চয়ই দেখেছি। প্রতিদিন দেখেছি। খবর-কাগজের সেই পাতাটাই শুধু আমাকে আকর্ষণ করেছে যেখানে কর্মখালির বিজ্ঞাপন থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পাতাটাই শুধু দেখেছি। অন্য পাতাগুলো দ্রুত উল্টে গেছি।

মনে পড়ছে, ভাসা-ভাসা ভাবে ভাষা-আন্দোলনের খবরটা পড়েছিলাম বটে। কিন্তু সেটা যে পূর্ববাংলায় এখন বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে তা কে জানত। ঘৃণায় বিদ্বেষে পূর্ববঙ্গ যখন নরক তখন এই আন্দোলন যে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত নেমে এসেছে, কে ভাবতে পেরেছিল?

বিহ্বলতা কাটলে খেয়াল হল, দেশে ফেরার জন্য আমি নিজেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম। কতকাল বাড়ির খবর নেই। দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। সে সব মুহূর্তে মুছে গেল। আকণ্ঠ অসহ্য এক আবেগ বুকের অতল থেকে উথলে উঠে আসতে লাগল যেন।

দেশে আমি যাব ঠিকই। এ যাওয়া পরম কাম্য। নিরুদ্বেগ আনন্দময় মন নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যে কি সুখের! বার বার মনে হতে লাগল, পূর্ববাংলা যেন তার সরস শ্যামল মাটিতে নিজের হৃদয়খানি বিছিয়ে দিয়ে আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। দেশের জন্য আমার সত্তা যেন লালায়িত হয়ে উঠল।

চিঠিখানা নিয়ে একসময় উঠে পড়লাম। এখনই একবার পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

তেইশ

দোতলায় আসতেই চোখে পড়ল, দীর্ঘ বারান্দায় বড় বড় পা ফেলে পায়চারি করছেন পিসেমশাই। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এসো—'

কাছে এগিয়ে গেলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'বাইরে খুব ঠাণ্ডা। চল, ঘরে যাই—'

আমরা দু'জনে সামনের বড় ঘরখানায় ঢুকলাম। আমাকে বসতে বলে পিসেমশাই মুখোমুখি বসলেন। বললেন, 'আজ তোমার বাবার একখানা চিঠি পেয়েছি।'

বললাম, 'আমিও পেয়েছি।'

'কী লিখেছেন তোমাকে ?'

'দেশে ফিরে যেতে লিখেছেন।'

'আমাকেও লিখেছেন তোমাকে পাঠিয়ে দিতে।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর পিসেমশাই বললেন, তোমার বাবা তো জানাচ্ছেন, ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা এখন ভাল। কোনরকম গোলমাল নেই—'

মাথা নাড়লাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ; আমাকেও তাই লিখেছেন।'

'তোমার কী মনে হয় ? ব্যাপারটা খুব সাময়িক না ?'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটা ?'

'এই যে ভাষা-আন্দোলনের নামে হিন্দু-মুসলমানের এক হয়ে যাওয়া—'

বাবার চিঠিটা হাতে আসার পর থেকেই আবেগের স্রোতে ভাসছিলাম। বললাম, 'আমার তো মনে হয় ওটা স্থায়ী হবে। পূর্ববাংলার হিন্দুদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।'

পিসেমশাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, 'আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হয়।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'সমস্ত ব্যাপারটা এখন ইমোশনের ওপর চলছে। ওটা থিতিয়ে গেলে কী দাঁড়াবে, ভাববার কথা।'

কথাটা আমার ভাল লাগল না। সারা পূর্ববঙ্গ—চট্টগ্রামের সেই পাহাড়চূড়া থেকে খুলনার সমভূমি পর্যন্ত আজ উত্তাল। ভাষার জন্য কত মানুষ আজ শহীদ ;

জাতিধর্ম নির্বিশেষে আজ সবাই হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সবই কি ক্ষণিকের ? সাময়িক আবেগের ঘোরেই কি লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে ? অসম্ভব। আমার মন কিছুতেই এতে সায় দিতে পারল না।

পিসেমশাই আবার বললেন, 'ভাষাটা মস্ত ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু একমাত্র ব্যাপার না। মনে রেখো পাকিস্তানে আরো অসংখ্য বিপজ্জনক দিক আছে। তার যে কোন একটা তুলে নিয়ে পলিটিক্যাল পার্টির লীডাররা যে কোন মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।'

এবারও আমি চুপ।

পিসেমশাই বলতে লাগলেন, 'ব্যাপারটা কী জানো, এই তো সেদিন পাকিস্তান হল। তার আগে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আমার অচেনা নয়। তারা খুবই সরল, ভাল। কিন্তু বেশির ভাগই অশিক্ষিত। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা নেই। ফলে যে কোন একটা জিগির তুলে তাদের যে কোন দিকে চালিয়ে নেওয়া খুবই সহজ, আর তার জন্যে কিছু কিছু পলিটিক্যাল লীডার ওৎ পেতে আছে। আমার ভয়, ভাষা-আন্দোলনের মত এমন একটা মহৎ ব্যাপার ওরা আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে না দেয়।'

এজাতীয় কথা এখন আমার পছন্দ নয়। মৃদু গলায় বললাম, 'এবার বোধ হয় ঘুরবে না।'

পিসেমশাই হাসলেন, 'না ঘুরলেই ভাল। আমিও তো তাই চাই। বার বার মানুষের রক্তে পূর্ববাংলার মাটি ভিজবে, মৃতদেহের ওপর শকুনের পাল উড়তে থাকবে, তা কি কারো কাম্য হতে পারে, না হওয়া উচিত ?'

একটু চুপ।

তারপর পিসেমশাই আবার শুরু করলেন, 'তা হলে দেশে ফিরছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কবে যাচ্ছ ?'

মনে মনে মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি, কবে ফিরব। তবু বললাম, 'আপনি কবে যেতে বলেন ?'

'তোমার বাবা যাবার জন্যে জোর তাগিদ দিয়েছেন ; দু-একদিনের ভেতরেই রওনা হও।'

'আচ্ছা।'

পিসেমশাই বললেন, 'যাবার আগে আমার সেই কাজটা কিন্তু করে দিয়ে

যেতে হবে।'

'কোন্ কাজটা?'

'ঐ যে হিসেবের খাতায় কোন গোলমাল-টোলমাল আছে কিনা—'

মনে পড়ল। আট-দশ বছরের খাতা দেখে ফেলেছি। বাকি খাতাগুলো আজকালের ভেতরেই চুকিয়ে ফেলব। বললাম, 'ওগুলো শেষ করেই যাব।'

'গুড। আরেকটা কথা—'

আমি তাকিয়ে রইলাম।

পিসেমশাই বললেন, 'এবার যেজন্যে কলকাতায় এলে সেজন্যে যেন কখনও আর আসতে না হয়। যদি একান্তই সে দুর্ভাগ্য হয় আমার দরজা তোমার জন্যে খোলা আছে। সোজা এখানে চলে আসবে।'

'আচ্ছা।'

'যাও, এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম কর গে—'

উঠে পড়লাম।

প্রায় সারারাত হিসেবের খাতাগুলো দেখে কাটিয়ে দিলাম। সকালবেলা হঠাৎ অমলের কথা মনে পড়ে গেল। এই ছেলেটির কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ। কলকাতায় আসার পর যাকে আমার সবচাইতে আপনজন মনে হয়েছে সে অমল; তার খুব কাছাকাছি চলে আসতে পেরেছিলাম। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। অমলই দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে তার প্রাণের মাঝখানে টেনে নিয়েছিল।

খুব ইচ্ছে হতে লাগল, দেশে ফেরার আগে অমলের সঙ্গে একবার দেখা করি। পরক্ষণেই খেয়াল হল, দেখা তো করব, তাকে পাব কোথায়? এই বিশাল নগরে কোথায় সে আছে কে জানে। তার ঠিকানা কে আমাকে বলে দেবে?

এ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর অমল অবশ্য আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল, তাতে ঠিকানা ছিল না।

অমলের ঠিকানার জন্য যখন উন্মুখ, সেই সময় সুরেশের কথা মনে পড়ল। সুরেশের সঙ্গে অমলের যোগাযোগ ছিল সবচাইতে বেশি। সুরেশ তার খবর রাখলেও রাখতে পারে।

কথাটা মনে হতেই আর বসে থাকলাম না। সুরেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

'বাস্তুহারা সঙ্ঘে'র অফিসে আসতেই সুরেশকে পাওয়া গেল। একাই

ছিল সে। পরনে চেক-কাটা লাল লুঙ্গি, গায়ে মোটা খদ্দরের চাদর জড়ানো। খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে ছিল সুরেশ। আমাকে দেখে কাগজটা একধারে ঠেলে দিয়ে অভ্যর্থনায় সরব হয়ে উঠল, 'আরে আসো—আসো। কি সৌভাগ্য আমার।'

আমি সুরেশের কাছে গিয়ে বসলাম। বললাম, 'আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি সুরেশদা—'

'দরকারের কথা পরে হইব। কী খাইবা আ গে কও—'

'কিছু খাব না। এইমাত্র আমি খেয়ে এসেছি।'

'পর-পর ভাবো ক্যান ?'

বিব্রতভাবে বললাম, 'পর-পর ভাবব কেন ?'

সুরেশ আমাকে আর কিছু বলল না। ভেতর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল, 'সুখী—সুখী—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে-গলায় সাড়া ভেসে এল।

সুরেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই দু'কাপ চা আর মুড়ি-তেলেভাজা আনতে বলে দিল। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'এট্টু চা-টা না হইলে আড্ডা জমে না।'

হাসলাম।

সুরেশ চা-প্রসঙ্গে আরো বলতে কিছু যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্য কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ভালো কথা, ঘ্যাশের চিঠি-টিঠি পাইছ ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'পেয়েছি।'

'কবে ?' আগ্রহে গলা কাঁপতে লাগল সুরেশের।

সুরেশের এত আগ্রহের কারণটা কী, বুঝতে পারছি। বাবার চিঠির জন্য আমার মত সে-ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। বললাম, 'কাল।'

'কাইল চিঠি আইছে আর তুমি আইজ আইলা (এলে) আমার কাছে ?' সুরেশের কণ্ঠস্বরে রীতিমত ক্ষোভ, অনুযোগ।

চিঠি পাবার পর সুরেশের কথা একবারও যে আমার মনে হয় নি সে কথা আর কেমন করে বলি। যা বললাম তা এইরকম, 'কাল সারাদিন বাড়ি ছিলাম না ; রাতে বাড়ি ফিরে বাবার চিঠি পেয়েছি। তখন আর কেমন করে আসি ?

'তা তো ঠিকই ? সুরেশ বলল।

আমি চুপ করে থাকলাম।

সুরেশ আবার বলল, 'কী লেখছেন তোমার বাবায় ? বাড়িঘর জমিজমা

এক্সচেঞ্জ করবেন তো?'

'না।'

প্রথমে কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না সুরেশ। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হতাশ স্বরে বলল, 'সত্য?'

'হ্যাঁ।'

'এক্সচেঞ্জ করবেন না ক্যান?'

বাবার চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। সেটা পড়ে শুনিয়ে দিলাম; দেশের বাড়ি-টাড়ি বিনিময় করে সীমান্তের এপারে না আসার কারণগুলো তার মধ্যেই আছে।

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল সুরেশ। তারপর বলল, 'তোমার বাবা তোমারে ত্যাশে ফিরতে লেখছেন দেখি।'

'হ্যাঁ—'

'ত্যাশে সত্যসত্যই যাইবা নাকি?'

'হ্যাঁ। কাল কি পরশু রওনা হব।'

একটু ভেবে নিয়ে সুরেশ বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

সুরেশ বলতে লাগল, 'পাকিস্তানে এই সুখের দিন চিরকাল থাকব না। মনে রাইখো ঐটা ইসলামিক স্টেট। পুরাপুরি ধর্মের গোঁড়ামির উপুর গইড়া উঠছে।'

পিসেমশাইও ভাষা-আন্দোলনকে ঘিরে পূর্ববাংলার এই রূপান্তর খুব নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

যাই হোক, এবারও আমি চুপ করে থাকলাম।

সুরেশ থামে নি, 'তোমার বাবা খুব ভুল করলেন। এক্সচেঞ্জ কইরা তেনার চইলা আসা উচিত আছিল। কত কইরা একটা পার্টি যোগাড় করলাম। পরে আর এই সুযোগ পাইবা না।'

সুরেশের আপসোস এবং ক্ষোভের কারণটা একেবারে অবোধ্য নয়। সীমান্তের এপারের এক মুসলমান ভদ্রলোককে সে খুঁজে বার করেছিল। ভদ্রলোকটি আমাদের দেশের বাড়িঘরের সঙ্গে তাঁর বাড়িঘর জমিজমা বিনিময় করতে চান। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সুরেশের কিছু স্বার্থ আছে। সেদিক থেকে সুবিধা হল না বলে সে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ।

সুরেশের ক্ষোভ, হতাশা কিংবা সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে যে শুভবোধ,

দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ—এসব দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। দেশে ফেরার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এই মুহূর্তে লালায়িত হয়ে আছে। জমিজমা বিনিময় কি পাকিস্তানের অস্থির রাজনৈতিক প্রসঙ্গ চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম সুরেশদা—'

'কী দরকার ?'

'অমল তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, আপনি জানেন কি ?'

'জানি।'

'তার এখনকার ঠিকানাটা জানেন ?'

'জানি। এই তো কালই আমার কাছে এসেছিল।'

'অনুগ্রহ করে অমলের ঠিকানাটা যদি দ্যান বড় ভাল হয়। যাবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করব।'

সুরেশ একটা কাগজে অমলের ঠিকানা লিখে দিল। তারপর বলল, 'দ্যাশে যাইতে আছ, যাও। তবে একখান কথা কইয়া দেই—ছয় মাসও না—'

সুরেশ কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ছমাস না ?'

'পাকিস্তানে গিয়া ছয় মাসও টিকতে পারবা না। তার মধ্যেই ইণ্ডিয়ায় ফিরা আইতে হইব।'

উত্তর দিলাম না।

একটানা একতরফা আরো কিছুক্ষণ বকে গেল সুরেশ, আমি শুনে গেলাম। তারপর একসময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার ইচ্ছা, কালই শিয়ালদা থেকে ইস্টবেঙ্গল মেল ধরব। কাজেই হাতে সময় নেই; মাঝখানে একটা দিন মাত্র। এর ভেতরেই দেখা-টেখা সেরে ফেলতে হবে। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে হঠাৎ শিশির মুখুটির কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, ওঁদের বাড়িও একবার যাওয়া দরকার।

সুরেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠিক করলাম, এখনই অমলের ঠিকানাটা খুঁজে বার করব। নইলে দেখা করার আর সময় হবে না।

অমলের ঠিকানা টালিগঞ্জের কাছাকাছি একটা জায়গায়। কিভাবে সেখানে যেতে হবে কাগজে তার ছক কেটে দেখিয়ে দিয়েছে সুরেশ। নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন প্রায় দুপুর।

এখানে অমল থাকে বা থাকতে পারে, প্রথমটা বিশ্বাস হল না। বিহ্বলের

মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমার সামনে থেকেই শুরু হয়েছে বস্তি। খাপরা-ছাওয়া চাল ঢেউয়ের মত কোথায় কতদূরে গিয়ে শেষ হয়েছে, কে জানে। সামনে কাঁচা ড্রেন, স্তূপীকৃত আবর্জনা, ভনভনে মাছি, ঘেয়ো কুকুরদের নিরন্তর কলহ। এক কোণে একটা বারোয়ারি কলের সামনে সারি সারি বালতি বসানো। কখন জল আসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যখনই আসুক তার জন্য এখন থেকেই লাইন পড়ে গেছে।

বস্তিগুলোর সামনের দিকে, নর্দমার ঠিক ওপরেই চা-তেলেভাজার দোকান। এই দুপুরবেলাতেও একটা মাঝবয়সী লোক—যার কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা তোবড়ানো গাল, শুকনো চেহারা, পরনে চিটচিটে খাটো ধুতি আর ফতুয়া—প্রকাণ্ড কড়াইতে কালচে রঙের ফুটন্ত তেলে ফুলুরি ভাজছিল। তিন-চারটে লোক নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে উদগ্রীব তাকিয়ে আছে। ফুলুরিগুলো নামলেই হয়। তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এতগুলো বস্তির ভেতর থেকে অমলকে কেমন করে খুঁজে বার করব? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর পায়ে পায়ে তেলেভাজার দোকানটার কাছে চলে এলাম। বললাম, 'আচ্ছা, এখানে অমল চ্যাটার্জী বলে কেউ থাকে? নতুন এসেছে—'

বলামাত্র চিনে ফেলল দোকানদার। সম্ভ্রমের সুরে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, থাকে। এই দিন চার-পাঁচেক হল, এয়েচেন। চ্যাটার্জীবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন?'

'হ্যাঁ—'

যে লোকগুলো সামনের বেঞ্চিতে বসেছিল, দোকানদার তাদের একজনকে বলল, 'এ্যাই নন্দ, যা দিকিন, বাবুকে এট্টু চ্যাটাজ্জিবাবুর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।'

যে উঠে দাঁড়াল তার বয়েস বেশি নয়, ছোকরামত। বলল, 'চলুন স্যার—'

আমাকে নিয়ে বস্তির ভেতর ঢুকল ছোকরা। দু'ধারে সারি সারি ঘর। মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি; সেটা যুগপৎ রাস্তা এবং নর্দমা। দু'ধারের ঘরগুলো থেকে যত ক্লেদ এসে সেখানে জমা হয়েছে। কোনদিন ওগুলো পরিষ্কার করা হয়, এমন ধারণা করবার কারণ নেই। ফলে সর্বক্ষণ ভারী দুর্গন্ধ এখানে অনড় হয়ে আছে।

দু'ধার থেকে খাপরার চাল এমনভাবে নেমে এসেছে যাতে আকাশ দেখা যায় না। পৃথিবীর আলো পৃথিবীর বাতাস কোনদিন এখানে আসার পথ

পায় না।

সবগুলো ঘরেরই সামনের বারান্দা ঘিরে রান্নার ব্যবস্থা। ছোকরার পিছু পিছু চলতে চলতে মনে হল, প্রতিটি ঘরেই একটি করে পরিবারের বাস।

এই দুপুরবেলা কোন ঘরে খাওয়ার পালা চলছে। কোথাও বা একদল মেয়েমানুষ রুক্ষ চুলের বোঝা মেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে; আরেক দল চিরুনি দিয়ে তাদের চুল আঁচড়ে তেল-টেল মেখে চকচকে করে দিচ্ছে। কোথাও বস্তিবাসিনীদের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র চলছে। চিৎকারে, কুৎসিত গালাগালিতে কাক-চিল উড়ে যাচ্ছে। আর একপাল অর্ধে'লঙ্গ ছেলেমেয়ে মাঝখানের সরু রাস্তাটা দিয়ে ভনভনে মাছির মত ছোটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

আমার শ্বাস প্রায় আটকে আসতে লাগল। কোনরকমে নাকে কাপড় চেপে সন্তর্পণে চলতে লাগলাম।

যে ছোকরা আমাকে পথ দেখিয়ে আনছিল, একটা ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; অগত্যা আমাকেও দাঁড়াতে হল।

ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছোকরা ডাকতে লাগল, 'চ্যাটার্জিবাবু, চ্যাটার্জি-বাবু—'

আমার সংশয় ছিল, সত্যিই এখানে অমল থাকে কিনা। কিন্তু একটু পর ঘর থেকে যে বেরিয়ে এল সে অমলই। আমাকে দেখে সে অবাক; কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'আরে তুমি! তুমি এখানে এলে কী করে?'

কিভাবে এসেছি, বললাম।

'এসো এসো, ভেতরে এসো—'

সেই ছোকরাটি এইসময় বলে উঠল, 'আমি তা হলে যাই চ্যাটার্জিবাবু—'

আমি কিছু বলবার আগেই অমল বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই যা।'

ছোকরা চলে গেল।

আমরা ঘরের ভেতর এলাম। আমাকে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চিতে বসিয়ে হেসে হেসে অমল বলল, 'খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে তোমার যা অধ্যবসায় তাতে ইচ্ছে করলে দক্ষিণ মেরু-টেরু আবিষ্কার করে ফেলতে পারতে।'

আমিও হাসলাম। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিযে ঘরের ভেতরটা দেখতে লাগলাম। এই দুপুরবেলাতেও ঘরে আলো নেই। আবছা অন্ধকারে যেটুকু দেখা গেল তা এইরকম। কোণে কোণে ঝুল জমে রয়েছে। একধারে গোটা-দুই ভাঙাচোরা বাক্স; দুটো গুটিয়ে রাখা নোংরা বিছানা। আরেক ধারে

টাঙানো দড়িতে খানকতক ময়লা জামাকাপড় ঝুলছে।

কোথায় ছিল অমল আর কোথায় এসেছে! নিশ্চিন্ত জীবন,উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পরিপূর্ণ আরাম—এসব ছেড়েছুড়ে কেন যে ছেলেটা এই নরকবাস বেছে নিল সে-ই জানে।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। অমল ডাকল, 'এই—'

মুখ ফেরাতেই সে আবার বলল, 'কী দেখছ?'

ব্যথিত স্বরে বললাম, 'এ তুমি কোথায় এসে উঠেছ অমল!'

'কেন?'

বললাম, 'এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে।'

অমলের চোখের তারা নিমেষে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'এই কলকাতা শহরে কত বস্তিবাসী আছে জানো?'

'না।'

'আট-দশ লাখের মত। তারা যদি বেঁচে থাকতে পারে, আমিও মরব না।'

থতমত খেয়ে গেলাম, 'আমি সে-কথা বলছি না।'

'তবে?' শাণিত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল অমল।

বললাম, 'তোমার তো এরকম পরিবেশে থাকার অভ্যাস নেই। তাই—'

অমলের মুখ, তার চোখের দৃষ্টি এবার কোমল হয়ে এল। বলল, 'তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ। তাই আমার জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো ভাই—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

অমল বলতে লাগল, 'খানিকটা লেখাপড়া শিখেছি। বাবার সূত্রে এই কলকাতা শহরে অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে চেনাশোনাও আছে; যাঁরা ইচ্ছে করলে একদিনে রাজা করে দিতে পারে। তাঁদের ধরে অন্তত একটা ভালো চাকরিবাকরি জুটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, আমি লেবার ফ্রণ্টে কাজ করি।'

ঘাড় কাত করে জানালাম, শুনেছি।

অমল বলল, 'আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে; শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কিছু করব। লেবার ফ্রণ্টে কাজ করব অথচ তাদের জীবন জানব না, এ শৌখিন রাজনীতি আমার দ্বারা হবে না। তাই এখানে এই বস্তিতে চলে এসেছি। এখানকার সব মানুষই শ্রমিক, নানা কলকারখানায় কাজ করে। এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে প্রতিদিনের সমস্যাগুলো জানতে পারব।

তাতে তাদের বুঝতে সুবিধে হবে।'

এই সময় একটা কালোমত রোগা মেয়ে এনামেলের থালায় মোটা মোটা লাল ভাত, বড় একটা পেঁয়াজ, দুটো কাঁচা লঙ্কা, নুন আর একটুখানি তেল নিয়ে এল। অমলের সামনে সেগুলো সাজিয়ে দিল প্রথমে। তারপর ঘরের কোণের কুঁজো থেকে কাঁচের গেলাসে জল গড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

অমল বলল, 'আমি খেতে বসলাম ভাই; বড্ড খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে গল্প করি, কেমন?' বলেই হাত ধুয়ে বড় বড় গ্রাস মুখে তুলতে লাগল।

অমলের সামনে যা সাজানো, এবং যেমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেগুলো খেয়ে চলেছে তাতে আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। এখানে, এই পরিবেশে প্রত্যহ যদি এরকম তাকে খেতে হয়, ছেলেটা নির্ঘাত মরে যাবে।

খেতে খেতে একসময় মুখ তুলল অমল, 'তোমাকে কিন্তু খেতে বললাম না ভাই। এসব তুমি খেতে পারবে না।' বলে হাসল।

উত্তর দিলাম না; ব্যথিত মুখে বসে থাকলাম।

অমল আবার বলল, 'ঐ ত্যাখো, এত খুঁজে-পেতে আমাকে বার করলে। অথচ কেন এলে তাই জিজ্ঞেস করি নি। আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ—'

'কী?'

'আমি কাল দেশে চলে যাচ্ছি। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

অমল কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকল। পরে বলল, 'দেশে ফিরে যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ—'

'হঠাৎ?'

'বাবা ফিরে যেতে লিখেছেন।'

'কেন?'

কারণগুলো বললাম।

শুনতে শুনতে চোখ-মুখ আলোকিত হয়ে উঠল অমলের। সে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। অনেক রক্তপাতের পর পূর্ববাংলায় যা এসেছে তাকে চিরকাল টিকিয়ে রাখতে হবে, সেজন্যেও তোমার যাওয়া দরকার। কোন দেশেই কোন যুগেই সাধারণ মানুষ খারাপ না। সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থেকে শুধু ভাল দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নইলে খারাপ লোকেরা তাদের খারাপ পথে নিয়ে যাবে।'

পিসেমশাই এবং সুরেশ সংশয় প্রকাশ করেছে। অমলের কিন্তু মানুষের শুভবোধের ওপর অগাধ বিশ্বাস, অসীম আস্থা।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বললাম, 'আজ উঠি ভাই।'

অমলের খাওয়া এবং আঁচানো হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'এসো।'

বস্তির বাইরের রাস্তা পর্যন্ত অমল আমার সঙ্গে সঙ্গে এল।

বললাম, 'চলি ভাই, আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

অমল বলল, 'সেকথা কে বলতে পারে। দেখা হোক আর না হোক্, সব সময় তোমার জন্য আমার ভালবাসা রইল।'

অমলের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'তা আমি জানি।'

'দেশে গিয়েই একটা চিঠি দিও। তোমার কথাই না; পূর্ববাংলার খবরের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে থাকব।'

চব্বিশ

দুপুরবেলা যাদবপুর ফিরে তাড়াতাড়ি চাট্টি নাকে-মুখে গুঁজে বাগবাজার রওনা হলাম। আজই শিশর মুখুটির সঙ্গে দেখাটা সেরে ফেলব।

কাল এ বাড়িতে এসেছিলাম। চব্বিশ ঘণ্টা পেরুতে না পেরুতে আবার এলাম। এত তাড়াতাড়ি আসব, শিশির মুখুটিরা ভাবেন নি। অপ্রত্যাশিত বলেই হয়তো ওরা অবাক হলেন, খুশীও।

রাধামোহন বাড়ি ছিলেন না। এখন তাঁর থাকবার কথাও নয়। দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়টায় তিনি অফিসে।

আমাকে ঘরে এনে বসালেন শিশির মুখুটি। বললেন, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ—'

ঘরের ভেতর শিশির মুখুটি ছাড়া মালতী ছিল। মালতীর দুই ভাইকে এই মুহূর্তে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাল এ বাড়িতে শ্রাদ্ধ গেছে; তারই কিছু কিছু চিহ্ন চারদিকে ছড়ানো।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

শিশির মুখুটি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। বললেন, 'দেখা করতে মানে—'

'কাল আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'দেশে।'

শিশির মুখুটি চকিত হলেন, 'দেশ বলতে ?'

'ঢাকায়—পাকিস্তানে।'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকলেন শিশির মুখুটি। আমার কথাটা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

আবার বললাম, 'বাবা চিঠি দিয়েছেন।'

'তাই নাকি ? কবে ?'

'কাল আপনাদের এখান থেকে বাড়ি ফিরে পেয়েছি।'

শিশির মুখুটিকে উৎসুক দেখাল। সাগ্রহে শুধোলেন, 'কী লিখেছেন বাবা ? দেশের অবস্থা কেমন ?

বললাম, 'খুব ভাল।' বাবার চিঠিটা সঙ্গেই ছিল। পকেট থেকে বার করে এগিয়ে দিলাম, 'এই যে, পড়ে দেখুন না—'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন শিশির মুখুটি। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। কাঁপা আবেগপূর্ণ গলায় বলতে লাগলেন, 'আমাদের দেশ ভাল হয়ে গেছে। আমাদের দেশ ভাল হয়ে গেছে।' মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই তাঁর চোখমুখ কণ্ঠস্বর গাঢ় বিষাদে ছেয়ে গেল, 'সেই ভাল হল। তুদিন আগে যদি হত! চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। আর তো ফিরে যাবার পথ নেই। গেলে খাবই বা কী ?'

একটু নীরবতা।

তারপর শিশির মুখুটি আবার বললেন, 'তোমরাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। সবাই একসঙ্গে চলে না এসে কেউ কেউ দেশেও থেকে গেছেন। কিন্তু—'

'কী ?'

'তোমাদের যে সুবিধে ছিল আমার তা ছিল না।'

'কিসের সুবিধে ?'

'লোকবলের।' শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'সংসারে পুরুষ বলতে আমি একলাই। অবশ্য ছেলে-তুটো আছে। কিন্তু তারা একেবারেই নাবালক। নিজে দেশের বাড়িতে থেকে ওদের কারোকে যে কলকাতায় পাঠাব, কি ওদের ভরসায় সংসার রেখে আমিই কলকাতায় আসব, তার উপায় নেই। কোথাও নড়তে হলে সবাইকে নিয়ে আমায় নড়তে হয়।'

'তা তো বটেই।' আমি মাথা নাড়লাম।

একটু ভেবে নিয়ে শিশির মুখুটি বললেন, 'কালই দেশে যাচ্ছ তা হলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'কী ভুল যে করেছি! ঝোঁকের মাথায় চলে এলাম। আর ক'টা দিন যদি থাকতাম!'

এ কথার উত্তরে কী-ইবা বলতে পারি; আমি চুপ করে রইলাম।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'সে যাক গে, দেশে গিয়ে আমাদের ভুলে যেও না।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কি আশ্চর্য, ভুলব কেন?'

'দেশে গিয়ে চিঠি লিখো।'

'লিখব।'

হঠাৎ আমার নজর গিয়ে পড়ল মালতীর ওপর। বড় বড় দীর্ঘ দুটি চোখ মেলে মেয়েটা আমার দিকেই পলকহীন তাকিয়ে রয়েছে। কতক্ষণ ধরে রয়েছে, কে জানে। চোখাচোখি হলেও সে মুখ ফেরাল না। মনে হল, মালতী কিছু বলতে চায়।

এই সময় শিশির মুখুটি বলে উঠলেন, 'তোমার সঙ্গে অল্পদিনের আলাপ। এই তো সেদিন পাকিস্তান থেকে আসবার সময় ট্রেনে পরিচয় হল। অথচ—'

মালতীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম।

শিশির মুখুটি বলতে লাগলেন, 'অথচ মনে হয়, কতদিনের জানাশোনা। তোমাকে আজকাল আমাদের সংসারের একজন মনে হয়।'

আরো দু-একটা কথার পর বললাম, 'আজ উঠি।'

'এখুনি উঠবে?'

'জিনিসপত্তর গোছগাছ আছে। বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। ডাইং ক্লিনিং-এ ক'টা জামাকাপড় দিয়েছিলাম, সেগুলো আনতে হবে। সময় তো আজকের রাতটা; কাল সকালেই ট্রেন।'

'সে তো ঠিকই। তোমাকে তাহলে আটকানো উচিত না।'

উঠতে যাব, মালতী হঠাৎ বলল, 'কিন্তু—'

শিশির মুখুটি এবং আমি একই সঙ্গে তার দিকে ফিরলাম। বললাম, 'কিন্তু কী?'

আমার চোখে চোখ রেখে মালতী বলল, 'আমার মনে হয় দেশ খুব বেশিদিন ভাল থাকবে না। আবার হয়তো—'

এ আশঙ্কা পিসেমশাইয়েরও; সে কথা অকপটে তিনি আমাকে বলেছেনও, কিন্তু বাবার মত মানুষের শুভবোধে এবং তার স্থায়িত্বে আমার অগাধ আস্থা। বললাম, 'না না, আর দাঙ্গা-টাঙ্গা বাধবে না। পূর্ববাংলার মানুষ ভালোমন্দ

চিনতে শিখেছে।'

মালতী উত্তর দিল না।

শিশির মুখুটি বললেন, 'ভাল হলেই ভাল। ঘরপোড়া গরু তো, আমাদের মনে খারাপটাই আগে উঁকি ছায়। ধর যদি অবস্থা আবার আগের মত হয়ে ওঠে—'

বললাম, 'তখন বাবা যা বলবেন তাই করব। হয়তো আবার কলকাতায় চলে আসতে হতে পারে।'

'কলকাতায় এলে আমাদের সঙ্গে দেখা কোরো।'

'করব।' বলতে বলতে উঠে পড়লাম।

শিশির মুখুটি আর মালতী আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্যন্ত এল। বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামলাম। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরতেই দেখি শিশির মুখুটি নেই। কিন্তু দরজার ফ্রেমে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মালতী। বড় বড় দুই চোখ মেলে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

যাদবপুর ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে ; সমস্ত শরীরে অসীম ক্লান্তি মাখা। নিজের ঘরখানিতে ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিভৃত নির্বিঘ্ন বিশ্রাম বুঝি আজ আমার কপালে নেই। বাইরে থেকে বিমল ডাকল, 'চিরঞ্জীব—চিরঞ্জীব—'

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। বললাম, 'আসুন—আসুন—'

বিমল ঘরে ঢুকে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। বলল, 'তুমি নাকি পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ। আপনাকে কে বলল ?'

'মঙ্গল বলেছে। কিন্তু—'

'কী ?'

আমার মনে হয় তুমি খুব ভুল করছ। 'পাকিস্তানে আর নাই বা ফিরলে।'

বাবার চিঠির কথা উল্লেখ করে বললাম, 'দেশের অবস্থা এখন ভাল হয়ে গেছে। এখন আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

বিমল বলল, 'ও দেশকে বিশ্বাস নেই, বুঝলে ভাই। তুমি এক কাজ কর।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

বিমল বলতে লাগল, 'অলকাদির চাকরিটা নিয়ে মামা-মামীদের এখানে নিয়ে এসো। তাতে ভাল হবে।'

এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর উজানী টান যেন অনুভব করছি। অনেক দূরের আমতলি গ্রামটা আমাকে অবিরত হাতছানি দিয়ে চলেছে। এখন বিমলের কথাগুলো ভাল লাগার কথা নয়। জানালাম, 'দেশে আমি যাবই।'

বিমল আর বিশেষ কিছু বলল না। একটু পরে চলে গেল।

বিমল চলে যাবার খানিকটা পর এল রিণ্টু। সেও আমার চলে যাবার খবর পেয়েছে।

রিণ্টু বলল, 'আপনি ছিলেন, আমার কোন ভাবনাই ছিল না। রাত্তিরবেলা যখন খুশি ফিরতে পারতাম। এখন কী যে হবে!'

আমি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে ভাল থাকব কি মন্দ থাকব, সে জন্য আদৌ কোন দুশ্চিন্তা নেই রিণ্টুর। অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরায় তার অসুবিধে হবে, সেই ভাবনাতেই সে অস্থির।

যাই হোক সকৌতুকে বললাম, 'কেন, মঙ্গল তো আছে?'

'মঙ্গলদাটা এক নম্বরের ত্যাঁদোড়, মহা খলিফা। সহজে দরজা খুলে দিতে চায় না। তাছাড়া—'

'কী?'

'বাবাকে বলে দেবার ভয় দেখায়।'

হেসে ফেললাম, 'তা এক কাজ কর না—'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল রিণ্টু, 'কী?'

'অত রাত্তির না করে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো—'

রিণ্টু বলল, 'আমার কত রকম এনগেজমেণ্ট থাকে; সে-সব সেরে তাড়াতাড়ি কি ফেরা যায়? তা ছাড়া আরেকটা ব্যাপার, আপনি ভেবে দেখুন চিরঞ্জীবদা—'

'কী?'

'আমি এখন বড় হয়েছি না?'

'নিশ্চয়ই।'

'অথচ ওল্ডম্যান তা মানতেই চায় না। টাইম ঠিক করে দিয়েছে। তার এক সেকেণ্ড বেশি বাইরে থাকার উপায় নেই।'

ওল্ড ম্যান কে, জানি। আমার উত্তর দেবার কিছু ছিল না। কাজেই চুপ করে থাকলাম।

আরো খানিকক্ষণ বকবক করে রিণ্টু চলে গেল।

পঁচিশ

পরের দিন সকালবেলা দেশে রওনা হলাম। গাড়ির সময় জানা ছিল, শিয়ালদা থেকে আটটা কুড়িতে ইস্টবেঙ্গল মেল ছাড়বে।

আসার সময় নারায়ণগঞ্জের জেটিঘাটে হাজার হাজার মানুষকে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে দেখেছিলাম ; তারপর দশটা স্টীমারের যাত্রীকে একটা স্টীমারে তুলে গোয়ালন্দ মেল আমাদের নিয়ে রওনা হয়েছিল।

শিয়ালদা স্টেশনে কিন্তু ভিড় নেই, সেই অস্থির ব্যাকুল জনতা নেই ; সেই ভয়ার্ত বিহ্বলতা নেই।

সবসুদ্ধ শ'খানেক যাত্রী হবে কিনা সন্দেহ। কামরায় কামরায় আমাদের তুলে নিয়ে কাঁটায় কাঁটায় আটটা কুড়িতে ইস্টবেঙ্গল মেল ছেড়ে ছিল।

দুপুরের একটু পর সীমান্তে পৌঁছে গেলাম। এপারের বর্ডার পুলিস কামরায় কামরায় একবার করে উঁকি দিয়ে কর্তব্য শেষ করে ফেলল। অথচ মাসখানেক আগে যখন পাকিস্তান থেকে ইণ্ডিয়ায় আসি, ওপারের বর্ডার পুলিস তল্লাসীর নামে ঘণ্টাকয়েক তাণ্ডব চালিয়েছিল।

যাই হোক, মিনিট পনেরোর ভেতর এপারের তল্লাসী চুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল মেল আবার সচল হল।

ওপার থেকে যখন এসেছিলাম তখন গাড়িটাকে বেওয়ারিশ চিঠির মত যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। ইচ্ছে হত তো ইস্টবেঙ্গল মেল একটু নড়ত, পরক্ষণেই নিশ্চল হয়ে যেত। মনে হয় নি, কোনদিন গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব। আমাদের উদ্বেগ আকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ভয়-ব্যাকুলতা-উৎকণ্ঠায় সব একাকার হয়ে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল।

অবশেষে দেড় দিনের পথ চারদিনে পাড়ি দিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলাম। কিন্তু কলকাতা থেকে পূর্ববাংলায় ফেরার অভিজ্ঞতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল দিয়ে ইস্টবেঙ্গল মেল এখন ছুটছে।

এক মিনিট আগেও না, এক মিনিট পরেও না, টাইম টেবিলের সময় অনুযায়ী গোয়ালন্দ এলাম। গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে তাজপুর। সেখান থেকে মাইল তিনেক হেঁটে গেলে আমাদের গ্রাম আমতলি।

আসতে আসতে আমার মনে হয়েছে, একটা কঠিন অমোঘ নিয়ম ট্রেন আর স্টীমারকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেলে তাদের বুঝি রক্ষা নেই। অথচ কলকাতায় যাবার সময় এই নিয়মের, এই শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র ছিল না। পূর্ববাংলা থেকে সাতপুরুষের বাস তুলে যে ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠী প্রাণে বাঁচবার জন্য ইণ্ডিয়ার দিকে পাড়ি দিয়েছে তাদের জন্য শুধু নিষ্ঠুর নিদারুণ অবহেলা, হৃদয়হীন উদাসীনতা।

যাই হোক বিকেলবেলা লঞ্চ থেকে তাজপুর নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল; তাড়াহুড়োয় একদম ভুলে গেছি। টেলিগ্রাম করলে বাবা নিশ্চয়ই লঞ্চঘাটায় এসে আমার জন্য অপেক্ষা করতেন।

তিন মাইলের এই রাস্তাটা জেলা বোর্ডের। এ পথ আমার আজন্মের চেনা। দুধারে রবিশস্যের খেত। অবাধ দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর চোখ যায়, মাঠ আর মাঠ। শীতের মাঝামাঝি এই সময়টায় ফলেছে পায়রা মটর, খেসারি, কলাই আর মুগ। এখন সবই কাঁচা; শ্যামল লাবণ্যে চারদিক ভরপুর হয়ে আছে। রবিফসল পাকবে সেই ফাল্গুন-চৈত্রে। তখন মাঠের চেহারা এমন সবুজ থাকবে না, ধূসর হয়ে যাবে।

রাস্তার ঠিক নীচেই নয়ানজুলি। বর্ষায় মাঠ-ঘাটের সঙ্গে নয়ানজুলিও জলে পূর্ণ হয়ে যায়। এখন কিন্তু কোথাও জল নেই। এই শীতে নয়ানজুলিতে জলসেচি শাক আর বুনো কচুর অরণ্য।

রবিফসলের ক্ষেতে পাখি উড়ছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। মোহনচূড়া, চড়ুই, শালিক, বনটিয়া। এই পাখিদের, জলসেচি শাক আর বুনো কচুদের কতকাল যেন দেখি নি।

মোটে একটা মাস কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। তবু মনে হয়, মুগ-মটর মুসুর-কড়াই আর পায়রার সুগন্ধে ভরপুর পূর্ববাংলা থেকে যুগ যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। বহুদূরের কোন পরবাসে দীর্ঘ নির্বাসনের পর আবার নিজ ভূমে ফিরে এসেছি।

বাবার চিঠি পাবার পরই দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। এই মুহূর্তে পূর্ববাংলার হাওয়া সারা গায়ে মেখে তার মাটির ওপর দিয়ে চলতে চলতে মনে হল, এদেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি বাঁচব না।

লঞ্চ থেকে যখন নামি তখনও রোদ ছিল। শীতের শেষ বেলায় রোদ এমনিতেই কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ। লাটাইতে সুতো জড়াবার মত করে কেউ যেন

দ্রুত অবেলার রোদটুকু গুটিয়ে নিতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিক মলিন হয়ে গেল।

জেলা বোর্ডের এই রাস্তাটা আজ খুব নির্জন। কদাচিৎ এক-অধটা লোক চোখে পড়ছে। তাও অচেনা লোক। আমতলির হলে নিশ্চয়ই চিনতে পারতাম। নিজের গ্রামের মানুষকে দেখার জন্য এই মুহূর্তে আমার প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে আশেপাশে হাট নেই। মীরকাদিমের হাট শুক্রবার, দীঘির পাড়ে হাট বসে সোমবার। আজ হাটবার হলে রাস্তার চেহারা এরকম থাকত না; দুপুরের পর থেকেই হাট-ফিরতি মানুষে সরগরম হয়ে উঠত।

তিন মাইল রাস্তার অর্ধেকেরও বেশি পেরিয়ে এসেছি। গ্রামের কাছাকাছি এসে মনে হচ্ছে কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছুব। আমি বড় বড় পা ফেলতে লাগলাম।

আমতলির মুখে আসতে হারাণ সাহার সঙ্গে দেখা। ততক্ষণে সন্ধ্যে নেমে এসেছে। ঝোপঝাপে রবিফসলের খেতে জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। কোথায় একপাল শিয়াল ডেকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো কুকুরের চিৎকার তাদের তাড়া করে নিয়ে গেল যেন।

হারাণ সাহা এই গ্রামেরই বাসিন্দা। বয়েস হয়েছে অনেক। জমিজিরাত প্রচুর; প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কানির মত। বছরে দুবার ধান, একবার পাট, চৈত্রে মুগ-মুসুর, তা ছাড়া আনাজপাতি—সব মিলিয়ে তার সচ্ছল অবস্থা। সংসারে মানুষজনও তার অনেক। তিন ছেলে, চার মেয়ে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনা ইত্যাদি।

চোখের কাছে হাত এনে হারাণ সাহা ঠাহর করে নিল। তারপর বলল, 'ক্যাঠা (কে)?'

বললাম, 'আমি।'

'আমি ক্যাঠা (কে)?' বলতে বলতে আরেকটু কাছে এগিয়ে এল হারাণ সাহা, 'মহিন্দবাবুর পোলা (ছেলে) না? আমাগো বিলু?'

আমার ডাকনাম বিলু, বাবার নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তুমি না কইলকাতা গেছিলা?'

'হ্যাঁ। আজ ফিরে এলাম।'

আমার এক হাতে স্যুটকেস ঝোলানো ছিল, আরেক হাতে শতরঞ্জি-

জড়ানো বিছানা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেখে নিয়ে হারাণ সাহা বলল, 'এই মাত্তর ফিরলা নাকি?'

'হ্যাঁ—' আমি মাথা নাড়লাম।

হারাণ সাহা এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'শুনছি কইলকাতা থনে (থেকে) আইতে ছ্যাড় দিন দুই দিন লাগে। টেরেনে (ট্রেনে) ইষ্টিমারে হয়রান হইয়া আইছ। লও, লও, বাড়িতে লও (চল চল, বাড়ি চল)।'

আমি সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। হারাণ সাহা সঙ্গ ছাড়ল না, পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মনে হল, আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে সে। যেতে যেতে বলল, 'তারপর বিলু—'

'বলুন!'

'কইলকাতার সম্বাদ কও!'

'আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন তো?'

'হ।'

'কলকাতার কথা আমাদের বাড়ি গিয়ে শুনবেন। মা-বাবার কাছে তো বলতেই হবে। আপনি দেশের খবর বলুন।'

'দ্যাশের খবর খুব ভাল।' পরম তৃপ্তির সঙ্গে হারাণ সাহা বলতে লাগল, 'পাকিস্তান হওয়ার পর এত ভাল আর দেখি নাই। আমরা হিন্দু-মুসলমান বড় মিলমিশ কইরা আছি। বুঝলা বিলু, পাকিস্তান হওয়ার আগে সেই সোন্দর দিনগুলা আবার য্যান (যেন) ফিরা আইছে। মইধ্যখানে (মাঝখানে) কয়টা বছর কী ঝঞ্ঝাটই না গেল।'

বাবার চিঠিতেও দেশের শুভ পরিবর্তনের কথা আছে। সাধারণ মানুষও যে তা অনুভব করতে পেরেছে তাতে মনে মনে আরাম বোধ করলাম।

হারাণ সাহা আবার বলল, 'শুদাশুদিই তুমি কইলকাতা গেলা বিলু। ভাশ সেই ভালই হইল, মইধ্য থিকা (মাছখান থেকে) তুমি কষ্ট করলা।'

কেন আমি কলকাতায় গেছি, সে কথা কারো জানতে বাকি নেই। বললাম, 'তা যা বলেছেন হারাণ জেঠা—'

আরো খানিকটা যাবার পর জহরুল আর সিরাজের সঙ্গে দেখা। ওরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু। দেখামাত্রই দুজনে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'আইছস বিলু—'

তাদের কণ্ঠস্বর এবং আলিঙ্গনে এমন কিছু ছিল যাতে অভিভূত হয়ে গেলাম। বুকের অতল থেকে আবেগের ঢেউ যেন উথলে গলার কাছে উঠতে

আসতে লাগল। কাঁপা অস্ফুট গলায় বললাম, 'হ্যাঁ রে—'

'আরে আহাম্মক, এই কথাখান তুই বুঝলি না ?'

'কী ?'

'এক সংসারে থাকলেও ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি হয়। দুইটা দিন সবুর করলি না, গোসা কইরা কইলকাতায় গেলি গা।'

'গোসা করে না রে—'

'তয় (তবে) কী ?'

কলকাতায় যাবার পেছনে কারণটা যে কী, তা আর এই মুহূর্তে বলা গেল না। আমি চুপ করে থাকলাম।

জহরুল বলল, 'আসলে ক্যান গেছিলি, জানি।'

নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, 'কেন ?'

'আমাগো তরা (তোরা) বিশ্বাস করতে পারস নাই। ভাবছিলি—'

রাস্তায় আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যেমন আচার্য-বাড়ির দুই ভাই প্রাণবল্লভ, যুগী-বাড়ির কানাই, মৃধা-বাড়ির কেরামত, নাজিরদের দুই ছেলে ওসমান আর হাসেম। এমনি অনেক। তারা সবাই সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

সারা গ্রাম আমার জন্য যে এমন দু'হাত বাড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে, কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় স্বপ্নেও ভাবি নি।

চলতে চলতে ওসমান, কেরামত, হাসেম অভিমানের সুরে, অনুযোগের সুরে কত কথা যে বলতে লাগল। কেন কলকাতায় গেলাম, কেন তাদের ওপর ভরসা রাখতে পারলাম না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের বাড়িটা আমতলির দক্ষিণ সীমায়। সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। ঝোপঝাড়ের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। মুত্রাবনের গভীর থেকে ঝিঁঝিঁদের একটানা বিলাপ ভেসে আসছে।

উঠোনে পা দিয়েই চিৎকার করে ডাকলাম, 'মা—মা, সবিতা—সবিতা—বাবা—'

তক্ষুনি এ-ঘর থেকে ও-ঘর থেকে দু-তিনখানা হেরিকেন বেরিয়ে এল। বাবা-মা-সবিতা তো এলই। তাদের পেছনে পেছনে রাজেককাকা ছুটে এলেন। রাজেককাকা আমাদের বাড়িতেই ছিলেন তা হলে! আমাদের বাড়িতে যে দুটো কামলা থাকে, তারাও বেরিয়ে এসেছে।

নিমেষে ছুটোছুটি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। মা আমার হাত ধরে বারান্দায়

নিয়ে গেলেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'এসেছিস বাবা,এসেছিস! ভাল ছিলি তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ মা।'

জীবনে এই প্রথম মা-বাবা ঘর-সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আমার থাকা। তা-ও এক-আধ দিনের জন্য না, পুরো একটি মাসের জন্য। কাছে-পিঠে হলেও কথা ছিল। তা তো নয়। চোখের আড়ালে বহু দূরের এক অচেনা শহরে গিয়ে কাটিয়ে এসেছি।

মা আমার পিঠে-মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন। এক মাস আমাকে ছাখেন নি; তাঁর বুকের ভেতর কতখানি ব্যাকুলতা জমেছিল তা যেন স্পর্শ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

এতদিন পর আমাকে পেয়ে বাবা কিন্তু কর্তব্য ভোলেন নি। কামলাদের দিয়ে জলচৌকি আর শতরঞ্জি পাতিয়ে হারাণ সাহাদের বারান্দায় বসালেন।

রাজেককাকা এতক্ষণ কথা বলেন নি। এবার বললেন, 'কইলকাতা থনে কবে রওনা দিছস?'

বললাম, 'কাল।'

'পথে কুনো অসুবিধা হয় নাই?'

'না।'

'সেইদিনই তরে (তোকে) কইছিলাম, যাইস না। আমার কথা তরা (তোরা) কেউ শুনলি না। না তুই, না তর বাপে, না, মা। মইধ্য থিকা কত কষ্ট না জানি পাইয়া আলি (এলি) ধন।'

বললাম, 'না, কষ্ট আর কি!'

ওদিকে হারাণ সাহারা উদগ্রীব হয়ে ছিল। বলল, 'কইলকাতার সম্বাদ (সংবাদ) কও বিলু।'

জহরুল, ওসমান, হাসেম—সবাই সমস্বরে সায় দিল, 'হ-হ, কইলকাতার কী দেখলি, কী শুনলি, ক' (বল) বিলু—'

রাজেককাকা ওদের ধমক দিয়ে উঠলেন, 'হ, অখন কইলকাতার কথা কইতে বসুক। তোগো (তোদের) আক্কলটা কী? ছ্যামরা (ছেলেটা) দুইদিন না-খাওয়া না-দাওয়া; কই হাতমুখ ধুইয়া দুইটা মুখে দিব, তা না, কইলকাতার প্যাচাল (গল্প) লইয়া বস। আইজ না, কাইল আইসা কইলকাতার কথা শুইনা যাইস।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'যা বিলু, হাতমুখ ধুইতে যা।'

বাবা এই সময় বলে উঠলেন, 'না-না, ওরা অত আশা নিয়ে এসেছে। কলকাতার কথা বলবে বৈকি বিলু।' জহরুলদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা

একটু বোস, ও খেয়ে নিক।'

দু'দিন স্নান করি নি ; পুকুরে নেমে গোটাকয়েক ডুব দিতে পারলে ক্লান্তি অনেকখানি কেটে যেত। কিন্তু এই শীতের রাতে মা কিছুতেই স্নান করতে দিলেন না। অগত্যা হাতমুখ ধুয়ে, ভিজে গামছায় গা মুছে জামাকাপড় ছেড়ে ফেললাম।

বাবা বললেন, 'এই বারান্দাতেই বিলুকে খেতে দাও। খেতে খেতে কথা হবে।'

সবিতা এসে আসন পেতে দিয়ে গেল। আমি বসলে মা ভাত-টাত নিয়ে এলেন।

রাজেককাকা বললেন, 'তুই যে আইজ আসবি, ভাবতেও পারি নাই। আগে একখান চিঠিপত্তর তো দিতে হয়।'

বাবারও এতক্ষণ কথাটা মনে হয় নি। রাজেককাকা ধরিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমাকে একটা টেলিগ্রাম করলি না কেন ? আমরা নারায়ণগঞ্জে যেতে পারতাম।'

কেন টেলিগ্রাম করতে পারি নি, বললাম।

বাবা ইতিমধ্যে তামাকের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। হুঁকো টানতে টানতে হারাণ সাহা বলল, 'রাইত বাইড়া যাইতে আছে ; শীতের রাইত। আমি বুড়া মানুষ অনেকখানি পথ যাইতে হইব।'

'ইঙ্গিতটা বোঝা গেল। হেসে রাজেককাকা বললেন, 'ক' (বল) রে বিলু, কইলকাতার সম্বাদ ক'। না শুইনা সা' মশাই উঠব না।'

এখান থেকে যাবার পর যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছিল ; কলকাতায় গিয়ে যা-যা দেখেছি—সমস্ত বললাম।

শুনতে শুনতে হারাণ সাহার তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যথিত বিস্ময়ে সে বলল, 'এত মানুষ সাতপুরুষের ভিটামাটি ছাইড়া কইলকাতায় গেছে !'

'হ্যাঁ।'

'তারা আছে কই ?'

'পথে-ঘাটে, রেলের স্টেশনে, রিফিউজি ক্যাম্পে আর জবরদখল কলোনিতে।'

'কোলোনিটা আবার কি ?'

কলকাতার চারধারে উদ্বাস্তু উপনিবেশ আমার দেখা ছিল। তাদের হুবহু বর্ণনা দিলাম।

হারাণ সাহা বলল, 'অদিষ্ট, সকলই অদিষ্ট।' তার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত

শোনাতে লাগল।

ওসমান, জহরুল, হাসেম কেউ কথা বলছিল না। হেরিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় তাদের স্থিরমূর্তির মত মনে হচ্ছিল।

রাজেককাকা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বিপুল ঢেউয়ের মত উঠে এল। আস্তে করে ডাকলেন, 'বিলু—'

খেতে খেতে তাকালাম।

রাজেককাকা বললেন, 'আমাগো এই অমতলি থনেও (থেকেও) তো কম মানুষ কইলকাতায় যায় নাই। কামারপাড়া যুগীপাড়া গোসাইপাড়া সাফ হইয়া গেছে গা। তাগো কারো লগে দেখা হইছে?'

'না।'

'কারো লগেই না?'

'না।'

'দেখা করলেই পারতি। দেখা করাটা উচিত আছিল—ত্থাশের মানুষ—'

আমি হাসলাম, 'কলকাতা কি একটুখানি শহর রাজেককাকা! কোথায় খুঁজব তাদের?'

'কইলকাতা বুঝি আলিসান শহর?'

'হ্যা।'

'কত বড় হইব? আমাগো মুন্সিগুঞ্জ নারায়ণগুঞ্জর সমান?'

'পঞ্চাশ-একশ'টা মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ জোড়া লাগালে একটা কলকাতা হতে পারে।'

রাজেককাকা অবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'ক'স (বলিস) কী বিলু!"

উত্তর না দিয়ে হাসলাম।

একটু চুপ করে থেকে রাজেককাকা বললেন, 'গেরাম আন্ধার কইরা সগলে গেল গা। চাইর দিক খা-খা করে। যারা গেছে তাগো ঠিকানা যদি জানতাম, চিঠি লেখতাম। তারা সগলে ফিরা আসুক; আবার আগের লাখান (মত) মিলমিশ কইরা থাকি।'

কেউ কিছু বলল না। মনে হল, রাজেককাকার কথাগুলোই সবার প্রাণের গভীরে ঝঙ্কার তুলে যাচ্ছে।।

অনেক রাত্রে হারাণ সাহাদের নিয়ে রাজেককাকা চলে গেলেন

ছাব্বিশ

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের বাড়ি মেলা বসে গেল। আমি যে কাল সন্ধ্যেবেলা কলকাতা থেকে ফিরে এসেছি, এ খবরটা রাতারাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সম্ভব কাল রাত্তিরে আমাদের বাড়ি যারা এসেছিল তারাই এ খবর রটিয়ে থাকবে।

আমাদের এই ছোট্ট আমতলি গ্রামখানা থেকেই না, আশেপাশে গ্রাম-গঞ্জ-গুলো থেকেও অনেক মানুষ আসতে লাগল। কলকাতা সম্বন্ধে তাদের অপার কৌতূহল ; গ্রাম ছেড়ে যারা চলে গেছে তাদের সম্পর্কে অপরিসীম দুর্ভাবনা।

এই লোকগুলো আমার আজন্মের চেনা। কারোকে আমি কাকা বলি, কারোকে জেঠা, কারোকে মামা। চিরদিন তারাও আমাকে দেখে আসছে। এই জলবাংলার ধুলোবালি গায়ে মেখে, এখানকার বাতাস বুকে টেনে তাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছি। কিন্তু মাসখানেকের মত কলকাতায় কাটিয়ে আসার পর তারা এখন বিচিত্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি যেন অপরিচিত কোন গ্রহ থেকে বিস্ময়কর কোন সংবাদ বয়ে এনেছি।

লোকগুলো উদ্বেগের স্বরে নানা প্রশ্ন করে যায়।

'কইলকাতা শহরখান কেমুন দেখলা ?'

'যারা গেরাম ছাইড়া গেছে তারা নি ভাল আছে ? তারা থাকে কুনখানে ? ঘরবাড়ি বানাইতে পারছে ? খায় কী ? রুজিরুজিগারের ব্যবস্থা কিছু হইছে তাগো ?'

'আমাগো টঙ্গিবাড়ি গেরামের গোসাইদাস নাথের লগে দেখা হইছে ? পোলামাইয়া লইয়া (ছেলেমেয়ে নিয়ে) তারা বারো জন। নাথ মশয় তো কামকাইজের বাইর (অকর্মণ্য) হইয়া গেছে। তারা কই উঠছে জানো ?'

দশ-বারোদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় পেলাম না। প্রায় সমস্ত দিনই প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হল।

ধীরে ধীরে আমার সম্বন্ধে লোকের বিস্ময় স্তিমিত হয়ে এল। সারাদিনের সেই ভিড়টা ক্রমশ হাল্কা হয়ে আসতে লাগল।

কলকাতা থেকে ফেরার মাসখানেক পর একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে

উঠলে বাবা বললেন, 'এবার কী করবি বিলু ?'

আমি বললাম, 'তুমি যা করতে বল—'

'দেশের অবস্থা বেশ ভালই হয়ে গেছে। আর গোলমাল হবে বলে তো মনে হয় না।'

'হ্যাঁ।'

'গ্রাম ছেড়ে আর যাবারও দরকার নেই।'

'না।'

'ভাবছি এবার তোর জন্যে সেই ব্যবস্থাটা করে ফেলব।'

'কোন্‌টা ?' আমি উন্মুখ হলাম।

বাবা বললেন, 'কলকাতায় ক'দিন থেকে এসেই সব ভুলে গেলি !'

এবার মনে পড়ে গেল, তুমি কি সোনারঙ স্কুলে মাস্টারির কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ।' বাবা বলতে লাগলেন, 'তুই রাজী থাকলে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলি।'

'কর।'

মা কাছেই ছিলেন। রোদে পিঠ দিয়ে এই সকালবেলায় বড়ি দিতে বসেছেন।

দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে। এই সবে ছেলেটা কলকাতা থেকে এল। ক'দিন জিরিয়ে নিক। তারপর যা করার করবে।'

হেসে বললাম, 'আমি কবে ফিরেছি বল তো মা—'

মা বললেন, 'এই তো সেদিন।'

'উহুঁ। পুরো একটি মাস। আর এই এক মাস ধরে বিশ্রাম করছি। শুধু শুধু বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'তবে যা ইচ্ছে কর।' মা হাল ছেড়ে দিলেন।

দিনকয়েক পর সোনারঙ স্কুলে আমার চাকরি হয়ে গেল।

সাতাশ

দেশে ফেরার পর কলকাতা আমার কাছে ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। এমনিতেই কলকাতা দূরের শহর। ভৌগোলিক দূরত্ব অবশ্য খুব বেশি না; তিন শো মাইলের মত। কিন্তু যে ভুবনে আমার বাস, যে তারে আমার জীবন বাঁধা, তার কাছে কলকাতা এক অচেনা মহাদেশ। কলকাতার সব কিছুই

আমার চোখে বিস্ময়কর, অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য।

যাই হোক, আমতলির আকাশ-বাতাস, গাছপালা, স্নিগ্ধ বনভূমি, ফসলের মাঠ, জলপূর্ণ নদী, শালিক-ঘুঘু-মোহনচূড়া পাখির ঝাঁক, ঝিল্লিস্বর, বাবা-মা-সবিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের মত মানুষগুলো—সব একাকার হয়ে দূরের কলকাতাকে আরো আরো অনেকদূরে সরিয়ে দিতে লাগল।

একেক সময় আমার সংশয় হয়, সত্যিই কি কখনও কলকাতায় গিয়েছিলাম। পিসেমশাই, অমল-বিমল-রিন্টু, অলকাদি, হিরণ্ময় সোম, সুরেশদা কিংবা বিশাখা—কোনদিন কি এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, না বিচিত্র কোন স্বর্গের ভেতর তাদের বিচরণ করতে দেখেছি ?

কলকাতা ক্রমশ ধূসর, অস্পষ্ট হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সবাইকেই ভুলে যেতে লাগলাম। পারলাম না শুধু দু'জনকে—অমল আর মালতীকে। আরেক জনও নিজেকে ভুলতে দিলেন না—তিনি হিরণ্ময় সোম।

মাঝে মাঝে অমলকে চিঠি লিখি। মালতীকে তো আর সোজাসুজি লেখা যায় না ; তাই শিশির মুখুটিকে লিখতে হয়। আর হিরণ্ময় সোম নিজেই উপযাচক হয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে যান। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অবস্থা এখন কেমন, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কিরকম দাঁড়িয়েছে, সংখ্যালঘুরা নিরাপদে বসবাস করতে পারছে কিনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চালাতে পারছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ উত্তর পাঠাতে হয়। খুব সম্ভব উদ্বাস্তু জীবনের পশ্চাৎপট রচনার জন্য তিনি রসদ সংগ্রহ করে যাচ্ছেন।

চিঠি পেলেই অমল উত্তর দেয়। এখনও টালিগঞ্জের সেই বস্তিটা তার ঠিকানা। সেখানে থেকেই ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করে চলেছে সে। শ্রমিকের হিতে, শ্রমিকের কল্যাণে অমলের জীবন উৎসর্গ-করা।

প্রথম প্রথম চিঠি লিখতে শিশির মুখুটি উত্তর দিতেন। এখনও কাজটাজ কিছু জুটিয়ে উঠতে পারেন নি, রিহ্যাবিলিটেশনের লোনও পান নি। বাগবাজারে ভায়রার বাড়িতে এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে বোঝার মত চেপে আছেন।

একদিন কলকাতার একখানা চিঠি পেয়ে আমি অবাক। অমল, হিরণ্ময় সোম কিংবা শিশির মুখুটির হাতের লেখা আমার চেনা। কিন্তু গোল গোল মেয়েলী ছাঁদের এ হস্তাক্ষর আগে কখনও দেখি নি। কে এ চিঠি লিখতে পারে ? আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেও ভেবে পেলাম না। তারপর হঠাৎ তলার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, 'ইতি'র পর মালতীর নাম লেখা রয়েছে।

মালতী আমাকে চিঠি লিখতে পারে, এ ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। যা কোনদিন ভাবি নি, আশা করি নি, তাই যদি ঘটে যায়—বিহ্বল হতবাক হয়ে যাবার কথা। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে পড়তে শুরু করলাম।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, দিন কয়েক আগে আপনার চিঠি এসেছে। অন্য সব বার আপনার চিঠি এলে বাবাই উত্তর দেন। এবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকেই উত্তর দিতে বলেছেন।

'আমাদের অবস্থা সেই একই রকম। দেশ থেকে যে সোনাদানাটুকু আর টাকা এনেছিলাম তার প্রায় সবটাই তো বর্ডারে রেখে দিয়েছে। বাকি যেটুকু নিয়ে কলকাতায় পৌছতে পেরেছিলাম তা কবেই শেষ হয়ে গেছে। একেবারে অসহায় অবস্থায় মেসোমশাইয়ের কাছে আছি।

'মেসোমশাই মানুষটা অত্যন্ত সজ্জন, স্নেহপ্রবণ, মমতাময়। আমাদের সব দায়দায়িত্ব তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন। আপনি এ খবর সবই জানেন। দু'চার দিন বা দু'চার মাসের ব্যাপার হলে কথা ছিল না। কিন্তু চিরকাল কী করে যে এভাবে চলবে?

'অকল্যাণে ঘুরে ঘুরে বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কিন্তু কোনরকম সুরাহাই হচ্ছে না। বাবা একেক সময় ঠিক করে ফেলেন, দেশেই ফিরে যাবেন। দেশের অবস্থা তো এখন বেশ ভালই। পরক্ষণেই সিদ্ধান্তটা নাকচ করে দেন। দেশে কোথায় ফিরবেন? জমিজমা বাড়িঘর বেচে, চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন। দেশে ফিরলে আমাদের নিয়ে কোথায় থাকবেন? কী খাবেন? সংসারই বা কিভাবে চলবে?

'সে যাই হোক, আপনার কথা বাবা খুব বলেন। অল্পদিনের পরিচয়; তবু আপনাকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেছে। বলেন, "চিরঞ্জীব থাকলে আমি জোর পেতাম"।

'আমরা দেশও হারালাম, এখানে এসে পায়ের তলায় মাটিও পেলাম না। গলগ্রহের মত অন্যের করুণার ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হচ্ছে। এভাবে বাঁচা যে কতখানি দুঃসহ, কত গ্লানিকর—সে শুধু আমরাই বুঝি।

'আমাদের কথা থাক। বাবা বলেন, কোন চিঠিতেই আপনি নিজের কথা তেমন লেখেন না। আপনার কথা বাবার খুব জানতে ইচ্ছে করে, দেশের কথা জানতে ইচ্ছে করে। পরের চিঠিতে নিজের খবর আর দেশের খবর বেশি করে লিখবেন।

'আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন। ইতি—মালতী।'

সংক্ষিপ্ত চিঠি। একরকম বাবার জবানীতেই লিখেছে। তবু মনে হল, আমার কথা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে মালতী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা যতবার ভাবলাম, বুকের ভেতর শিহরণের মত কি যেন খেলে যেতে লাগল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসেই আছি। পৌষ মাসের এক শীতল সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সীমান্তে 'রিফিউজি স্পেশালে'র প্রায়ান্ধকার কামরায় মালতীকে প্রথম দেখেছিলাম। তারপর বাগবাজারের সেই একতলা বাড়িটায় আরো কয়েকবার দেখেছি। দেশে ফিরে অ.সবার আগে শিশির মুখুটির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখাটেখা করে য'ন চলে আসি, শিশির মুখুটি আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য রাস্তা পর্যন্ত এসেছিলেন। মালতীও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল; সে অবশ্য রাস্তায় নামে নি। সদর দরজার ফ্রেমের ভেতর চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে আমার সেই শেষ দেখা।

ট্রেনের কামরায় কিংবা মায়ের আত্মহত্যার সময় অথবা শ্রাদ্ধের আসরে—যতবার তাকে দেখেছি ততবারই সে বিষাদময়ী, নয়তো কাঁদছিল। মালতীর হাসিখুশি উচ্ছ্বসিত রূপ কখনও আমি দেখি নি।

* * *

এরপর থেকে মালতীই আমাকে চিঠি লিখতে লাগল। বাবার জবানীতে না, সোজাসুজি নিজের জবানীতে। আমিও শিশির মুখুটির বদলে আজকাল তার নামেই চিঠি পাঠাই।

মালতীর প্রতিটি চিঠির বক্তব্যই প্রায় এক। এখনও কিছু হয় নি; জীবন-ধারণের কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। বাকি জীবনটা হয়তো অন্যের করুণায় বাঁচতে হবে।

যত দিন যেতে লাগল, মালতীর চিঠিগুলোতে ততই নৈরাশ্যের সুর বাজতে লাগল। এই জগতের ওপর সে যেন ক্রমশ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। কোন চিঠিতে সে জানায়, 'বাবার শরীর এমন ভেঙে পড়েছে যে দেখলে আর চিনতে পারবেন না। একেবারে কঙ্কালসার। গায়ের অমন রঙ পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে উঠেছে। চোখ ভেতরে বসে গেছে। কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে। হাড়ের ওপর পাতলা কোঁচকানো চামড়া জড়িয়ে দিলে যেমন হয়, বাবাও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছেন। উৎসাহ উদ্যম বলতে বাবার কিছুই অবশিষ্ট নেই—সব নষ্ট হয়ে গেছে। বার বার বিমুখ হয়ে, বার বার হতাশ হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে আজকাল তিনি আর ঘরের বার হতে চান না। ঘরের ভেতর বসে দিনরাত ভাবেন; লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেনও। আমি যে কী করব!'

কোন চিঠিতে মালতী লেখে, 'আমার ভাই দুটোকে তো দেখেছেন ? নীপু আর হীরু ? দেশে থাকতে ওরা কত ভাল ছিল, কত বাধ্য ছিল। লেখাপড়ায় বরাবর চমৎকার রেজাল্ট করত; ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠত। কলকাতায় এসে ওরা কী হয়ে গেল! এত অবাধ্য, এত অসভ্য হয়ে উঠেছে যে ভাবাই যায় না। কথায় কথায় তর্ক করে; বাঁদরামো ইতরামো শিখেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে মাসিমার পয়সা চুরি করে। আমরা যে গলিটায় থাকি তার শেষ মাথায় একটা চায়ের দোকান দেখেছেন তো ? ওখানে বসে রাজ্যের বখাটে ছোকরাদের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা দেয়, মেয়েদের দেখলে সিটি মারে। আমার এত রাগ হয় যে, একেক সময় ভাবি ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব। পরক্ষণেই মনে হয়, ওদের কী দোষ! কলকাতায় আসবার পর স্কুলে পাঠানো হয় নি। একেই মেসোমশাইয়ের অভাবের সংসার। এতগুলো লোককে খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন। তার ওপর পড়াশোনার কথা বলতে সাহস হয় না। লেখাপড়া ছেড়ে নীপু-হীরু করে কী ? অসৎ সঙ্গে পড়ে ওরা শেষ হয়ে গেল। ওদের বাঁচবার কোন পথই খোলা নেই।'

আটাশ

কলকাতা থেকে ফেরার পর কয়েক মাস কেটে গেল। প্রথম দিকে অমল আর হিরণ্ময় সোমও চিঠি লিখতেন। ধীরে ধীরে কবে থেকে তাঁদের চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেছে, খেয়াল নেই। একা মালতীই এখন চিঠি লিখে চলেছে—প্রতি সপ্তাহে একখানা করে চিঠি।

এই ক'মাসে কলকাতা আমার স্মৃতি থেকে, আমার অনুভূতি থেকে, অনেক অনেক দূরে সরে গেছে। কোনদিন সেখানে আদৌ গিয়েছিলাম কিনা, মনে পড়ে না। কলকাতা কোনদিনই আমার আপন না। সুদূর অনাত্মীয় সেই দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে আজকাল মালতীর চিঠিগুলো। এ ছাড়া সব সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

একদিন দুপুরবেলা মুন্সিগঞ্জে নৌকো বাইচ দেখতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।

সন্ধ্যের পর কতক্ষণ আর কেটেছে কিন্তু এর মধ্যেই আমতলি গ্রাম একেবারে নিষুতিপুর। আমাদের বাড়ির সামনের দিকে মস্ত পুকুর। পুকুরপাড়ে সারি সারি সুপুরী আর বাতাবী লেবুর গাছ। তাদের মাথায় চন্দনের পাটার মত গোল একখানা চাঁদ উঠেছে।, চাঁদের আলোয় পুকুরের জল গলানো রুপো হয়ে গেছে যেন। বাড়ির পেছন দিকে বাঁশবন। সেখান থেকে ঝিঁঝিঁদের একটানা বিলাপ ভেসে আসছে।

উঠোনে পা দিয়েই ডাকলাম, 'সবিতা—সবিতা—'

সবিতা দক্ষিণের ঘর থেকে হেরিকেন হাতে বেরিয়ে এল। বললাম, 'একটা গামছা-টামছা দে তো; পুকুরঘাট থেকে একেবারে হাত-পা ধুয়েই আসি।'

হেরিকেন মাটিতে নামিয়ে সবিতা গামছা নিয়ে এল। তার হাত থেকে গামছাটা নিয়ে আমি পুকুরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাইরে থেকে এসে পুকুরে হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢোকা আমার চিরকালের অভ্যাস।

অন্য দিন আমার সঙ্গে পুকুরে যায় না সবিতা। আশ্চর্য, আজ কিন্তু হাতে হেরিকেন ঝুলিয়ে পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

একবার ভাবলাম, রাত্রি বলেই হয়তো আলো নিয়ে আমার সঙ্গে আসছে। বললাম, 'হেরিকেন আনতে হবে না। ফুটফুটে চাঁদের আলো আছে; সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তুই বাড়ি যা।'

সবিতা কিন্তু ফিরে গেল না। আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'বাবা রে বাবা, তাডাতে পারলে যেন বাঁচে! না হয় গেলামই তোমার সঙ্গে।'

হেসে ফেললাম, 'আচ্ছা আচ্ছা, আয়।'

সবিতা উত্তর দিল না।

এবার আমার মনে হল, নৌকো বাইচ সম্বন্ধে হয়তো উদগ্রীব হয়ে আছে সবিতা। আমার হাত-পা ধুয়ে আসা পর্যন্ত সবুরটুকু তার সইছে না। যাই হোক, এ ব্যাপারে সবিতা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমি বলতে লাগলাম, 'বাইচ খেলা আজ যা জমেছিল না সবি! তালতলা, কমলাঘাট, রসুনিয়া, বাসাইল, বেতকা আর ধলেশ্বরীর দূর-দূর চরগুলো থেকে পঞ্চাশটা দল এসেছিল। বাঘা বাঘা দল। শেষ পর্যন্ত কমলাঘাটের কলিমুদ্দিন মিঞা বাজি জিতে নিয়ে গেল। আঃ, তুই যদি যেতি সাবি! নদীর ধারে কাতারে কাতারে কত লোক যে ভিড় করেছিল! আর কী চিৎকার, হল্লা, ঢাকের বাজনা, শাঁখের আওয়াজ আর উলু! তুই অবাক হয়ে যেতি।'

অনেকক্ষণ বকবকানির পর হঠাৎ আমার হুঁশ হল, সবিতা কিছুই শুনছে না। শুধু আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে রহস্যময় হাসছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'হাসছিস যে ?'

সবিতা বলল, এমনি।'

'এমনি আবার কেউ হাসে নাকি ? মাথা-টাথা তোর খারাপ হয়ে গেল ?'

'উঁহু–

'তবে হাসছিস কেন ?'

সবিতা এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'যাও, হাত-পা ধুয়ে এস।'

সবিতার আজকের সমস্ত আচরণটাই বিচিত্র। কিছুক্ষণ পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে থেকে আমি পুকুরঘাটে নেমে গেলাম।

বাড়ি ফেরার সময় খুব আস্তে করে নীচু গলায় সবিতা ডাকল, 'দাদা—'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে খানিক অবাক, খানিক চকিত হয়ে তাকালাম, 'কী বলছিস ?'

'ভেবেছ, ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পাবে না !'

'তার মানে ?'

'হুঁ-হুঁ, আমরা সব ধরে ফেলেছি।'

সবিতার কথাগুলো আমার কাছে আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য—প্রায় হেঁয়ালির মত লাগছে। বললাম, 'কী ধরে ফেলেছিস ?'

সবিতার চোখের তারায়, ঠোঁটের ফাঁকে সেই আধোগোপন রহস্যময় হাসি। সে বলতে লাগল, 'তুমিই বল না কী ধরেছি—'

এবার বিরক্ত হয়ে উঠলাম, 'কী ধরেছিস, না বললে কেমন করে জানব ! আমি কি অন্তর্যামী ?'

'অন্তর্যামী নও !'

'তখন থেকে খালি ফাজলামো হচ্ছে।' রাগের গলায় বললাম, পরিষ্কার করে কিছু বলবে না ! এক চাঁটিতে মাথার ঘি নড়িয়ে দেব।'

কপট ভয়ের ভঙ্গি করে সবিতা বলল, 'ও বাবা, ছেলের কি রাগ !'

উত্তর দিলাম না।

একটু পর সবিতা আবার বলল, 'আচ্ছা দাদা, এবার কলকাতায় গিয়ে কত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল ?'

হঠাৎ এরকম একটা বেখাপ্পা প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিলাম না। একটু অবাক হয়েই বললাম, 'অনেক লোকের সঙ্গে।'

'তাদের নাম কী ?'

'নাম দিয়ে কী হবে!'

আদুরে গলায় সবিতা বলল, 'বলই না বাপু। জানতে ইচ্ছে করছে।'

সবিতা চিরদিনই ভারি খেয়ালী ধরনের। তার ছেলেমানুষীর শেষ নেই। বললাম, 'পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁর তিন ছেলে অমল-বিমল-রিন্টুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাদের বাড়ির চাকর মঙ্গলের সঙ্গে হয়েছে। হিরণ্ময় সোম, সুরেশদা, অলকাদি, বিশাখা—কত লোকের নাম বলব!'

'বল না, বল না—'

'শিশির মুখুটি, রাধামোহনবাবু—' নামের ফিরিস্তি দিয়ে যেতে লাগলাম।

সব শুনে সবিতা বলল, 'আর—'

'আর আবার কী ?'

'আর কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি ?'

'না।'

'ভালো করে ভেবে দেখ!'

সবিতার মাথায় সত্যিই পোকা নড়ে উঠেছে। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'কই আর কারো নাম মনে পড়ছে না।'

সবিতা বলল, 'সত্যি মনে পড়ছে না, না বলতে চাইছ না ? লজ্জার কী ; বলেই ফেল না বাপু ?'

রুক্ষ স্বরে বললাম, 'লজ্জার কী আছে! মনে না পড়লেও জোর করে বলতে হবে নাকি ?'

'আহা মনে যখন পড়ছে না তখন আমিই একটুখানি খেই ধরিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেক সপ্তায় কলকাতায় যাকে তাড়া তাড়া চিঠি লিখছ তার কথাটাই মনে পড়ছে না! পিসেমশাইয়ের বাড়ির চাকর, রাস্তার লোক—সবার নাম গড় গড় করে বলে গেলে, যত ভুল ঐ একটি লোকের বেলায়!'

নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। এতক্ষণে সবিতার রহস্যময় হাসি, আমার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরঘাটে যাওয়া ইত্যাদির একটা মানে খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু—

কিন্তু মালতীর কথা সবিতা জানল কেমন করে ? তার কথা তো কারোকে বলি নি। কলকাতা থেকে ফেরার পর শিশির মুখুটির পরিবারের অনন্ত দুর্দশার ইতিহাস মাকে-বাবাকে শুনিয়েছি। সবিতাও শুনেছে। কিন্তু মালতীর কথা বলি নি। কোন কারণ নেই তবু তার কথা বলতে কেন যে বেধেছে, নিজের

কাছেই তা দুর্জ্ঞেয়। মালতী যে আমাকে চিঠি লেখে কিংবা আমি যে তার উত্তর দিই, এ সবই গোপনে।

নীচু গলায় বললাম, 'কাকে চিঠি লিখি আমি ?'

সবিতা বলল, 'অন্যের মুখে তার নামটা শুনতে বুঝি মিষ্টি লাগে !'

'বাঁদরামো করবি না সবি।'

'সত্যি কথা বললেই বাঁদরামো ! নামটা আমি বলব না, মায়ের কাছ থেকে শুনে নিও—'

'মা !'

'হ্যাঁ গো মশাই—' মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে দিল সবিতা।

রুদ্ধস্বরে বললাম, 'মা কেমন করে জানল ? কে জানাল ?'

'মাকেই জিজ্ঞেস কোরো—' বলে আর দাঁড়াল না সবিতা। এক ছুটে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উঠোনের বাঁ ধারে পূবদুয়ারী ঘর। এই ঘরটা আমার। এখানে পা দিতেই দেখতে পেলাম পেছনদিকের দরজাটা হাট করে খোলা। আর তার মধ্য দিয়ে ভেতর-বাড়ির রান্নাঘরটা চোখে পড়ল।

রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। মা যেন কী করছেন সেখানে, এত দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমার পায়ের শব্দ মায়ের কানে গিয়েছিল হয়তো। কিংবা সবিতাই আগেভাগে খবর দিয়ে রেখেছে। গলা তুলে মা মা বললেন, 'কে, বিলু নাকি রে ?'

'হ্যাঁ মা।' আমি সাড়া দিলাম।

'রান্নাঘরে একটু আসবি।'

'যাচ্ছি।'

রান্নাঘরে এসে দেখলাম, মা খইয়ের মোয়া পাকাচ্ছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। মালতী এবং আমার মধ্যে কিছুই নেই তবু অসীম লজ্জা চারদিক থেকে আমাকে যেন ঘিরে ধরতে লাগল।

অন্য দিন বাইরে থেকে এলে সোজা গিয়ে মায়ের গা ঘেঁষে বসে পড়ি কিংবা জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরি। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নার মত মায়ের সুখ আর ধরে না। মুখে অবশ্য চেঁচামেচি করতে থাকেন, 'ওরে ছাড়্ ছাড়্। যত বড় হচ্ছিস তত ছেলেমানুষী বাড়ছে !'

আজ কিন্তু মায়ের কাছে গেলাম না। বেশ খানিকটা দূরে একটা কাঁঠাল

কাঠের পিঁড়িতে বসে বললাম, 'ডাকছিলে কেন ?'

অন্য দিনের তুলনায় আজ আমি নিরুচ্ছ্বাস, কিছুটা বা জড়সড়। মা হয়তো তা লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, 'কি হল রে, আজ অতদূরে গিয়ে বসলি ? অন্যদিন তো আমাকে মাথায় তুলে নাচতে থাকিস।' বলে মুখ ফিরিয়ে সকৌতুকে আমাকে দেখতে লাগলেন।

মুখ নীচু করলাম।

নতুন-পাকানো একটা মোয়া আমার হাতে দিয়ে মা এবার বললেন, 'খেয়ে গ্যাখ্ তো, মিষ্টি-টিষ্টি ঠিক হয়েছে কিনা—'

ঘাড় নীচু করেই মোয়াতে কামড় বসিয়ে দিলাম। আস্তে করে বললাম, 'হয়েছে।'

মা চুপ করে কি একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'গ্যাখো বাপু, আমার কিন্তু কোন দোষ নেই। দুপুরবেলা সবিতাকে তোর ঘর পরিষ্কার করতে বলেছিলাম। সে তোর বিছানা-পত্তর ঘেঁটে এক তাড়া চিঠি বার করেছে। আমাকে এনে দেখাল সেগুলো। তা হ্যাঁ রে বিলু, শিশির মুখুটির যে একটা মেয়ে আছে, আমায় বলিস নি তো।'

জড়ানো গলায় বললাম, 'বলবার মত কিছু ছিল না। তাই বলি নি।'

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে সবিতার গলায় শোনা গেল, 'বলবার মত ছিল না তো কাঁড়ি-কাঁড়ি চিঠি লেখা হচ্ছে কি করে ?'

সবিতা কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাই নি। চমকে মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম, সে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে।

মা সবিতাকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে আমার সঙ্কোচটা কাটিয়ে দিলেন, খেয়াল নেই। আমিও মালতীর সঙ্গে 'দেখা হবার পর থেকে তার সম্পর্কে সব বলে গেলাম।

সমস্ত শুনে মায়ের চোখ ছল ছল করে উঠল। করুণ ভারী গলায় বললেন, 'আহা রে, মেয়েটার তো বড় কষ্ট। ঐটুকুন মেয়ে—'

সবিতা হঠাৎ বলে উঠল, 'মালতীর কষ্ট কিন্তু তুমি ঘুচিয়ে দিতে পারতে দাদা—'

আমি অবাক, 'কেমন করে ?'

'বিয়ে করে ! আমিও একটা বৌদি পেতাম।' বলেই সবিতা ছুট লাগাল।

* *

দিন কয়েক পর মালতীর একটা চিঠি এল।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মেসোমশাইর বদলির চাকরি। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, সাতদিনের নোটিশে তাঁকে গোরখপুর ট্রান্সফার করেছে। তাঁর পক্ষে আমাদের এতজনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাল-পরশুর ভেতর উনি চলে যাচ্ছেন। তারপর যে কী হবে, কে জানে। ইতি—'

মালতীর এটাই শেষ চিঠি। পেয়েই উত্তর দিলাম। কিন্তু জবাব এল না। ক'দিন দেখে টেলিগ্রাম করলাম; এবারও উত্তর নেই। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু এত দূরে, পূর্ববাংলার এই অখ্যাত নগণ্য গ্রামে বসে বিচলিত হয়ে আমি কী-ই বা করতে পারি!

মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ রে, মালতী আর চিঠি লেখে?'

'না।'

মা আমার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। মালতীর সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আজকাল বন্ধুর মত আলোচনা করি। বলি, 'কী যে হল ওদের!'

চিন্তিত মুখে মা বলেন, 'যা দেশের অবস্থা তাতে খোঁজ-খবর নিতে যাওয়াও মুশকিল।'

দিনের পর দিন যেতে লাগল। যোগাযোগ নেই, তবু করুণ বেদনার মত মালতীর মুখখানা আমার স্মৃতির ভেতর থেকেই গেল। তার কথা মনে পড়লেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই; আমাকে ঘিরে সীমাহীন বিষাদ ঘন হতে থাকে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত